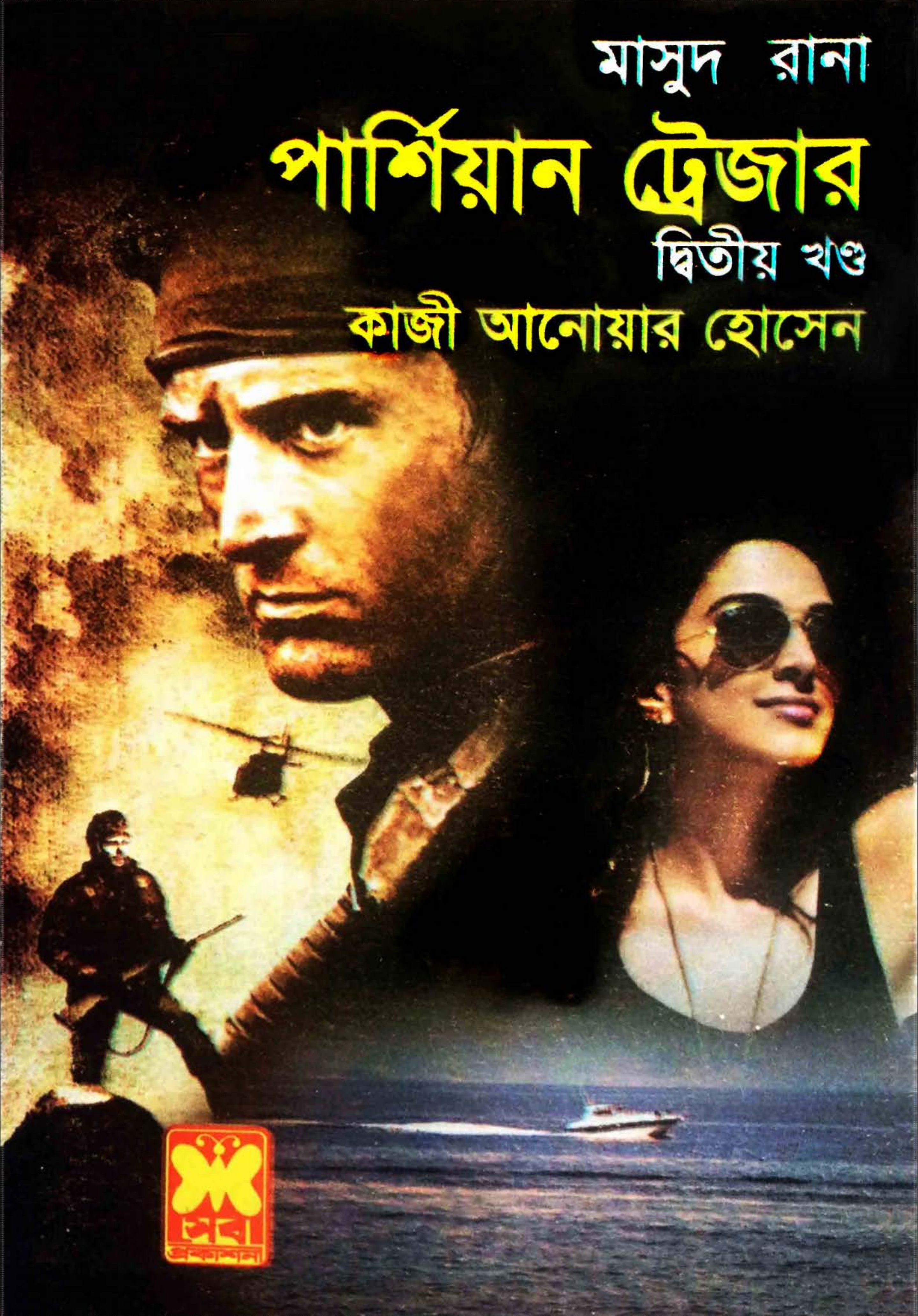

মাসুদ রানা
পার্শিয়ান ট্রেজার
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

পার্শিয়ান ট্রেজার

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

মেলিখানের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল না রানা-সোহানা।
বরং কোড্‌বুকটা নিয়ে চলে এল নিরাপদে।
এবার রহস্যভেদের পালা।
কিন্তু একটা বোতল সিদোরভের কাছে। কোডটাও।
রানা-সোহানা সিদ্ধান্ত নিল, হানা দেবে সিংহের গুহায়।
কৃষ্ণসাগরের তীরে সুরক্ষিত তার ম্যানসন—
ঝুঁকিটা বোধহয় বেশিই হয়ে গেল।
ট্রেজারম্যাপটা কোত্থেকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে?
শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি রানার নিয়ন্ত্রণে থাকল না।
পাচার হয়ে গেল গোপন খবর।
কে জানত, রানাকে একহাত দেখে নিতে
অবশেষে স্বয়ং হাজির হয়ে যাবে মাফিয়াসর্দার?

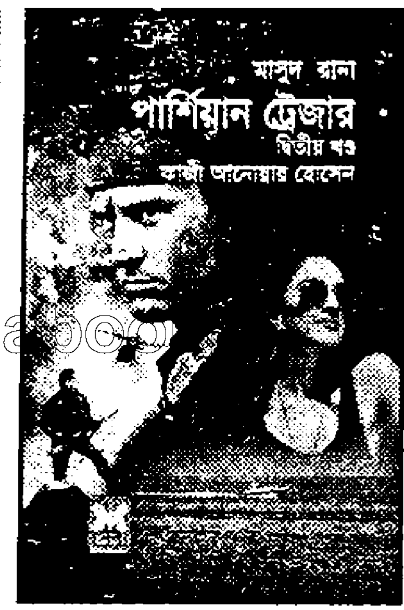
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৪৩২

পার্শিয়ান ট্রেজার

(দ্বিতীয় খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7432-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ২০১৪

রচনা: বিদেশি কাহিনির ছায়া অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana-432
PERSIAN TREASURE
Part-II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

এক শ' বারো টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত, দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর, সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায়-অবিচার-অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।

পদে পদে তার বিপদ-শিহরন-ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ, চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বি. দ্রঃ বর্তমানে সেবা প্রকাশনীর কোনও বইয়ে মূল্যের উপরে বর্ধিত মূল্যের আলগা কাগজ (চিপ্পি) সাঁটানো হয় না।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ*শত্রু
ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ*রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর
*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন*মৃত্যুর ঠিকানা
*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনও ষড়যন্ত্র*প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ
*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ*বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু*অকস্মাৎ
সীমান্ত*সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক*এসপিওনাজ*লাল
পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট*কুউউ*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস
*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক*আই
লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন*বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা
*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট*সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার
*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার*হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক
বারমুডা*বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা*চ্যালেঞ্জ
*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণকামড়*মরণখেলা*অপহরণ
*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন
*সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই
সাম্রাজ্য*অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা*সত্যবাবা
*যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর *শ্বাপদসংকুল*দংশন
*প্রলয় সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ*ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ
*জাপানী ফ্যানাটিক*সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী
*দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া*নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা
*অপচ্ছায়া*ব্যর্থ মিশন*নীল দংশন*সাউদিয়া ১০৩*কালপুরুষ*নীল বজ্র*মৃত্যুর প্রতিনিধি
*কালকূট*অমানিশা*সবাই চলে গেছে*অনন্ত যাত্রা*রক্তচোষা*কালো ফাইল*মাফিয়া
*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল*বিগ ব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া*টার্গেট
বাংলাদেশ*মহাপ্রলয়*যুদ্ধবাজ*প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি*ধ্বংসের নকশা
*মায়ান ট্রেজার*ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি*দুর্গম গিরি*মরণযাত্রা
*মাদকচক্র*শকুনের ছায়া*তুরুপের তাস*কালসাপ*গুডবাই, রানা*সীমা লঙ্ঘন*রুদ্রঝড়
*কান্তার মরু*কর্কটের বিষ*বোস্টন জ্বলছে*শয়তানের দোসর*নরকের ঠিকানা*অগ্নিবাণ
*কুহেলি রাত*বিষাক্ত থাবা*জন্মশত্রু*মৃত্যুর হাতছানি*সেই পাগল বৈজ্ঞানিক*সার্বিয়া
চক্রান্ত*দুরভিসন্ধি*কিলার কোবরা*মৃত্যুপথের যাত্রী*পালাও, রানা!*দেশপ্রেম*রক্তলালসা
*বাঘের খাঁচা*সিক্রেট এজেন্ট*ভাইরাস X-99*মুক্তিপণ*চীনে সঙ্কট*গোপন শত্রু*মোসাদ
চক্রান্ত*চরসদ্বীপ*বিপদসীমা*মৃত্যুবীজ*জাতগোক্ষুর*আবার ষড়যন্ত্র*অন্ধ আক্রোশ*অশুভ
প্রহর*কনকতরী*স্বর্ণখনি*অপারেশন ইজরাইল*শয়তানের উপাসক*হারানো মিগ*ব্লাইন্ড
মিশন*টপ সিক্রেট*মহাবিপদ সঙ্কেত*সবুজ সঙ্কেত*অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা*গহীন অরণ্য
*প্রজেক্ট X-15*অন্ধকারের বন্ধু*আবার সোহানা*আরেক গডফাদার*অন্ধপ্রেম*মিশন
তেলআবিব*ক্রাইম বস*সুমেরুর ডাক*ইশকাপনের টেক্কা*কালো নকশা*কালনাগিনী
*বেঈমান*দুর্গে অন্তরীণ*মরুকন্যা*রেড ড্রাগন*বিষচক্র*শয়তানের দ্বীপ*মাফিয়া ডন
গুরু*আসছে সাইক্লোন*সহযোদ্ধা*গুপ্ত সঙ্কেত*ক্রিমিনাল*বেদুঈন কন্যা*অরক্ষিত
জলসীমা*দুরন্ত ঈগল*সর্পলতা*অমানুষ*অখণ্ড অবসর*স্নাইপার*ক্যাসিনো আন্দামান
*জলরাক্ষস*মৃত্যুশীতল স্পর্শ*স্বপ্নের ভালবাসা*হ্যাকার*খুনে মাফিয়া*নিখোঁজ*বুশ
পাইলট*অচেনা বন্দর*ব্ল্যাকমেইলার*অন্তর্ধান*ড্রাগলর্ড*দ্বীপান্তর*গুপ্ত আততায়ী*বিপদে
সোহানা*চাই ঐশ্বর্য*স্বর্ণ-বিপর্যয়*কিল-মাস্টার*মৃত্যুর টিকেট*কুরুক্ষেত্র*ক্লাইমার*আগুন
নিয়ে খেলা*মরুস্বর্গ*সেই কুয়াশা*টেরোরিস্ট*সর্বনাশের দূত*শুভ্র পিঞ্জর*সূর্য-সৈনিক
*ট্রেজার হান্টার*লাইমলাইট*ডেথ ট্র্যাপ*কিলার ভাইরাস*টাইম বম*আদিম আতঙ্ক
*পার্শিয়ান ট্রেজার।

এক

সোহানার মাথায় রিভলভারটা এমনভাবে ঠেসে ধরেছে লুসিয়ানো যে, দেখে মনে হচ্ছে সোহানার মাথা একটা চুম্বক আর লুসিয়ানোর রিভলভার কালো কোনো লোহার টুকরো।

শিকারের দিকে যেভাবে তাকায় হিংস্র ব্যারাকুডা, রানার দিকে ঠিক সেভাবে তাকিয়ে বিজয়ের হাসি হাসল লুসিয়ানো। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল সাঙ্গপাঙ্গদের কাউকে। সঙ্গে সঙ্গে নিভে গেল উজ্জ্বল হেডলাইট।

আগেরবার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল রানার, এবার হলো উল্টোটা। হঠাৎ অন্ধকার নেমে এসেছে। চোখ পিটপিট করে সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে রানা। ফ্যাকাসে আকাশের পটভূমিতে দেখা যাচ্ছে দু'জন লোক এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ওদের পিছনে বিশাল একটা জিপের কাঠামো টের পাওয়া যায়।

'সোহানা, ঠিক আছো?' শত্রুর মনোযোগ নষ্ট করতে চায় রানা।

'শাট্ আপ!' ধমকে উঠল লুসিয়ানো।

পাত্তা দিল না রানা। 'ঠিক আছো, সোহানা?' জিজ্ঞেস করল আবারও।

'হ্যাঁ,' সোহানার গলায় ক্লান্তি, 'এখনও।'

হাঁটু সমান উঁচু ঘাস মাড়িয়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল মেলিখান, থামল ফুট দশেক দূরে। ওর ডানে, চেহারা না দেখেও

বুঝতে পারছে রানা, সেই গুঁফো। একটা হান্টিং রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছে—সিনেমায় যে-রকম দেখা যায় ঠিক সেভাবে। যদিও রানার কাছে মনে হয়েছে প্রভুর পিছন পিছন লেজ নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে একটা লোমশ কুকুর। গুঁফোর ভাবখানা হচ্ছে, উনিশ থেকে উনিশ দশমিক এক দেখলেই গুলি করে রানার খুলি উড়াবে। কিন্তু লোকটা কাজের সময় সত্যিই কিছু করতে পারবে কি না সন্দেহ আছে রানার। তবে টের পাচ্ছে, রাইফেলের নলটা ওর বুক বরাবর তাক করা।

'সঙ্গে আর্মস-টার্মস কিছু থেকে থাকলে আগেই দিয়ে দাও, মিস্টার,' গাড়ির কালো ধোঁয়া পরিবেশকে যেমন দূষিত করে, মেলিখানের ইংরেজি উচ্চারণকে সেভাবে নষ্ট করছে কড়া রাশান টান।

'আপনি চাইছেন, না দিয়ে উপায় আছে, স্যর?' কৌতুক করার চেষ্টা করল রানা। হাত বাড়াল প্যান্টের পকেটের দিকে।

'আস্তে, খুব আস্তে,' হুঁশিয়ার করল মেলিখান। 'আমার কিন্তু একটুতেই ভয় পাওয়ার বদঅভ্যাস আছে। আর ভয় পেলেই... কথা শেষ না করে ইচ্ছাকৃতভাবে থেমে গেল।

'প্যান্ট নষ্ট হয়ে যায় বুঝি?' নড়াচড়া বন্ধ করেছে রানা। 'আগে বলবেন না? আমি বরং হাত তুলে কাকতাড়ুয়ার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। আপনাদের কেউ এসে আমার প্যান্টের পকেট থেকে...'

'মিস্টার রানা, আর্মস, প্লিয,' তামাশা করার মুড নেই মেলিখানের। 'অ্যাণ্ড ভেরি কেয়ারফুলি, ফর ইয়োর ওউন বেনিফিট।'

ল্যুগারটা বের করে নিজের আর মেলিখানের মাঝখানে ছুঁড়ে ফেলল রানা।

এদিক-ওদিক তাকাল মেলিখান। 'ভিনসেঞ্জোকে দেখছি না

কেন? ভামটা পালাল নাকি?'

'এখানে এলে তবে না পালাবে,' কেউ কিছু বলার আগেই মিথ্যা বলতে শুরু করল রানা। 'প্রথমে দু'-চারটে চড়থাপ্পড় দিয়েছি। তারপর একটা গাছের সঙ্গে কষে বেঁধেছি। ভাম তো, আমার আদর সহ্য করতে পারল না বেশিক্ষণ। তোমাদের সঙ্গে পিরিতের সম্পর্ক আছে ওর বলে দিল। আর কী? দিলাম মুখের ভিতরে গোঁজ ভরে। দম আটকে এতক্ষণে মরে গেছে কি না কে জানে!'

'যারা গোপন কথা গোপন রাখতে পারে না তাদের পরিণতি খুব খারাপ হয়,' বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ছে মেলিখান। যা-হোক, টোপ ফেলেছিলাম, আমার রুই-কাতল দুটোই ধরা পড়েছে। একটু বুদ্ধি খাটাতে পারলে মানুষের শারীরিক পরিশ্রম কত কমে যায়, দেখলে মিস্টার রানা? বইটা দাও।'

'অবশ্যই। ওটা তোমার হাতে তুলে না দেয়া পর্যন্ত আমারও কলিজা ঠাণ্ডা হচ্ছে না। কিন্তু একটা কথা। লুসিয়ানোকে বলো আমার স্ত্রীকে ছেড়ে দশ কদম দূরে সরে যেতে।'

'স্ত্রী?' শব্দ করে হাসল মেলিখান। 'আমরা কাঁচা কাজ করি না। কারও বিরুদ্ধে লাগলে খোঁজখবর নিয়েই লাগি। ওই মেয়ে তোমার স্ত্রী না। বলো বান্ধবী। যা-ই হোক, তোমার কোনো চয়েস নেই, মিস্টার। যা বলছি করো। না হলে তিন পর্যন্ত গুনবো। একদিক দিয়ে আমার গোনা শেষ হবে আরেকদিক দিয়ে ট্রিগার টানবে লুসিয়ানো। তোমার বান্ধবীর মগজ এসে পড়বে তোমার পায়ের কাছে। ইচ্ছা করলে তোমাদের দু'জনকেই খুন করে বইটা হাতিয়ে নিতে পারি। বলো, পারি না? কেউ কিছু জানতে পারবে কোনোদিন? ধরো যে-কবর থেকে বইটা বের করেছ সেখানেই ঢুকিয়ে দিলাম তোমাদের দু'জনের লাশ। তা হলে কেমন হয়?'

'খুব খারাপ হয়, স্যার,' মেলিখান আর গুঁফোর উপর থেকে

চোখ সরিয়ে নিয়েছে রানা। মেলিখানের বাঁ দিকে, ফুট দশেক দূরে নলখাগড়া আর উঁচু ঘাসের জঙ্গলে মাথা তুলেছে একটা ছায়ামূর্তি। এদিক-ওদিক দেখে ঝট করে মাথা নামিয়ে নিল। গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। 'আরেকটা কথা,' বলে চলল রানা, 'গোপন কথা গোপন রাখতে না পারলে পরিণতি যেমন খারাপ হয়, মুখে বলা হলো ভালোমতো খোঁজখবর করা হয়েছে অথচ আসলে তা না করা হলেও কিন্তু...' কথা শেষ করল না রানা।

'মানে?' মেলিখানের ভ্রূ কুঁচকে গেছে, কল্পনার চোখে দেখল রানা। টের পেল অস্বস্তিতে ভুগতে শুরু করেছে লোকটা।

'মানে বইটা আপনার হাতে তুলে দেয়ার পর আমরা দু'জন যে লাশ হয়ে যাবো না তার নিশ্চয়তা কী?'

'পরিণতি নিয়ে...' চটে উঠতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল মেলিখান। 'কোনো নিশ্চয়তা নেই। আসলে তোমার কোনো উপায় নেই, মিস্টার রানা। যা বলা হচ্ছে তা করতেই হবে।'

ছায়ামূর্তিটা মেলিখানের ফুট তিনেকের মধ্যে এসে থামল, দেখে নিয়ে রানা বলল, 'যা বলা হচ্ছে তা করতে আমি রাজি না।'

'মানে?'

'মানে, আমার হাতে একটা ল্যুগার আছে,' রানা বাদে সবাইকে চমকে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন ভিনসেঞ্জো, 'এবং সেটা দিয়ে গুলি করে তিন ফুট দূর থেকে কীভাবে খুলি উড়াতে হয় ভালোমতো জানি।'

একচুল নড়ল না মেলিখান। বুঝতে পারছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। গুঁফো, স্বাভাবিকভাবেই, রাইফেলের নিশানা রানার উপর থেকে সরিয়ে ঘুরতে যাচ্ছিল ভিনসেঞ্জোর দিকে, দেখে আরেকবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন তিনি, 'খবরদার! গোঁফওয়ালাটা আর এক ইঞ্চি নড়লে তোমাকে ফুটো করে দিতে বাধ্য হবো আমি, মেলিখান!'

'থামো!' মেলিখানের আদেশটা গুঁফোর প্রতি।

স্থির হয়ে গেল গুঁফো।

'আচমকা উধাও হয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখিত, রানা,' বললেন ভিনসেঞ্জো। 'সারকোফেগাসের ভিতরে ছিলে তুমি, হঠাৎ টের পেলাম কোনো একটা গণ্ডগোল হচ্ছে কবরস্থানের গেটের বাইরে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হলো।'

'ভালো করেছেন,' মেলিখানের দিকে তাকাল রানা। 'স্যর, গুঁফো বুঝি হাতে সুপার গ্লু লাগিয়ে এসেছে? রাইফেলটা ছাড়তে পারছে না সেই কারণে?'

মেলিখান মাথা ঝাঁকাল। রাইফেলটা হাত থেকে ছেড়ে দিল গুঁফো।

লোকটার দিকে কয়েক কদম এগিয়ে গেল রানা। নির্দিষ্ট দূরত্বে থেমে দাঁড়াল। ঘাড়টা একবার ডানে আরেকবার বাঁয়ে কাত করে লোকটাকে দেখল বা দেখার ভান করল। তারপর গুঁফো কিছু বুঝে ওঠার আগেই বাঁ পায়ে ভর রেখে ডান পা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে প্রচণ্ড সাইড কিক্ মারল লোকটার বাঁ চোখের উপর। আওয়াজ করার অবকাশও পেল না গুঁফো। কাটা কলাগাছের মতো দড়াম করে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

মেলিখান কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সে-সুযোগ পেল না। গুঁফোকে লাথি মেরে পা মাটিতে নামিয়ে এনেই লাফিয়ে আগে বেড়েছে রানা, এবারের লাথিটা মেরেছে মেলিখানের নাকের উপর। হাড় ভাঙার শব্দটা পরিষ্কার শোনা গেল গোটা গোরস্তানে। পড়ে যাচ্ছিল মেলিখানও, খপ করে ওর শার্টের কলার চেপে ধরে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। নিজের ল্যুগারটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে গুঁজল কোমরে। মেলিখানের একটা কান জোরে মুচড়ে দিয়ে সে-কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'স্যর, লুসিয়ানোকে কি বলবেন রিভলভারটা সোহানার হাতে দিয়ে ধেই

ধেই করে কিছুক্ষণ নাচতে? কেন যেন ওর নাচ দেখতে ইচ্ছা করছে আমার।'

রাশান ভাষায় জঘন্য একটা গাল দিল মেলিখান। সঙ্গে সঙ্গে ওর ভাঙা নাকে একটা থাবড়া দিল রানা। কল্পনার চোখে দেখল মেলিখানের চোখ দিয়ে পানি বের হয়ে এসেছে। 'স্যর,' ব্যঙ্গ করে বলল, 'মুখ খারাপ করবেন না, প্লিয। লুসিয়ানোকে যা বলতে বলেছি বলুন। এরপর আর অনুরোধ করব না। কায়দামত মুচড়ে দিয়ে সারাজীবনের জন্য পঙ্গু করে দেব আপনার একটা হাত। পৃথিবীসেরা ডাক্তারও ঠিক করতে পারবে না।'

'লুসিয়ানো,' কাঁদকাঁদ গলায় বলে উঠল মেলিখান, 'রিভলভারটা মেয়েটাকে দিয়ে সরে যাও।'

ইটালিয়ানে চিৎকার করে কিছু বলল লুসিয়ানো। ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও রানা অনুমান করল, গাল দিয়েছে।

'লুসিয়ানো!' চেঁচাতে হলো মেলিখানকে, 'যা বলছি করো।'

'সোহানা?' দু'সেকেণ্ড পর জানতে চাইল রানা, 'রিভলভার পেয়েছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল সোহানা।

'লুসিয়ানো কী করে?'

'তালগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে।'

'থাকুক ওভাবেই। তুমি এদিকে এসো। রাইফেলটা তুলে নাও। তারপর আমার থেকে ডানে সরে গিয়ে একই লাইন-অভ-ফায়ারে কভার দাও গুঁফো আর লুসিয়ানোকে। মেলিখানের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে আমার।'

যা বলা হলো করল সোহানা।

মেলিখানের শার্টের কলার ধরে টেনে ওকে মুখোমুখি দাঁড় করাল রানা। 'চেক করতে পারবো না। অস্ত্রশস্ত্র যা আছে তোমার কাছে ফেলো মাটিতে।'

'আমার কাছে কোনো অস্ত্র নেই।'

'বিশ্বাস করতে পারলাম না বলে দুঃখিত।'

সময় নিয়ে জ্যাকেট খুলল মেলিখান। প্রত্যেকটা পকেট উল্টিয়ে দেখাল। জোরে ঝাঁকি মারল কয়েকবার। তারপর জ্যাকেটটা ফেলে দিল মাটিতে।

'এবার শার্ট।'

দেরি না করে শার্টটাও খুলে ফেলে দিল মেলিখান।

'ভিনসেঞ্জো,' ডাকল রানা, 'ল্যুগারটা দিন আমার হাতে। এগিয়ে এসে চেক করুন মেলিখানকে। যদি একটা পকেটনাইফও পান, শুধু বলবেন আমাকে। মেলিখানের সব ক'টা দাঁত যদি না ভেঙেছি তো...'

ইটালিয়ান ভাষায় আবারও কিছু বলে উঠল লুসিয়ানো চিৎকার করে।

'কী বলল?' ভিনসেঞ্জোর কাছে জানতে চাইল রানা।

'ভদ্র ভাষায় বলবো, না অভদ্র ভাষায়?' জানতে চাইল ভিনসেঞ্জো।

'ভদ্র।'

'বলল, আমার জন্মের সময় আমার বাবা আর মা'র মধ্যে বিয়ের সম্পর্ক ছিল না।'

'ওর জন্মের সময় ছিল কি না জিজ্ঞেস করবেন?'

প্রশ্নটা করা গেল না, কারণ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল লুসিয়ানো, 'তোকে খুন করবো আমি, বুড়ো, কসম খেলাম। সেই সঙ্গে তোর বউকেও।'

কোমর থেকে ল্যুগার নিয়ে হাতটা মেলিখানের কাঁধের উপর রাখল রানা, সময় নিয়ে নিশানা করল। তারপর টান দিল ট্রিগারে। লুসিয়ানোর বাঁ কানের লতি ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। আবারও গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে হলো লুসিয়ানোকে।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেছে ওর, হাত দিয়ে কান চেপে ধরেছে।

'এত সুন্দর নিশানা আমার বাপের জন্মেও দেখিনি,' ভিনসেঞ্জোর গলায় নিখাদ প্রশংসা।

'ভিনসেঞ্জো,' শান্ত গলায় বলল রানা, 'ওকে বলে দিন আমার বন্ধুদের গায়ে যারা হাত দিতে চায় তাদের হাত ভেঙে দিতে পছন্দ করি আমি। কাজেই সে যেন নিয়ত পরিবর্তন করে।'

কথাটা বলা হলো লুসিয়ানোকে। সে শুনতে পেয়েছে কি না বোঝা গেল না, কারণ সমানে গোঙাচ্ছে।

মেলিখানকে কষে একটা চড় মারল রানা। এত জোরে যে, শব্দ শুনে লুসিয়ানোর গোঙানি বন্ধ হয়ে গেল। 'আপনার সঙ্গে কিছু প্রেমালাপ ছিল আমার, স্যর,' বলল রানা।

প্যান্ট থেকে রুমাল বের করে নাকের রক্ত মুছছিল মেলিখান, এবার আরেক হাত দিয়ে চড়-খাওয়া গাল ডলতে শুরু করেছে। 'তুমি "গে" নাকি?' কৌতুক করার চেষ্টা করল।

'গে হলে আপনার গালে চড় না দিয়ে চুমু দিতাম। এবার আমার কথাগুলো শোনো মনোযোগ দিয়ে। তোমার ঘাড়ের ঠিক পিছনে ল্যুগার চেপে ধরে রাখবো আমি। তুমি প্রথমে নিজের, তারপর তোমার দুই চামচার সব কাপড় খুলে নেবে। কাপড়গুলো একসঙ্গে করে আগুন লাগিয়ে ছাই করা হবে। বোঝা গেছে?'

বিড়বিড় করে কিছু বলল মেলিখান, পরিষ্কার হলো না রানার কাছে। লোকটার ঘাড়ের পিছনে ল্যুগারের নল ঠেকাল ও। 'নিশ্চয়ই চাও না তোমার রক্তে হাত নোংরা হোক আমার?'

'এসব করে পার পাবে না, মিস্টার রানা,' প্যান্ট খুলতে খুলতে বলল মেলিখান। 'পালিয়ে কতদূর যাবে? এই দ্বীপ থেকে বেরই হতে পারবে না।'

'সেটা দেখব।'

অস্ত্রের মুখে উলঙ্গ করা হলো মেলিখান আর তার দুই

সঙ্গীকে। সবার কাপড় একসঙ্গে করে আগুন লাগিয়ে ছাই করলেন ভিনসেঞ্জো।

এরপর রানা মারল ওদেরকে—প্রথমে লুসিয়ানো, তারপর মেলিখান, সবশেষে গুঁফোকে। মাপা মার, প্রতিটা আঘাত নির্দিষ্ট নার্ভ সেন্টারে, দুর্বল জায়গায়। রানা বারকয়েক হাত-পা চালাতেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল ওরা।

'আমরা কি এদেরকে এভাবেই ফেলে রেখে চলে যাবো?' রানার "কাজ" শেষ হওয়ার পর জিজ্ঞেস করলেন ভিনসেঞ্জো।

'হ্যাঁ, কেন? আপনারও কি খানিক হাতের সুখ মেটানোর ইচ্ছা আছে?'

'না। তবে লুসিয়ানোকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছিলাম। ওকে ফেলে রেখে গেলে জ্ঞান ফিরে পেয়ে সবার আগে আমার পেছনে লাগবে।'

'ঠিক আছে, ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। ওর কোমরে হ্যাণ্ডকাফ আছে। খুলে পিছমোড়া করে আটকে দিন ওর দু'হাত। তারপর চলুন আপনি আর আমি মিলে ধরাধরি করে ওর অজ্ঞান দেহটা তুলে নিই আমাদের গাড়িতে। যাওয়ার আগে ওদের গাড়ির সবগুলো চাকা ফাঁসিয়ে দিয়ে যাব। যে-মার খেয়েছে, ঘণ্টা দু'-একের আগে জ্ঞান ফেরার কথা না। তারপরও সাবধানতা আর কী।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালেন ভিনসেঞ্জো।

দুই

হোটেল শেরাটন, মার্সেই, ফ্রান্স।

রানার স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে অপিকে কল করে সেটটা কানে ঠেকাল সোহানা। মনে হয় অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিল অপি। কারণ একবার রিং হতেই শোনা গেল ওর কণ্ঠ, 'সব ঠিক আছে, মাসুদ ভাই?'

'সব ঠিক,' বলে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল সোহানা, জুতা খুলতে শুরু করেছে। 'এবার বলো তো আমাদেরকে মার্সেই-এ আসতে বললে কেন?'

অজ্ঞান মেলিখান আর গুঁফোকে কবরস্থানে ফেলে রেখে ভিনসেঞ্জোর সঙ্গে লুসিয়ানোর ভারী শরীরটা ধরাধরি করে ল্যান্সিয়ায় ওঠায় রানা। তারপর যত জোরে সম্ভব গাড়ি চালিয়ে হাজির হয় ফ্যালকোনাইয়ায়। রানার স্যাটেলাইট ফোনটা কাজে লাগিয়ে নিজের ভাই-বেরাদরকে ঘটনা সংক্ষেপে জানান ভিনসেঞ্জো। তাঁরা যে ফ্যালকোনাইয়ায় যাচ্ছেন, সে-কথাও জানিয়ে দেন।

মাত্র কয়েক শ' লোকের বাস ফ্যালকোনাইয়া গ্রামে। ইংরেজি "ভি" এর মতো দেখতে ছোট একটা উপসাগরের একপ্রান্তে অবস্থিত গ্রামটা। রানারা সেখানে গিয়ে দেখে, ভিনসেঞ্জোর ভাই-বেরাদরদের সঙ্গে উদ্বিগ্ন চেহারায় অপেক্ষা করছেন তাঁর স্ত্রী। স্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ভদ্রমহিলা, আর ভিনসেঞ্জোর

ভাইয়েরা লুসিয়ানোকে আরও ভালোমতো বেঁধে নিয়ে ঢোকায় একটা গ্যারেজে।

ভিনসেঞ্জোর চাচীর বাসায় ঠাঁই হয় রানা-সোহানার। তিনি দেরি না করে দু'জনকে নিয়ে যান রান্নাঘরে, বসিয়ে দেন খাবার টেবিলে। বেশি করে পিঁয়াজ, জলপাই আর সস দিয়ে বানানো পাস্তা খেতে দেন ওদের দু'জনকে। চারদিক সামলিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা পর হাজির হন ভিনসেঞ্জো।

'আপনাদেরকে বিপদে ফেলে দিয়েছি আমরা,' আন্তরিক দুঃখের সঙ্গে বলে রানা।

'বাজে কথা,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে রানার কথাটা উড়িয়ে দেন ভিনসেঞ্জো, 'আপনি বরং আমার সম্মান পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছেন আমাকে। আজ যা ঘটল, আমার বাবা যদি বেঁচে থাকতেন এবং জানতে পারতেন, তা হলে গর্ব করতেন আমাকে নিয়ে।'

'আপনাকে অনেক ধন্যবাদ,' কৃতজ্ঞতা জানাল সোহানা।

'লুসিয়ানোর ব্যাপারে কী করবেন?' জানতে চাইল রানা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকান ভিনসেঞ্জো। 'এখনই বলতে পারছি না। কয়েক জায়গায় ফোন করতে হবে। চেষ্টা করবো শয়তানটাকে মেইনল্যাণ্ডে নিয়ে যাওয়ার। সেনাবাহিনীর কয়েকজন কর্মকর্তার সঙ্গে খাতির আছে আমাদের। চেষ্টা করবো ওদেরকে দিয়ে কিছু একটা করাতে। লুসিয়ানোর বিরুদ্ধে শক্ত প্রমাণ আছে আমাদের হাতে। এর আগেও ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মতো লোক না থাকায় সুবিধা করতে পারিনি। এবার যখন নাগালে পাওয়া গেছে তখন সুযোগ হাতছাড়া করতে চাই না। আমাদেরকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমরা ভালো আছি, ভালো থাকবো। কর্সিকান মাফিয়া যত শক্তিশালীই হোক, ফ্যালকোনাইয়ায় কিছু করতে পারবে না।

গ্রামের মানুষ শহরের মানুষদের মতো স্বার্থপর হয় না। বাইরের কেউ এসে এখানে হাঙ্গামা করতে চাইলে সবাই মিলে ঠেকাবে। ...খাওয়া শেষ করুন, আপনাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দ্বীপ থেকে বের করে দেয়ার ব্যবস্থা করছি।'

ওই কাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে ভিনসেঞ্জোর এক চাচাতো ভাই। ভদ্রলোকের চার্টার ফিশিং বোট আছে; লুসিয়ানো কিংবা মেলিখানের লোকেরা রানা-সোহানার খোঁজে এলবা তন্নতন্ন করতে পারে আন্দাজ করে ওদের দু'জনকে জেলের পোশাক পরিয়ে নিজের নৌকায় তোলেন তিনি। প্রতিদিনের রুটিন অনুযায়ী পরদিন খুব ভোরে বেরিয়ে পড়েন মাছ ধরতে, সারাদিন সাগরে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যা নাগাদ নৌকা ভেড়ান ইটালির মেইনল্যাণ্ডে—দিনে যা মাছ ধরেন, সন্ধ্যার বাজারে সেগুলো বিক্রি করেন সেখানে।

রানা-সোহানা আলাদা হয়ে যায় তখন। রানা মাছ-ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে আর সোহানা সাধারণ ইউরোপিয়ান পর্যটক হিসেবে দুটো আলাদা হোটেলে গিয়ে ওঠে রাত কাটানোর জন্য। রানার স্যাটেলাইট ফোনের মাধ্যমে দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ থাকে।

হোটেলে নিজের ঘরে ঢুকে চটপট শাওয়ার সেরে নেয় রানা। ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করে লোরনের কোডবুকের বিশেষ সেই সংকেতটার কয়েকটা ছবি তোলে। তারপর সেগুলো ল্যাপটপে নিয়ে ই-মেইল করে পাঠিয়ে দেয় অপির কাছে। কাজ শেষে ডিনারের জন্য নামে নীচে, হাঁটতে হাঁটতে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢোকে। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সতর্ক দৃষ্টি রাখে চারদিকে। এরপর বাজার এলাকায় ঘুরে বেড়ায় কিছুক্ষণ, কিন্তু সন্দেহজনক কাউকে দেখতে পায় না। এ-সময়ে ভুলেও যোগাযোগ করে না সোহানার সঙ্গে। ঘুরতে ঘুরতে একজায়গায় পেয়ে যায় ডি.এইচ.এল.-এর একটা শাখা অফিস। কী মনে করে লোরনের কোডবুকটা অপির

নামে পাঠিয়ে দেয়। পরে রাত করে হোটেলে ফিরে নিজের ঘরে ঢোকে। স্যাটেলাইট ফোনটা নিয়ে বিছানায় যায়।

'এই রহস্যের কারণ কী?' আবারও অপিকে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'ইটালি থেকে কি সরাসরি আমেরিকায় ফিরতে পারতাম না আমরা?' ওর পাশে বসে পড়েছে রানা, ফোনের স্পিকার মোড চালু করে দিল সোহানা।

'পারতেন,' সাফাই গাওয়ার সুরে বলল অপি, 'কিন্তু আমার মনে হয় তারপর আবারও মার্সেই-এর দিকেই ছুটতে হতো আপনাদেরকে।'

'মানে?'

'মাইকেল সেবাস্টিয়ানের কথা খেয়াল আছে, ইউ.এম. সেভেন্টি সেভেনের ক্যাপ্টেন? তাঁকে খুঁজে পেয়েছি আমি।'

'সেবাস্টিয়ানকে!' আশ্চর্য হয়ে রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'মানে তুমি বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছি এখনও বেঁচে আছেন তিনি। এবং খবরটা জানার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে আমাকে। শেষপর্যন্ত কী জানতে পেরেছি জানেন? ম্যাক্সিমিলান যখন ধরা পড়ে তখন সেখানে ছিলেন তিনি। তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর পাঠিয়ে দেয়া হয় জার্মানিতে, ঘুরপথে। কথা ছিল মার্সেই হয়ে দেশে ফেরত যাবেন তিনি। কিন্তু নৌকা থেকে নামার পর যে-কোনো কারণেই হোক দেশের ট্রেন ধরেননি বা ধরতে পারেননি সেবাস্টিয়ান। রয়ে যান মার্সেইতেই। আজও সেখানেই আছেন, এক নাতনীর সঙ্গে। তাঁদের ঠিকানা যোগাড় করে ফেলেছি আমি...'

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা ক্যাফেতে গিয়ে ঢুকল রানা-সোহানা। ক্যাফেটা মুখ করে আছে বন্দরের দিকে। সাগরের

সুনীল পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে বিভিন্ন আকার-আকৃতির সেইলবোট। বিশাল ঢেউয়ের সঙ্গে তাল রেখে ওঠানামা করছে রঙবেরঙের পালগুলো। সকালের তেজি রোদ সাগরের পানিতে প্রতিফলিত হয়ে ধাঁধা লাগিয়ে দিচ্ছে দর্শকের চোখে। বন্দরের প্রবেশমুখে, উত্তর আর দক্ষিণ তটরেখার কাছে, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুটো দুর্গ। এগুলো ছাড়িয়ে খানিকটা পশ্চিমে তাকালে চোখে পড়ে একসারি পাহাড়। সেখানে গাছপালার আড়ালে দূর থেকে একটা ধর্মাশ্রম আর দুটো গির্জা দেখা যায় কি যায় না। প্রতি বছর মে মাসে পশ্চিম আর পুব ইয়োরোপ থেকে জড়ো হয় হাজার বিশেক জিপসি, তাদের ঐতিহ্য অনুযায়ী উৎসব করে এখানে।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল রানা। মাইকেল সেবাস্টিয়ানের ঠিকানাটা জানাল ড্রাইভারকে। চলতে শুরু করল ট্যাক্সি।

ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, থাকার জন্য খুব সস্তা একটা এলাকা বেছে নিয়েছেন সেবাস্টিয়ান। সাধারণত নিম্ন-আয়ের মজুররা থাকে সেখানে। ওখানকার বেশিরভাগ বাড়িই মধ্যযুগের কাছাকাছি সময়ে বানানো। কোনো কোনোটা ভেঙে পড়তে চাইছে। ঘিঞ্জি একটা এলাকা, বাড়িগুলো গায়ে গায়ে একটা আরেকটার সঙ্গে লাগানো, ইচ্ছা করলে এক বাড়ির ছাদ টপকে আরেক বাড়িতে যাওয়া যায়। গলিগুলো সরু সরু, ট্যাক্সিওয়ালা আগেই জানিয়ে দিল সে-সব গলিতে ঢুকতে রাজি না সে। মাথা ঝাঁকিয়ে রানাও জানিয়ে দিল সমস্যা নেই, পথ চিনে নিতে পারবে ও।

সেবাস্টিয়ানের বাড়িটা খুঁজে পেতে বেশি বেগ পেতে হলো না। মাখনরঙা একটা দোতলা বাসায় থাকেন সাবেক ক্রিগ্স্মেরিন সেনা। টাউন হল আর বহু পুরনো একটা গির্জার মাঝখানে পড়ে

অনেকটা স্যাণ্ডউইচের মতো অবস্থা হয়েছে বাড়িটার। দরজায় টোকা দিতে গিয়ে রানার সন্দেহ হলো সবুজরঙা ঘুণেধরা পাতলা কাঠের দরজাটা ওর করাঘাতে ভেঙে পড়বে কি না!

চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের এক স্বর্ণকেশী মেয়ে খুলে দিল দরজাটা। ওকে ফরাসি ভাষায় গুড মর্নিং জানিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, ইংরেজি বোঝে কি না সে। জবাবে মেয়েটা বলল, বোঝে।

নিজের আর সোহানার পরিচয় দিয়ে রানা বলল, 'মিস্টার সেবাস্টিয়ানের সঙ্গে দেখা করতে চাই আমরা। তিনি বাসায় আছেন?'

'জী, আছেন,' কেন যেন সরু চোখে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আমি কি জানতে পারি কেন দেখা করতে চাইছেন তাঁর সঙ্গে?'

ব্যাপারটা নিয়ে এখানে আসার আগে কথা বলেছে রানা-সোহানা। সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেবাস্টিয়ান অথবা তাঁর পক্ষে কেউ যদি ওদের আগমনের কারণ জানতে চায় তা হলে সত্যি কথাটাই বলবে।

'ইউ.এম. সেভেণ্টি সেভেন আর ম্যাক্সিমিলানের ব্যাপারে কথা বলতে চাই আমরা,' বলল রানা।

শুনে ঘাড় খানিকটা কাত করল স্বর্ণকেশী, চোখ দুটো আরও সরু হয়েছে। এই মেয়ে যদি সেবাস্টিয়ানের নাতনী হয়ে থাকে তা হলে বোঝাই যাচ্ছে একে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার অনেক কথা বলেছেন সেবাস্টিয়ান।

'একটু দাঁড়ান,' রানার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর বলল মেয়েটা, 'আসছি আমি।' ঘুরে হাঁটা ধরল, কিছুক্ষণ পর অদৃশ্য হয়ে গেল ঘরের ভিতরে।

সোহানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা।

মিনিটখানেক পর ঘরের ভিতর থেকে চাপা গলার কথাবার্তার

আওয়াজ পাওয়া গেল। খানিক বাদে হাজির হলো মেয়েটি, চেহারায় কৌতূহলের ছাপ। 'প্লিয, ভিতরে আসুন,' কণ্ঠে আমন্ত্রণ। 'আমার নাম মনিকা।'

বাসার প্রথম ঘরটাতে সে-ই থাকে সম্ভবত, মেয়েদের জামাকাপড় দেখে তা-ই মনে হয়; ওর পিছু পিছু দ্বিতীয় ঘরটায় হাজির হলো রানা-সোহানা। ভিতরে এককোনায় একটা রকিং চেয়ারে বসে আছেন সেবাস্টিয়ান। সামনে একটা উঁচু টেবিলের উপর অনেক আগের আমলের একটা টেলিভিশন, মিউট-করা। আবহাওয়ার খবর হচ্ছে।

সেবাস্টিয়ানের পরনে ধূসর একটা কার্ডিগান। গলার বোতামটা পর্যন্ত আটকিয়ে রেখেছেন এই গরমেও। কোলের উপর বিছিয়ে রেখেছেন একটা কম্বল। সুঁই-সুতোর সাহায্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর হলুদ-নীল ছোট ছোট হীরা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সেটাতে। সেবাস্টিয়ানের চাঁদিতে একটা চুলও নেই। ভীষণভাবে কুঁচকে গেছে চেহারা। থুতনির নীচটা ঝুলে পড়েছে বিশ্রী ভঙ্গিতে। নিষ্পলক এক জোড়া নীল চোখে কাঁচের মতো স্বচ্ছ প্রাণহীন দৃষ্টি।

'গুড মর্নিং,' রানা-সোহানাকে খানিকটা চমকে দিয়ে ভরাট গলায় বলে উঠলেন তিনি, বোঝা গেল শরীরে জোর না থাকলেও কণ্ঠ এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী তাঁর। কাঁপা কাঁপা হাত তুলে কাছেই-রাখা ফোম-বের-হওয়া একটা চামড়ার কাউচ দেখিয়ে দিলেন। 'বসুন, প্লিয। কফি খাবেন?'

'না, ধন্যবাদ,' এগিয়ে গিয়ে বসতে বসতে বলল সোহানা।

'মনিকা বলল আপনারা নাকি সাইলাকে খুঁজে পেয়েছেন?' বললেন সেবাস্টিয়ান।

'সাইলা?' বুঝতে পারল না রানা।

'সেভেন্টি সেভেনকে আদর করে ওই নামে ডাকি আমি। ওটা

আসলে আমার স্ত্রীর ডাকনাম। মিত্রবাহিনী ব্রেমের্হেভেনে ব্যাপক বোমাবর্ষণ শুরু করলে মারা পড়ে সে। রাম কে'র গুহায় সাবমেরিনটা পেয়েছেন আপনারা, তা-ই না?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'সামুদ্রিক গবেষণার কাজে গিয়েছিলাম ওখানে। কৌতূহল হওয়ায় ঢুকে পড়ি একটা গুহায়। রহস্যময় কিছু টানেল চোখে পড়ে তখন। একটা টানেলের ভিতর দেখতে পাই সাবমেরিনটাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যে-রকম ছিল, এখনও সে-রকম আছে।'

'ওটা কি এখনও ওখানেই আছে?'

হাসল রানা। 'না। একটা ঝামেলা হয়েছিল। আমরা তখন ওটাকে ভেলার মতো কাজে লাগিয়ে বের হয়ে আসি ওই টানেল থেকে।'

'ভেলার মতো কাজে লাগিয়ে মানে?'

'হঠাৎ করেই ধসে পড়ে মেইন এন্ট্রেন্স। ভিতরে আটকা পড়ে যাই আমরা। আমাদের নৌকা তখন বাইরে। টানেলের ভিতর শক্তিশালী স্রোত প্রবাহিত হয়, নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার। কাজেই সাঁতার কেটে বের হয়ে আসা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় আমাদের জন্য। তখন সাবমেরিনটা কাজে লাগাতে বাধ্য হই। আরেকটা টানেল ধরে এবং সম্ভবত অন্য কোনো গুহার ভিতর দিয়ে বের হয়ে আসি।'

প্রাণের ছোঁয়া লাগল সেবাস্টিয়ানের দু'চোখে। নিঃশব্দে হাসছেন তিনি। 'এ-রকম তাজ্জব কথা শুনিনি অনেকদিন। তারপরও ভালো লাগছে, অন্তত দু'জন মানুষের জান বাঁচানোর কাজে ব্যবহৃত হয়েছে আমার সাইলা।'

'আপনি যদি চান তা হলে...'

'তা হলে?'

'সাবমেরিনটাকে আপনার কাছে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে

পারি।'

মাথা নাড়লেন সেবাস্টিয়ান। 'যতটুকু করেছেন তা-ই বেশি। আমার কাছে আনার দরকার নেই। কী করবো ওটা দিয়ে? রাখবো কোথায়? তা ছাড়া ওটা দেখলেই মনে পড়ে যাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের কথা, আমার মৃত স্ত্রীর কথা। সময় ফুরিয়ে এসেছে আমার, এখন আর আবেগাক্রান্ত হতে চাই না।' চোখ চিকচিক করছে তাঁর, বার কয়েক পিটপিট করলেন তিনি। 'কেন যেন মনে হচ্ছে শুধু সাবমেরিন-উদ্ধারের খবর দেয়ার জন্য এতদূর আসেননি আপনারা।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ঠিক বলেছেন। আমরা ইউ.এম. থার্টি ফোরও উদ্ধার করেছি।'

আগ্রহ দেখা গেল সেবাস্টিয়ানের চোখেমুখে। সামনে ঝুঁকলেন তিনি। 'এগন বল্ডেউইনকেও পেয়েছেন নাকি?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল রানা।

রকিংচেয়ারে হেলান দিলেন সেবাস্টিয়ান। খোলা জানালা দিয়ে অনেক দূরে কোথাও চলে গেছে তাঁর দৃষ্টি। উদাস হয়ে কী যেন ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর একসময় মৃদু গলায় বললেন, 'এগন আমার ভালো বন্ধু ছিল। সেই যে আলাদা হলাম, তারপর এতগুলো বছর অপেক্ষা করেছি জানার জন্য কী হয়েছে আমার বন্ধুর। আজ জানতে পারলাম। আপনাদেরকে আবারও ধন্যবাদ।'

'আমরা আসলে আপনার কাছে এসেছি মদের বোতলগুলোর ব্যাপারে জানতে,' রানার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল সোহানা।

'মদের বোতল?' ভ্রূ কোঁচকালেন সেবাস্টিয়ান। 'ও, বুঝতে পেরেছি। সাবমেরিনের মদের-বোতলগুলোর কথা বলছেন? ওগুলো আসলে সেলিব্রেট করার জন্য রেখেছিলাম আমরা। ভেবেছিলাম সফলভাবে শেষ করতে পারবো আমাদের মিশন,

তারপর...। বোতলগুলো অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে?'

'একটা পাওয়া গেছে থার্টি ফোরে,' জবাব দিল সোহানা। 'আর একটা সাইলাতে।'

'আর তিন নম্বর বোতলটা? ওটার কী হলো? যতদূর মনে পড়ে বোতল ছিল তিনটা। এগনের মিশন ছিল বেশি কঠিন, তাই ওকে দুটো বোতল দিয়েছিলাম আমি।'

'থার্টি ফোরটাকে যে-জায়গায় পাওয়া গেছে তার কাছাকাছি এক জায়গায় পাওয়া গেছে তিন নম্বর বোতলটার ভাঙা একটা অংশ। ওটা সাবমেরিন থেকে বাইরে এল কী করে বলতে পারবো না।'

'যুদ্ধের ফলাফল,' হাত নেড়ে মন্তব্য করলেন সেবাস্টিয়ান।

'আপনাদের মিশনের ব্যাপারে কিছু বলবেন?' প্রশ্ন করল রানা। 'আপনি আর এগন মিলে কী করার চেষ্টা করছিলেন আসলে?'

আবারও ভ্রূ কুঁচকে গেল সেবাস্টিয়ানের, আবারও খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। কিছুক্ষণ পর, শোনা যায় কি যায় না এ-রকম গলায় বলতে লাগলেন, 'এখন আর এসব বলে লাভ কী? তারপরও, সোজা কথায় যদি বলি, স্রেফ পাগলামি করছিলাম আমরা। পরিকল্পনাটা ছিল স্বয়ং হিটলারের। কম সময়ে বেশি ফল লাভের আশায় কতগুলো মিনিসাব বানানোর আদেশ দিয়েছিলেন তিনি। আর ওগুলো চালানোর জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল আমাদের মতো...। কথা ছিল চিযাপিক উপসাগর ধরে এগিয়ে যাবে এগন, তারপর হামলা করবে নরফোকের নেভি বেসে। একইসঙ্গে আমি গিয়ে আক্রমণ চালাবো চার্লসটনের অ্যামুনিশন ডিপোতে। কিন্তু সাইলার কলকজায় কিছু গণ্ডগোল দেখা দেয়। তাই দেরি করতে বাধ্য হই। সারাই করার জন্য রাম কে-তে যাই আমি। আমাকে তখন ডেকে পাঠানো হয়

ব্রেমের্হেভেনে। বাকিটা বোধহয় জানা আছে আপনাদের, নাকি?'

'রাম কে-তে কী ধরনের রিফিটিং-এর জন্য থামেন আপনারা?'

'আমরা আসলে চেষ্টা করছিলাম সাবমেরিনগুলোতে বড় আকারের ব্যাটারি বসাতে যাতে বেশি দূর যাওয়া যায়। আরেকটা বোকামি আর কী। শেষেরদিকে আমরা দু'জনই বুঝতে পারছিলাম আসলে যা করতে যাচ্ছি তা আত্মহত্যার নামান্তর।'

'তা হলে কাজটা করতে গেলেন কেন?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন সেবাস্টিয়ান। 'ডিউটি বলতে পারেন। আবার কমবয়সের অবিচক্ষণতাও বলা যায়। হিটলার কিংবা তাঁর সহচরদের কাউকেই পছন্দ করতাম না আমি বা এগন। কিন্তু দেশটা ছিল আমাদের। ভেবেছিলাম যা করছি তা দেশের জন্যই করছি।'

'বোতলগুলোর ব্যাপারে কিছু বলুন,' প্রসঙ্গ পাল্টাতে চায় সোহানা। 'কোত্থেকে পেলেন ওগুলো?'

'তার আগে একটা কথা বলুন তো। বোতলগুলোর ব্যাপারে আপনাদের কৌতূহলের কারণ কী?'

'আমরা আসলে অ্যান্টিক কালেক্টর। এটা আমাদের নেশা, পেশা। প্রথম বোতলটা যেদিন দেখেছি সেদিনই বুঝেছি ওগুলো অনেক পুরনো আর দুষ্প্রাপ্য।'

আরও একবার নিঃশব্দে হাসলেন সেবাস্টিয়ান। 'বোতলগুলো কোত্থেকে এসেছে সে-ব্যাপারে আমি নিজেও নিশ্চিত না। ব্রেমের্হেভেন ছেড়ে রওনা দেয়ার আগে আমার ভাই হুবার ওগুলো দিয়েছিল আমাকে। জিজ্ঞেস করাতে বলেছিল, ওগুলো নাকি সে খুঁজে পেয়েছে।'

'কোথায়?'

'মনে পড়ছে না...দাঁড়ান চিন্তা করে দেখি,' কিছুক্ষণ কপাল

চুলকালেন সেবাস্টিয়ান। 'বয়স হয়েছে, আগেরদিনের সব কথা ঠিকমতো মনে করতে পারি না। কী যেন বলেছিল হুবার...কোনো দুর্গের কথা...'

'দুর্গ?' রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সোহানা। 'কোন্ দেশের?'

'ফ্রান্সেরই তো মনে হয়। কী যেন উপসাগরটার নাম... ধেৎ! কিছুই মনে করতে পারছি না। একটা দ্বীপ আছে সেখানে। দাঁড়ান, দাঁড়ান! বিখ্যাত একটা উপন্যাসে ওই দুর্গের নাম বলা হয়েছে। লেখকের নাম দ্যুমা, বইয়ের নাম কাউন্ট অভ মন্টিক্রিস্টো।'

আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা। তারপর দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'শ্যাতো দ'ইফ?'

'হ্যাঁ!' খুশিতে চুটকি বাজালেন সেবাস্টিয়ান। 'শ্যাতো দ'ইফেই ওগুলো খুঁজে পেয়েছিল হুবার।'

তিন

সেবাস্টিয়ানের বাসা থেকে বের হয়ে একটা ট্যাক্সি নিল রানা-সোহানা। হাজির হলো সমুদ্রের দিকে মুখ করে থাকা শহর ম্যালমস্ক-এ। এখান থেকে শ্যাতো দ'ইফ কাছে। ট্যাক্সি ছেড়ে দেয়ার পর শহরের প্রান্তভাগে, সাগরের কিনার ঘেঁষে বানানো একটা নিরিবিলি ক্যাফেতে গিয়ে বসল। মাথার উপরের বিশাল আকৃতির ছাতা ঠেকিয়ে দিচ্ছে মাঝ-দুপুরের কড়া রোদ। দুটো

এসপ্রেসো কফির অর্ডার দিল রানা।

'আমার সন্দেহ আছে শ্যাতোর স্টাফরা ভিতরের কোনাকাঞ্চি আমাদেরকে দেখতে দেবে কি না,' এতক্ষণ চুপ করে থেকে একদৃষ্টিতে সাগরের দিকে তাকিয়ে ছিল সোহানা, কফি আসার পর ধূমায়িত কাপে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বলল কথাটা।

রানা তাকিয়ে ছিল দ'ইফের দিকে। দৃষ্টি ফিরিয়ে সোহানার দিকে তাকাল। বলল, 'দেখতে না দেয়ারই কথা। তা ছাড়া দেখতে দিলেও কোনো লাভ হতো বলে মনে হয় না। কী খুঁজতে হবে জানি না আমরা। এত বড় দুর্গের কোথায় খুঁজবো তা-ও জানি না,' কাঁধ ঝাঁকাল। 'যদি কিছু খুঁজে পাইও, চিনতে পারবো কি না তাতেও সন্দেহ আছে,' আবারও তাকাল দ'ইফের দিকে।

তীর থেকে বড়জোর দু'মাইল দূরে হবে দুর্গটা। ফিকে হয়ে গিয়ে গিরিমাটির মতো রঙ পেয়েছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় একগাদা পাথর স্তূপাকারে দাঁড়িয়ে আছে। ওটার সামনে পাহাড়ের ঢালু কিনারা, চারপাশে উঁচু সীমানাপ্রাচীর, কোনো কোনো জায়গায় পাথরের খিলান।

'এখানে আসার সময় ট্যুরিস্ট অফিস থেকে যে ব্রোশিয়ারটা কিনলে,' ইঙ্গিতে রানার হাতের পুস্তিকাটা দেখাল সোহানা. 'ট্যাক্সিতে মনোযোগ দিয়ে পড়লে। কী জানতে পারলে?'

নড়েচড়ে বসল রানা। 'পুরোটা পড়তে পারিনি। আর যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে কাজের কথার চেয়ে গল্পই বেশি। তারপরও বলছি। শ্যাতো দ'ইফ গড়া হয়েছে একটা দ্বীপের উপর। দ্বীপটা আয়তনে সাত একরের কিছু বেশি। সে-তুলনায় দুর্গটাকে বেশ ছোট বলা যায়। বর্গাকৃতির। মূল ভবনটা তিন তলা। দৈর্ঘ্যে চারদিকে কমবেশি আটাশ মিটারের মতো। ওটার তিন দিকে অনেকগুলো দুর্গকূট আছে। কামান থেকে যাতে গোলা ছোঁড়া যায় সেজন্য সারি সারি ফোকরও আছে।'

'বানিয়েছিল কারা? কেন?'

ব্রোশিয়ারের ওপর চোখ বুলিয়ে নিল রানা। 'বানানো হয়েছিল রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের আদেশে,' পুস্তিকাটার গায়ে টোকা দিল, 'নির্মাণসাল লেখা আছে পনেরো শ' চব্বিশ থেকে পনেরো শ' একত্রিশ। পনেরো শ' ষোলো সালে দ্বীপটা দেখতে যান রাজা। ঘুরেফিরে বুঝতে পারেন, ওটা এমন এক জায়গায় অবস্থিত যে, কারও যদি সমুদ্র দিয়ে এসে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা থাকে বন্দরনগরীতে আর ওই দ্বীপে যদি কোনো দুর্গ থাকে, অনায়াসে ঠেকিয়ে দেয়া যাবে হামলাকারীদেরকে। কিন্তু পরে এক সামরিক ইঞ্জিনিয়ার দুর্গটার বিভিন্ন দুর্বলতার কথা ফাঁস করে দেন। তখন সামরিক দিক দিয়ে ওটা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। পরিণত হয় ফ্রান্সের রাজনৈতিক আর ধর্মীয় শত্রুদের কারাগারে। অনেকটা স্যান ফ্র্যান্সিস্কোর আলকাতরাযের মতো।'

'কিন্তু জেলখানা বানানোর দরকারটা কী ছিল?'

'কর্তৃপক্ষ হয়তো দ'ইফকেই উপযুক্ত মনে করেছিল। যথাযথ কারণও আছে অবশ্য। প্রথম কথা দ্বীপটা বিচ্ছিন্ন। দ্বিতীয়ত, এর পাশ দিয়ে সবসময় বয়ে চলে তীব্র স্রোত। কারাপ্রকোষ্ঠ থেকে কোনো কয়েদি যদি বের হয়ে দেয়াল টপকে দ'ইফের বাইরে আসেও, যা এককথায় অসম্ভব, পানিতে নামলে স্রেফ মরতে হবে বেচারাকে। কাজেই দ'ইফ এস্কেপপ্রুফ।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'আর কিছু?'

'পয়সাওয়ালা কয়েদিরা ইচ্ছা করলে তৃতীয় তলায় ব্যক্তিগত প্রকোষ্ঠ নিতে পারত। সেখানে মোটা শিক-লাগানো জানালা আছে, সাগর দেখা যায়। এমনকী কোনো কোনোটাতে ফায়ারপ্লেসও আছে। যাদের সামর্থ্য নেই তাদের ঠাঁই হতো বেইযমেণ্ট ডানজনে,' থেমে দম নিল রানা, আরেকবার চোখ বুলাল ব্রোশিয়ারে। 'ভূগর্ভ-কারাগারেরও ব্যবস্থা ছিল দ'ইফে।

ডানজনের মেঝে কেটে গর্ত করা হতো। উপরে বসিয়ে দেয়া হতো একটা দরজা। ব্যস, হয়ে গেল ভূগর্ভস্থ কারাগার। ওখানে কাউকে একবার ঢোকানো হলে ধরে নেয়া হতো মরার আগে বের হওয়ার সম্ভবনা নেই লোকটার।'

স্যাটেলাইট ফোনটা বেজে উঠল। অপি। রিসিভ বাটনে চাপ দিল রানা।

'মাসুদ ভাই, কিছু তথ্য যোগাড় করতে পেরেছি।'

'বলে ফেলো,' স্পিকার মোড চালু করল রানা।

'বোতলের গায়ে যে-সংকেত ছিল তার প্রথম দু'লাইনের মানে বের করতে পেরেছি। অন্য লাইনগুলোর মানে বের করতে সময় লাগবে। আমার মনে হয় আমরা কোনো একটা সূত্র মিস করছি।'

'ওই দু'লাইন থেকে কী জানতে পারলে?'

'যা জানতে পেরেছি তার মানে বুঝতে পারছি না।'

'মানে?'

'মানে আমার মনে হয় কোনো ধাঁধা দেয়া হয়েছে: ফলি অভ ক্যাপেটিয়ান, সেবাস্টিয়ান'স রেভেলেশন/আ সিটি আণ্ডার ক্যাননি/ফ্রম দ্য থার্ড রেল্‌ম অভ দ্য ফরগটেন আ সাইন দ্যাট ইটার্নাল শিওল উইল ফেইল।'

শূন্য দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা। আর রানা তাকাল ব্রোশিয়ারটার দিকে, কী যেন ভাবছে। কিছুক্ষণ পর বলল, 'শ্যাতো দ'ইফ।'

'মানে?' রানার মন্তব্য বুঝতে পারেনি অপি।

সেবাস্টিয়ানের কাছ থেকে যা জানতে পেরেছে সংক্ষেপে অপিকে বলল রানা। তারপর বলল, 'দ'ইফের বোতলগুলো পেয়েছে সেবাস্টিয়ানের ভাই। যে বংশে রাজা প্রথম ফ্রান্সিস জন্মেছেন সে বংশের নাম ক্যাপেটিয়ান। শ্যাতো দ'ইফ বানানোর আদেশ দিয়েছিলেন তিনিই। দুর্গটার দুর্বলতার কথা ফাঁস করে

দেয় যে-সামরিক ইঞ্জিনিয়ার, তার নামের প্রথম অংশ সেবাস্টিয়ান। সিটি আণ্ডার ক্যানন বলতে এখন যে-শহরে আছি আমরা সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। দ'ইফে যারা কামান বসিয়েছিলেন তাঁদের মাথায় কী ছিল আল্লা জানে, বেশিরভাগ কামান সাগরের দিকে তাক না করে শহরের দিকে তাক করে রেখেছিল। শত্রু হামলা করলে কামান দাগবে কীভাবে সে-কথা ভাবেনি একবারও। এজন্যই ম্যালমস্ককে বলা হচ্ছে সিটি আণ্ডার ক্যানন।'

'মাসুদ ভাই, আপনি একটা জিনিয়াস!' অপির গলায় নিখাদ প্রশংসা।

মুচকি হাসল রানা। 'এখানে আসার আগে একটা ব্রোশিয়ার কিনেছি, তাতে অনেক কথাই লেখা আছে শ্যাতো দ'ইফের ব্যাপারে। পড়লে, আমি যা যা বলছি, তা বলতে পারবে যে-কেউ। এবার এসো শিওলের প্রসঙ্গে। এটা ব্রোশিয়ারে নেই, তবে আমি জানি। শিওল একটা হিব্রু শব্দ। এর মানে মরা মানুষের বাড়ি। অন্যকথায় আণ্ডারওয়ার্ল্ড। ইটার্নাল শিওল হচ্ছে ঠিক তার উল্টো—অনন্ত জীবন বা চিরজীবন।'

'অন্য লাইনটা?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'দ্য থার্ড রেল্ম অভ দ্য ফরগটেন?'

'এর মানে যতদূর বুঝতে পারছি—ভুলে যাওয়া। একটু আগে দ'ইফের ভূতল-কারাগারের কথা বললাম না? ওখানে কাউকে একবার ঢোকানো হলে ধরে নেয়া হতো মরার আগে বের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ হতভাগ্য লোকটার কথা ভুলে যেত সবাই। আমার মনে হয় কিছু একটা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে যদি আমরা শ্যাতো দ'ইফে যাই।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা কথা থেকে যায়। এত ধাঁধা বানানোর দরকার কী ছিল? সহজ করে বললেই তো হতো শ্যাতো দ'ইফে

যাও, এত নম্বর ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে ঢোকো, খুঁজে দেখো অমুক জিনিসটা পাও কি না।'

'তা হলে তো মজাটাই নষ্ট হয়ে যেত,' সোহানার অভিযোগের জবাবে বলল অপি। 'ধাঁধা বানিয়েছে বলেই না ব্যাপারটা এত ইন্টারেস্টিং লাগছে। যা-হোক, লোরনের বইয়ের ব্যাপারে কিছু বলি। যতদূর পড়েছি, আমার কাছে মনে হয়েছে ওটা অর্ধেক ডায়েরি, বাকি অর্ধেক কোনো রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি। লোরন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন বোতলগুলো আসলে কোন রকম পুরস্কার না। তাঁর মতে, বোতলগুলো হচ্ছে একটা ম্যাপের উপর কতগুলো তীর চিহ্ন।'

'কীসের উপর তীর চিহ্ন?' সোহানা বুঝতে পারেনি।

'ম্যাপের উপর।'

'কীসের ম্যাপ? কোথায় যেতে বলা হচ্ছে? কী অনুসরণ করবো আমরা?'

'সেটা বলেননি লোরন। অথবা বললেও আমি বুঝতে পারিনি। অনুবাদের কাজটা ঠিকমতো শেষ করতে পারলে বুঝতে পারার সম্ভাবনা আছে।'

'আমার মনে হচ্ছে লোরন যা করেছেন, নেপোলিয়নের আদেশেই করেছেন,' বলল রানা। 'এখন বুঝে দেখো। বোতলগুলো লুকানোর জন্য যদি এত কষ্ট করে থাকেন লোরন, তা হলে "তীরচিহ্নিত" ম্যাপ আমাদেরকে কোন্ মহামূল্যবান জিনিসের কাছে নিয়ে যেতে পারে?'

'ঠিকই বলেছ, রানা, জিনিসটা মহামূল্যবান। আর সে-জন্যই রক্তে হাত রাঙাতে দ্বিধা করছে না সিদোরভ।'

অপির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে লাইন কেটে দিল রানা।

'হায় খোদা!' নিচু গলায় বলল সোহানা, চোখের ইশারায়

দেখাচ্ছে রাস্তায় ওপারটা। 'দেখো কে এসেছে!'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। চমকে উঠল খানিকটা। মেলিখান। দু'হাত জ্যাকেটের পকেটে ভরে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। একদৃষ্টিতে দেখছে রানা-সোহানাকে। রানাকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে দেখে রাস্তা পার হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল অলস পায়ে।

অপ্রস্তুত বোধ করছে সোহানা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। উঠে চলে যাবে কি না জানতে চাচ্ছে নীরবে। মাথা নাড়ল রানা, ইশারায় জানিয়ে দিল কিছু হবে না।

'রিল্যাক্স,' রানাদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল মেলিখান, 'তোমাদেরকে দেখে মনে হচ্ছে মানুষ না, সামনে বাঘ দেখছ।' হাসার চেষ্টা করল, কিন্তু হাসিটা যে মেকি তা বোঝা গেল। 'প্রকাশ্য দিবালোকে এত মানুষের সামনে তোমাদেরকে খুন করার মতো বোকা নই আমি।' জ্যাকেটের পকেট থেকে দু'হাত বের করে উপরে তুলে দেখাল। 'আনআর্মর্ড।'

'কবরস্থানের আতিথেয়তা খেয়াল আছে তো?' হালকা গলায় জানতে চাইল রানা, সতর্ক করতে চায় মেলিখানকে।

কিছু না বলে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল মেলিখান।

'তা, কী দিতে বলবো তোমার জন্য?' আবারও প্রশ্ন করল রানা। 'প্রথমে গলা ভেজাবে, তারপর অ্যাপেটাইযার, তারপর ভারী খাবার, শেষে ডেযার্ট?'

'কবরস্থানে ইচ্ছা করলে মেরে ফেলতে পারতে আমাদেরকে,' রানার টিটকারি গায়ে না মেখে বলল মেলিখান। 'যদি গুলি করতে, ওই নির্জন এলাকায় গিয়ে ঘটনা কী দেখত না কেউ। আর দেখলেও তোমাদেরকে ফাঁসাতে পারত না। তা হলে শেষ করে দিলে না কেন, মিস্টার?'

'আমরা খুনি না,' বলল রানা। 'নিতান্ত বাধ্য না হলে কারও গায়ে হাতও তুলতে চাই না।'

'কিন্তু তোমার গায়ে হাত তোলার কায়দা দেখলে যে-কেউ বলবে তুমি প্রফেশনাল,' বলল মেলিখান।

'আনআর্মর্ড কমব্যাট শিখতে নিশ্চয়ই বাধানিষেধ নেই কোনো দেশের সংবিধানে? এবার একটা কথা বলো। জানি জানতে চাইলে বলবে না, তারপরও জিজ্ঞেস করছি। এভাবে চুম্বকের মতো আমাদের পিছনে লেগে আছো কীভাবে? আমরা কখন কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি জানতে পারছ কী করে?'

হাসল মেলিখান, কিন্তু সেই হাসিতে প্রাণ নেই। বলল, 'জানি জানতে চাইলে বলবে না, তারপরও জিজ্ঞেস করছি। তোমরা কী করছ এখানে?'

'তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো আর কোনো জায়গা না পেয়ে এখানে এসেছিলাম। এখন দেখছি ভুল হয়ে গেছে। একটা কথা সরাসরি বলি। তোমাদের উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার না আমার কাছে। তোমার সহকর্মী আমার বন্ধুকে কিডন্যাপ করল, পেটাল, আমরা গিয়ে হাজির না হলে মেরেই ফেলত। তুমি নিজে আমাদেরকে শেষ করে দেয়ার চেষ্টা করলে দু-দু'বার। যেখানেই যাচ্ছি, আঠার মতো লেগে আছো আমাদের সঙ্গে। কেন?'

হাই তুলল মেলিখান, রানার কথায় কোনো আগ্রহই নেই যেন। 'শোনো, আমি যার হয়ে কাজ করছি তিনি যুদ্ধবিরতি চান। সেই প্রস্তাব পাঠিয়েছেন আমাকে দিয়ে।'

'যুদ্ধবিরতি?'

'আর কী বলতে পারি, বলো? আমরা আমাদের সর্বশক্তি নিয়ে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছি তোমাদের উপর, আর বার বার তোমরা নাকানিচুবানি খাইয়ে ছাড়ছ আমাদেরকে। এরচেয়ে একটা পার্টনারশিপে আসা কি ভালো না?'

'পার্টনারশিপ?' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তোমরা যাকে

পার্টনারশিপ বলছ, আমাদের জন্য সেটা সোজা কথায় মরণফাঁদ। বোঝো সেটা?'

'মানে?'

'মানে তুমি যার হয়ে কাজ করছ তিনি একটা প্রস্তাব দিতে চাচ্ছেন আমাদেরকে, তা-ই না? যে-জিনিসটা হাতে পেতে চাচ্ছ তোমরা তা খুঁজে বের করে দেবো আমরা, তুমি আর তোমার সাঙ্গপাঙ্গরা পাহারা দেয়ার নাম করে সবসময় চোখে চোখে রাখবে আমাদেরকে। কাজ শেষে জিনিসটা যখন তুলে দেবো তোমাদের হাতে তখন সম্মানি হিসেবে মাত্র দুটো বুলেট খরচ করে পরপারে পাঠিয়ে দেবে আমাদের দু'জনকে, এই তো?'

'না, মিস্টার রানা, বলতে বাধ্য হচ্ছি তুমি বেশিমাত্রায় সন্দেহপ্রবণ। হাত মেলাতে চাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে, অথচ তুমি সেই হাতকে ফাঁদ মনে করছ। যা-হোক, আমাদের প্রস্তাবটা সরাসরি বলে ফেলি। জিনিসটা খুঁজে বের করে তুলে দেবে আমাদের হাতে, পার্সেন্টেজ হিসেবে আশি আমাদের, বিশ তোমাদের।'

'কলুর বলদ পেয়েছ তো আমাদেরকে,' মনে মনে বলল রানা। মুখে বলল, 'দেখো একটা কথা বলি, বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা। কী খুঁজতে হবে তা-ই কিন্তু জানি না আমরা।'

কিছুক্ষণ রানার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেলিখান। তারপর বলল, 'এমন কিছু যেটার দাম অনেক। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও, টাকার দিক দিয়েও।'

'তা আপনার নিয়োগকর্তা মহান সিদোরভ কোন্টার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী?' জানতে চাইল সোহানা। 'ইতিহাস, না টাকা?'

ওর দিকে তাকাল মেলিখান। 'আপনারা দেখছি অনেক খবরই রাখেন। যা-হোক, মিস্টার সিদোরভ কোন্টার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী তা দিয়ে আমাদের কাজ কী? আমরা তাঁর হয়ে কাজ

করবো, তিনি আমাদের বেতন বা সম্মানি দেবেন। সোজা হিসাব।'

চুপ করে আছে রানা-সোহানা।

'তবে আমি যতদূর জানি,' বলে চলল মেলিখান, 'ব্যাপারটা মিস্টার সিদোরভের বংশমর্যাদার সঙ্গে জড়িত। অনেকদিন আগে একটা কাজ শুরু করেছিলেন তিনি, এখন সেটা শেষ করার চেষ্টা করছেন। এ-কাজে যদি সাহায্য করো তোমরা, তিনি যারপরনাই কৃতজ্ঞ থাকবেন।'

'আর আজকের পর আবার যদি এ-রকম কোনো প্রস্তাব নিয়ে আসো,' গাল চুলকাতে চুলকাতে বলল রানা, 'আমিও যারপরনাই বিরক্ত হবো। এবং আমি বিরক্ত হলে কী করি তা নিশ্চয়ই জানা হয়ে গেছে?'

দাঁতে দাঁত পিষল মেলিখান, সরু গালে ফুটে উঠল চোয়ালের হাড়। 'আমার মনে হয়, বড় বড় কথা বলার আগে চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখা উচিত তোমার, মিস্টার রানা।'

তাকাল রানা-সোহানা। ওদের অভিজ্ঞ চোখ মেলিখানের লোকদেরকে চিনতে সময় নিল না। আপাতত তিনজন। একেকজন পজিশন নিয়েছে একেকদিকে, কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি, যাতে পিস্তল বা রিভলভারের রেঞ্জের মধ্যে রাখতে পারে রানা-সোহানাকে। এদেরকে আগেও দেখেছে ওরা—রাম কে'র সেই গুহায়।

'ওদের একটু কাছে আসতে বলো না,' যেন অন্যায় আবদার করছে এমন ভঙ্গিতে বলল রানা, 'একটু আদর করি!'

'দেখো মিস্টার রানা,' মেলিখানের কণ্ঠ চাঁছাছোলা, 'আরও অনেক লোক আছে আমার। কোথায় যাবে তোমরা? পাতাল-স্বর্গ-নরক সব জায়গায় যেতে পারবো আমি তোমাদের পিছু পিছু। আজ না হোক কাল, কাল না হোক পরশু, যা খুঁজছি তা পেয়ে

যাবো ঠিকই, তোমাদের সাহায্য ছাড়াই। এবার সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব তোমাদের—যা বলছি তা করবে, নাকি নিজেদের খারাবি ডেকে আনবে।'

'যা বলছ তা তো করবোই না, বরং তোমাদেরই খারাবি ডেকে আনবো,' চ্যালেঞ্জ করার সুরে বলল রানা। 'দেখে নিয়ো।'

মুচকি হাসল মেলিখান। 'আমার মনে হয় মিস্টার সিদোরভের নাম জানো তোমরা, পরিচয় জানো না। জানলে এত আস্পর্ধা দেখাতে পারতে না। যা-হোক, তোমরা কী করবে, আর কী করবে না তা তোমাদের ইচ্ছা। কাজের কথায় ফিরে যাই। আমার মনে হয় না কোডবুকটা সঙ্গে করে আনার মতো বোকামি করেছ তোমরা, নাকি?'

'কোডবুক?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা, আসলে খেপিয়ে তুলতে চাচ্ছে মেলিখানকে, 'সেটা আবার কী? খায়, না মাথায় দেয়?'

আবারও দাঁতে দাঁত পিষল মেলিখান। 'আমার মনে হয় ইতিমধ্যেই সেটা চালান হয়ে গেছে তোমার লোকদের কাছে। ওরা হয়তো ডিকোড করতে শুরু করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ আগে দেখলাম ফোনে কার সঙ্গে যেন কথা বলছিলে। দু'-একটা সংকেতের মানে হয়তো বের করে জানিয়ে দিয়েছে তোমাদেরকে, ঠিক না?'

'হ্যাঁ, ঠিক,' বিজ্ঞের মতো মাথা ঝাঁকাল রানা। 'লোরনের কোডের প্রথম কয়েকটা সংকেতের মানে জানি আমরা।'

'যেমন?' কৌতূহল সামলাতে না পেরে জিজ্ঞেস করে ফেলল মেলিখান।

'যেমন, প্রথম লাইনে লোরন বলছে, যে বা যারা ওর কোড কাজে লাগিয়ে খারাপ কাজ করতে চায় তাদেরকে নাগালে পাওয়ামাত্র কষে লাথি মারতে হবে পাছায়।'

লাল হয়ে গেল মেলিখানের চেহারা। নিজেকে সংযত রাখতে কষ্ট হচ্ছে তার। উঠে দাঁড়াল ধীরে ধীরে। 'শেষবারের মতো বলছি, মিস্টার রানা। আমাদের প্রস্তাবটা ভেবে দেখো।'

'আমরা কেউ বেঁধে রাখিনি তোমাকে,' মেলিখানের চোখে চোখ রেখে বলল রানা। 'কাজেই আমার মনে হয় তুমি ইচ্ছে করলেই যেতে পারো।'

চার

চলে গেছে মেলিখান। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা-সোহানা। তারপর স্যাটেলাইট ফোনটা বের করে সোহেলের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা।

'কী রে শালা!' মস্করা করার সুযোগ পেলে ছাড়তে রাজি না সোহেল, 'চুটিয়ে ইয়ে করার সময় আবার আমার কথা মনে আসে কেন?'

ঠাট্টা-তামাশায় না গিয়ে পরিস্থিতি সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলল রানা।

'মেলিখানের ব্যাপারে আরও কিছু খোঁজখবর করেছি আমি,' মনোযোগ দিয়ে শোনার পর বলল সোহেল, 'বেশ কয়েক বছর আগে চেচনিয়ায় থাকত সে। তখন সেখানে কালোবাজারে বিক্রি হতো এ.কে. ফোর্টি সেভেন রাইফেল, দালালের ভূমিকা পালন করত শয়তানটা। তুই জানিস কি না জানি না, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের যে-বিশাল তালিকা আছে ইন্টারপোলের হাতে, সেখানে

ওর নামও আছে।'

খবরটা জানত না রানা বা সোহানা।

'এখন মনে কর্, সেন্ট্রাল ডাইরেক্টরেট জুডিশিয়াল পুলিশ,' বলছে সোহেল, 'অর্থাৎ এফ.বি.আই.-এর ফরাসি ভার্শনকে যদি কোনোভাবে জানিয়ে দেয়া যায় মেলিখান ফ্রান্সে, শয়তানটার পিছনে পাগলা কুত্তার মতো লেগে যাবে ওরা। পরোয়ানা জারি করে গ্রেপ্তার করতে পারবে কি না জানি না, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য ওকে আর ওর চ্যালাদেরকে আটকে রেখে হয়রানি করতে পারবে।'

'তা হলে কর্ কাজটা,' রানা বলল। 'তাতে ভয় খাবে মেলিখান। এত খোলাখুলি কাজ করার সাহস পাবে না।'

'ঠিক আছে। আর কিছু বলবি?'

'না,' সোহানাকে উঠে পড়ার ইঙ্গিত করে রানা। 'কী হলো জানাস আমাকে পরে।'

ঘণ্টাখানেক পর, তখন হোটেলরুমে ফিরে এসেছে রানা-সোহানা, ফোন করল সোহেল। রানা রিসিভ করামাত্র বলল, 'মৌচাকে ঢিল পড়েছে। ফরাসি পুলিশ বুলেটিন জারি করেছে মেলিখানের ব্যাপারে। নেটওয়ার্ক যতই শক্তিশালী হোক, অন্তত ঘণ্টা-দু'ঘণ্টার আগে কিছু জানতে পারবে না শয়তানটা। আরেকটা কথা। এর আগে আমার পরিচিত এক লোকের কাছে পাঠিয়েছিলাম তোকে, আগ্নেয়াস্ত্র পেয়েছিলি ওর কাছ থেকে। চাইলে আরেক লোকের ঠিকানা দিতে পারি এখন। তোরা যে-জায়গায় আছিস, তার ধারেকাছেই আছে।'

'বল্,' কাগজ-কলম টেনে নিল রানা। ঠিকানাটা লেখা শেষ করে লাইন কেটে দিয়ে তাকাল সোহানার দিকে। 'যা খুঁজছি আমরা সেটার ব্যাপারে মেলিখানের-বলা কথাগুলো খেয়াল আছে?'

'কোন্ কথা?'

'এমন কিছু, যেটার দাম অনেক। ঐতিহাসিক দিক দিয়েও, টাকার দিক দিয়েও।'

'তো?'

'মেলিখান বলেছে ওটার সঙ্গে নাকি সিদোরভের বংশমর্যাদা জড়িত। আমার মনে হয় ব্যাটা বংশমর্যাদা বলতে আসলে পারিবারিক ইতিহাস বোঝাতে চেয়েছে।'

'ভালো পয়েন্ট। কথাটা অপিকে জানাচ্ছি না কেন?'

স্যাটেলাইট ফোনে অপির সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা।

'ধাঁধাটার তিন আর চার নম্বর লাইন নিয়ে কাজ করছি,' রিসিভ করেই বলল অপি, 'কিন্তু আপনাদেরকে জানানোর মতো তেমন কিছু জানতে পারিনি এখনও। আমার কী মনে হয় জানেন? তৃতীয় কোনো সূত্র আছে কোথাও-না-কোথাও।'

'তৃতীয় সূত্র?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'লোরেনের কোডবুকটা- প্রথম সূত্র। আমাদের কাছে যে-বোতলটা, মানে, ধাঁধাটা আছে, সেটা দ্বিতীয়। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তৃতীয় আরও কিছু একটা আছে। এই তিনটেকে একসঙ্গে করতে পারলে...'

'সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে আমার কাছে,' বলল সোহানা।

'আমাদের অবস্থান থেকে চিন্তা করলে পুরো ব্যাপারটা জট পাকানোর মতোই। কারণ এক, আমরা ঘটনার মাঝখান থেকে ঢুকে পড়েছি। দুই, এখনও ঠিক জানি না কী খুঁজতে হবে আমাদেরকে, কোথায় খুঁজতে হবে। এ-অবস্থায় অনুমানের সাহায্য নেয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'যেমন?'

'যেমন আসল বাক্স থেকে সরিয়ে আলাদা আলাদা জায়গায়

বারোটা বোতল লুকিয়ে রেখেছেন লোরন। ম্যাপের গায়ে তীরচিহ্ন বলতে হয়তো এই বোতলগুলোকেই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি।'

রানা বলল, 'সোহেল একবার আমাকে বলেছিল, তোমাদেরকে বলতে খেয়াল ছিল না আমার, সিদোরভের নাকি পারস্যের জিনিস সংগ্রহ করার বাতিক আছে। ওকে চেনে এ-রকম যে-কেউ নাকি ওর এই দুর্বলতার কথা জানে। কাজেই আমরা যা খুঁজছি সে-জিনিসটার নাম পারশিয়ান অ্যান্টিক রাখলে কেমন হয়?'

'ভালো,' বলল সোহানা।

'যুৎসই,' মন্তব্য করল অপি।

'তা হলে লোরন যে-ধাঁধা তৈরি করেছেন সেটার ব্যাপারে আমার অনুমানটা বলি,' রানা বলল। 'বারোটা বোতল বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। একটা করে বোতল খুঁজে বের করতে হবে, লেবেলের গায়ে যে কোড আছে তা জানতে হবে, শেষে কোডবুক থেকে সেটার মানে বের করতে হবে। এভাবে সবগুলো বোতল থেকে পুরো কোডটার মানে বের করতে পারলে জানা যাবে কোথায় আছে সেই পারশিয়ান অ্যান্টিক।'

'কিন্তু কোন্‌টা এক নম্বর বোতল কোন্‌টা দু'নম্বর বুঝবো কী করে?' সোহানা জানতে চাইল।

'আমার মনে হয় এ-রকম কোনো ধারাবাহিকতা নেই। যে-কোনো বোতল খুঁজে পেলে অন্য বোতলগুলো কোথায় আছে জানা যাবে। এভাবে লেগে থাকলে উদ্ধার করা যাবে বারোটা বোতল।'

সোহানা বলল, 'যদি তা-ই হয় তা হলে শ্যাতো দ'ইফে তিনটে বোতল লুকাতে গেলেন কেন তিনি?'

'জানি না। আরেকটা কথা। বারোটা বোতলের মধ্যে অন্তত একটা ভেঙে গেছে—রে হোগান যেটা খুঁজে পেয়েছিল

জলাভূমিতে। তারমানে অন্তত একটা ধাঁধা, অন্যকথায় একটা সূত্র হারিয়ে ফেলেছি আমরা।'

'কথাটা আমিও ভাবছিলাম।'

'অপি, রাম কে থেকে যে-বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে গেল মেলিখানরা, কী মনে হয় তোমার, সেটা থেকে ধাঁধার মানে বের করতে পারবে ওরা?'

'সম্ভবত না। কারণ ডিকোডিং বুকটা নেই ওদের কাছে। ওরা যেভাবে লেগে আছে আপনাদের পিছনে, আমার মনে হয় ধাঁধার মানে বের করার চেষ্টা বাদ দিয়েছে আরও আগেই। এখন আপনাদেরকে ফলো করে দেখতে চায় ঠিক জায়গায় যেতে পারেন কি না আপনারা, উদ্ধার করতে পারেন কি না সেই অ্যান্টিক। যদি পারেন, সন্দেহ নেই, আপনাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে।'

'তার মানে...' রানার দিকে তাকাল সোহানা।

'হ্যাঁ, তার মানে রাম কে'র বোতলটা উদ্ধার করতে না পারলে পারস্য অ্যান্টিক খুঁজে বের করার আশা বাদ দিতে হবে আমাদেরকেও।'

'তার মানে...' বলতে গিয়ে আবারও থেমে গেল সোহানা।

'হ্যাঁ, তার মানে ওই বোতলটা, অন্তত পক্ষে ওটার গায়ের কোডটা উদ্ধার করে আনার জন্যে সিংহের গুহায় হামলা চালাতে হবে আমাদেরকে।'

মার্সেই থেকে দু'হাজার মাইল পুবে, সেভ্যাস্টাপোলে নিজের সুসজ্জিত স্টাডিরুমে বসে আছে সিদোরভ। চমৎকার কারুকার্যখচিত বিশাল পারস্য ডেস্কটার পিছনে কেমন ছোটো দেখাচ্ছে ওকে। হাত দুটো ডেস্কের উপরে রাখা, জড়াজড়ি করে আছে দশটা আঙুল, যেন প্রার্থনা করছে। ওর সামনে বেশ বড়

একটা চামড়ার-ব্লটার, মধ্য ফ্রান্সের বার্গাণ্ডি অঞ্চল থেকে বিশেষ অর্ডার দিয়ে বানিয়ে-আনা। ওটার উপর ডজনখানেক হাই-রেযোলুশন রঙিন ফটোগ্রাফ। বিশেষ কতগুলো প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে বানানো একটা লাইন হাইলাইট করা হয়েছে প্রতিটা ছবিতে। ডেস্কের উপর, ব্লটারের পাশে, পড়ে আছে শক্তিশালী একটা ম্যাগনিফাইং-গ্লাস। হতাশ দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকিয়ে আছে সিদোরভ।

গত এক ঘণ্টায় গ্লাসটা দিয়ে কম করে হলেও দশবার ছবিগুলো দেখেছে সে। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি। সময় যত যাচ্ছে তত অধৈর্য হয়ে পড়ছে সে, বাড়ছে বিরক্তি, ওই চিহ্নগুলোকে পাগলামি ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না ওর কাছে। একটা বর্গক্ষেত্রের সমকোণ, দ্বিধাবিভক্ত ওমেগা, বাঁকানো চাঁদের মতো কী যেন...

ধুর ছাই!

হঠাৎ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল সিদোরভ, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছোঁ মেরে তুলে নিল ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা, সজোরে ছুঁড়ে মারল সেটাকে। দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ে ভেঙে চুরমার হলো জিনিসটা। এরপর সিদোরভের নজর পড়ল ব্লটারের উপর সাজানো ছবিগুলোর উপর। বাঘ যেভাবে থাবা চালায় শিকারের গায়ে সেভাবে থাবা মারল সে ছবিগুলোকে। অর্ধেক ছবি ছড়িয়ে পড়ল ডেস্কের উপর। বাকি অর্ধেক উড়াল দিল বাতাসে, ভেসে বেড়াল দু'-এক সেকেণ্ড, তারপর নিঃশব্দে পড়ল দামি, পুরু, নরম পারশিয়ান কার্পেটের উপর।

ধপাস করে বিশাল চেয়ারে বসে পড়ল সিদোরভ। রাগ সামলাতে হেলান দিল চেয়ারে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে।

বোতলগুলোর কোনো দাম নেই ওর কাছে। কারণ প্রথম

কথা, ওগুলো পারস্যের না। দ্বিতীয়ত, ওগুলো নিলামে তুললে যে-টাকা পাওয়া যাবে তা তেমন কিছু না ওর কাছে। যে বা যারা সংগ্রহে রাখার জিনিস নিলামে তুলে কিছু কামাই করে তাদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না সিদোরভ। অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই, ওর নিজের "পারস্য সংগ্রহশালার" অনেক অ্যান্টিকই নিলামে কেনা।

রানা আর সোহানা। নাম দুটো মনে পড়তেই দাঁতে দাঁত পিষল সিদোরভ। ঘেন্না করে সে ওই দু'জনকে। কারণ আরনঁদ লোরনের কোডবুকটা হাতিয়ে নিয়ে সিদোরভের নাকের সামনে দিয়ে পালিয়ে গেছে ওরা। কী করছে ওরা এখন? কোডবুকটা কাজে লাগিয়ে লোরনের মেসেজগুলো ডিকোড করছে? কিন্তু সবগুলো মেসেজ নেই ওদের কাছে, সিদোরভ নিশ্চিত।

কোডবুকটা হারানোর সব দোষ মেলিখানের উপর চাপানো যায় না, মনে মনে স্বীকার করল সিদোরভ। সে নিজেও তো রানা-সোহানার ক্ষমতাকে খাটো করে দেখেছে। প্রথমে ভেবেছে ওরা দু'জন সামান্য অ্যান্টিক শিকারী; নিয়াযভ বা মেলিখান অথবা ওদের দলবল দেখে লেজ গুটিয়ে পালাবে। কিন্তু রানা-সোহানার দাপটে লেজ গুটাতে হয়েছে ওর নিজেকেই।

নিজ হাতে গুলি করে মেরেছে সে এত বছরের বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়াযভকে। ওর দায়িত্ব তুলে দিয়েছে মেলিখানের কাঁধে। কিন্তু সে-বেচারাও কোনও সুবিধা করতে পারছে না। বার বার ঘোল খাইয়ে ছাড়ছে ওকে রানা-সোহানা।

শেষপর্যন্ত সাপ বেরিয়ে এসেছে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে—জানা গেছে রানা নাকি ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটার মেরিন এজেন্সি ওরফে নুমা'র ডিরেক্টর, আর সোহানাও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত প্রতিষ্ঠানটার সঙ্গে। অনেক জায়গায় লোক আছে ওদের, খাতির আছে বিশ্বের বড় বড় দেশের হর্তাকর্তাদের সঙ্গে। ওরা, বিশেষ করে রানা কাজ

করেছে কয়েকটা দেশের ইন্টেলিজেন্সের হয়ে, কখনও কখনও এমনকী দেশগুলোর সরকারপ্রধানের অনুরোধে। কাজেই এই লোকের পক্ষে নিয়াযভ বা মেলিখানকে নাকানিচুবানি খাওয়ানো কোনও ব্যাপারই না।

রানা কে বা কী করে, জোর করে সে-চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিল সিদোরভ। এখনকার সমস্যাটা নিয়ে ভাবার চেষ্টা করছে। মনে হয় লোরনের সবগুলো কোড নেই রানা-সোহানার কাছে। থাকার কথা নয়। মেলিখান আঠার মতো লেগে আছে দু'জনের পিছনে। কখন ওরা কী করছে না করছে, নিজের অফিসরুমে বসে সে-খবর পেয়ে যাচ্ছে সিদোরভ। আপাতত ওদেরকে চোখে চোখে রাখাটাই মেলিখানের কাজ। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

'নেপোলিয়নের গুপ্তধন,' পিঠটা চেয়ারের সঙ্গে আরেকটু ঠেসে ধরে বিড়বিড় করে বলল সিদোরভ, 'মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করেছি আমি ওটার পিছনে। দরকার হলে আরও করবো। আমার রিসার্চাররা রীতিমতো ব্যবচ্ছেদ করে ফেলেছে ওই মানুষের জীবনটাকে। নেপোলিয়নের জীবনের দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত কী না জানি আমি? তাঁর প্রত্যেক বংশধরের ব্যাপারে জানা আছে আমার। জানি তাঁর বন্ধু কারা, পরামর্শদাতা কারা, কে কে তাঁকে মনেপ্রাণে ভালোবাসত। বিশেষ করে আরনঁদ লোরন। নেপোলিয়নের জীবনকাহিনি নিয়ে লেখা যত বই পেয়েছি সব স্ক্যান করে ঢুকিয়ে রেখেছি কম্পিউটার ডেটাবেইসে। সামান্য থেকে সামান্যতম সূত্রের খোঁজে সব তন্নতন্ন করছে আমার রিসার্চাররা। কিন্তু কী পেলাম শেষপর্যন্ত? অকেজো কতগুলো মদের বোতল। একটা মৌমাছির ছবিওয়ালা কিছু কোড যার আগামাথা বুঝতে পারছে না হারামজাদা রিসার্চাররা। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গেলার সময় ষোলোআনা, অথচ একটা কোডের মানেও বের

করতে পারল না। লাথি মেরে যদি সবগুলোর...'

বিড়বিড়ানি থামাতে হলো সিদোরভকে, কারণ ডেস্কের উপর রাখা টেলিফোনটা বাজছে। বিষদৃষ্টিতে সেটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর পিঠ সোজা করল সে, ছোঁ মেরে তুলে নিল রিসিভার। কানে ঠেকাল কিন্তু কিছু বলল না।

'হ্যালো?' অপরপ্রান্তে মেলিখানের গলায় উদ্বেগ। 'আমি মেলিখান।'

'আমি মেলিখান!' ভেংচি কাটল সিদোরভ। 'নরকে গিয়েছিলে? নাকি মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে টাল হয়ে ছিলে? গতরাতে না ফোন করার কথা তোমার?'

ঢোক গেলার চেষ্টা করল মেলিখান কিন্তু ঠিকমতো পারল না। 'গতকাল বিকেলেও দেখা হয়েছে ওদের সঙ্গে। আসলে দেখা হয়েছে মানে আমিই যেচে পড়ে দেখা করেছি। আমি... আমি... একটা শান্তিপ্রস্তাব দিয়েছি ওদেরকে।'

'কী দিয়েছ?' কান থেকে সরিয়ে রিসিভারটা দেখল সিদোরভ, যা শুনছে ঠিক শুনছে কি না সন্দেহ হচ্ছে।

'শান্তিপ্রস্তাব,' হে হে করে হাসার চেষ্টা করল মেলিখান কিন্তু হাসির শব্দ বের হলো না ওর মুখ দিয়ে, 'একরকম যুদ্ধবিরতি আর কী। পার্টনারশিপও বলতে পারেন।'

'যুদ্ধবিরতি? পার্টনারশিপ?'

'জী।'

নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে সিদোরভের। ডেস্কের উপর টেলিফোনটা ছাড়া আর তেমন কিছু নেইও যা ছুঁড়ে ভাঙা যায়। কিন্তু কথার মাঝখানে সেটটা ধ্বংস করা ঠিক হবে না। খেয়াল করল, রিসিভার চেপে-ধরা আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেছে কখন যেন। 'আমি কি তোমাকে এসব করতে বলেছিলাম?'

'না, বলেননি। কিন্তু যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেয়া আর যুদ্ধবিরতি

বজায় রাখা কি আলাদা কথা না?'

মেলিখানের চালটা বুঝতে পেরে কিছুটা শান্ত হলো সিদোরভ। 'কী বলল ওরা?'

'রাজি হয়নি।'

'কপোত-কপোতী এখন কোথায়?'

'মার্সেই-এ রয়ে গেছে।'

'রয়ে গেছে?' ভ্রূ কুঁচকাল সিদোরভ। 'মানে?'

'মানে আমাকে চামড়া বাঁচানোর জন্য পালিয়ে চলে আসতে হয়েছে। স্পেন সীমান্তের কাছাকাছি এক জায়গা থেকে কথা বলছি আপনার সঙ্গে।'

'কেন? কী হয়েছে?'

'ফরাসি পুলিশ পাগলা কুত্তার মতো খুঁজছে আমাকে। একটা বুলেটিন জারি করা হয়েছে আমার নামে।'

'রানা-সোহানা। ওরা ছাড়া আর কেউ করবে না এই কাজ। কিন্তু কথা হচ্ছে কাজটা করল কী করে?'

'সেটাই জানার চেষ্টা করছি। জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ করবো আপনার সঙ্গে।'

'কিন্তু তুমি যে পালাচ্ছ, কপোত-কপোতীর কী হবে? ওরা কোথায় গেল না গেল জানবো কী করে?'

'জানতে পারবেন। ব্যবস্থা করা আছে। মেলিখান কাঁচা কাজ করে না।'

'কিন্তু মেলিখান পাকা কাজও করে না, জেনে রেখো।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মন্তব্যটা হজম করে ফেলল মেলিখান। কথায় আছে নুন খাই যার গুণ গাই তার। আর মেলিখানের মতে, নুন খাই যার, তার শুধু নুনই খাই না, লাথিও খাই।

সে চুপ করে আছে দেখে সিদোরভ বলল, 'বইটার কী হলো?'

'জানি না। তবে আমার মনে হয় না সেটা জানা খুব বেশি জরুরি আমাদের জন্য। কারণ কোডগুলোর মানে বের করতে পারছি না আমরা। ওদিকে রানা-সোহানার হাতে কোডবুক আছে কিন্তু কোড নেই। কাজেই ওদের অবস্থাও অনেকটা আমাদের মতো। ওদের পিছনে আঠার মতো লেগে থাকতে বলেছিলেন আপনি আমাকে, আপাতত তা-ই করে যাবো বলে ঠিক করেছি। ওরা কিছু জানতে পারলে অথবা জানার চেষ্টা করলে মুভ করবে, সঙ্গে নড়ব আমরাও।'

চুপ করে থেকে কয়েক মুহূর্ত ভাবল সিদোরভ, কিন্তু মেলিখানের প্রস্তাবের চেয়ে ভালো কোনো বুদ্ধি বের করতে না পেরে বলল, 'ঠিক আছে, তা-ই করো তা হলে। আর শোনো, যখন যোগাযোগ করার কথা তখন ফোন দিতে যেন এক সেকেণ্ডও দেরি না হয়। সে-সময় যদি আজরাইল এসে তোমার জানও কবজ করতে থাকে, ফোন দিয়ে বলবে মারা যাচ্ছ। বুঝতে পেরেছ?'

'জী,' লাইন কেটে দিল মেলিখান।

ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল মেলিখান। সময় নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। যেন পা চলছে না এ-রকম পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়াল জানালার কাছে। ওটা খোলাই ছিল, মৃদুমন্দ বাতাসে বুক ভরে দম নিল কয়েকবার। শব্দ করে ছাড়ল।

'নেপোলিয়নের গুপ্তধন,' ওর বিড়বিড়ানি শুরু হলো আবার, 'ওটা উদ্ধারে এগিয়ে আছে কারা? রানা-সোহানা নাকি আমরা? আমাদের অবস্থা খরগোশের মতো। একছুটে এগিয়ে গেছি অনেকদূর, এখন ঝিমাচ্ছি। আর রানা-সোহানা কচ্ছপের মতো এগোচ্ছে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, ঠিক পথে যাচ্ছে।' দাঁত বের করে হাসল নিঃশব্দে। 'যাও বাছারা, দোয়া করি, ঠিক পথেই যাও। আমি জানি একদিন-না-একদিন কোনো-না-কোনো ভুল

তোমরা করবেই। দোয়া করি সেদিন যেন মেলিখান তোমাদের কাছেপিঠেই থাকে।'

পাঁচ

সেভ্যাস্টাপোল

ভাড়া-করা গাড়িটা রাস্তার ধুলো থেকে খানিকটা সরিয়ে পাহাড়ের কিনারা থেকে কয়েক ফুট ভিতরে থামাল রানা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সূর্য ডুববে। ওটা ইতিমধ্যে হেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। কৃষ্ণসাগরের বুকে খেলা করছে লালচে সোনালি আভা। রানা-সোহানা এখন যেখানে আছে সেখান থেকে খাড়া পাহাড়ি দেয়াল নেমে এসেছে সাগরের নীলচে সবুজ পানির সৈকতে। এই জায়গায় জড়াজড়ি করে আছে ডজনখানেক ছোট-বড় পাহাড়। নীচের সৈকতে বার বার আছড়ে পড়ে ফেনা তৈরি করছে কৃষ্ণসাগরের ঢেউ।

দূরে হঠাৎ ডেকে উঠল একটা সীগাল। তারপর আবার সব চুপচাপ। রানার পাশে, খোলা জানালায়, এখন শুধু বাতাসের হু হু শব্দ।

'সীগালটা কি বিপদের সিগনাল দিল আমাদেরকে?' ঠাট্টা করল সোহানা।

'মনে হয়। সিদোরভের বাড়িতে ঢুকে নেপোলিয়নের বোতল চুরি করে আনাটা যথেষ্ট বিপজ্জনক।'

'কাজটা কি বোকামি হয়ে যাচ্ছে না?'

'উপায় নেই। ধাঁধার সমাধান করতে হলে সবগুলো বোতল লাগবে। আর আমরা এ-রকম একটা অবস্থায় চলে এসেছি যে, পিছানো আর সম্ভব না।'

'কিন্তু...'

'আমি আসলে একটা সুযোগ নিতে চাই,' সোহানাকে থামিয়ে দিল রানা।

'কী রকম?'

'বছরের পর বছর ধরে ইউক্রেনিয়ান মাফিয়ার সর্দার সিদোরভ। নিজের উপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস চলে এসেছে ওর। সন্দেহ নেই ওর বাড়িতে ডজন ডজন প্রহরী আছে। কিন্তু অনেকদিন চর্চা না থাকায় ওদের গায়েও মরিচা পড়ে গেছে, অন্তত আমার তা-ই অনুমান। আর এ-সুযোগটাই নিতে চাইছি আমি।'

'এই ব্যাপারে অপির সঙ্গে কথা বলতে শুনলাম তোমাকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ওকে বলেছিলাম সিদোরভের বাড়ির নিরাপত্তা-ব্যবস্থায় কোনো ফাঁকফোকর আছে কি না জানতে পারবে নাকি। জানতে পেরেছে ও।'

'কী বলল?'

'আছে। অ্যান্টিক সংগ্রহ করার বাতিক আছে লোকটার। ওগুলো দেখভাল করার জন্য ছোটখাটো একটা এক্সপার্ট-টিমও আছে তার। এই টিমটাই সিদোরভের প্রথম ফোকর।'

'আর দ্বিতীয়?'

'যে-বিশাল এলাকায় সিদোরভের রাজত্ব, তার আশপাশে এবং ভিতরে ছোটবড় পরিত্যক্ত আরও কিছু ঘরবাড়ি আছে, দেখাশোনা করার মতো কেউ নেই। আশা করছি এগুলো পাহারা দিয়ে রাখার মতোও কেউ নেই। তিন নম্বর এবং শেষ ফোকরটা বলছি একটু পরে,' গাড়ি থেকে বের হলো রানা। ওর দেখাদেখি সোহানাও।

দু'জনে গিয়ে দাঁড়াল পাহাড়ের কিনারায়। তাকাল উত্তরদিকে। মাইলখানেক দূরে, উপকূল ঘেঁষে, সমুদ্রতীর আর সমতলভূমির মাঝখানে সেতুর মতো দাঁড়িয়ে-থাকা একটা পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু হয়েছে সিদোরভের এক শ' একরের রাজত্ব। কাগজে-কলমে ওই এলাকার নাম টাইখোন।

চুপ করে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সোহানা বলল, 'তিন নম্বর ফোকরটা কী?'

'অকস্মাৎ আক্রমণে হকচকিয়ে দেয়া।'

'অকস্মাৎ আক্রমণ?'

'ওর ঘাঁটিতে আমরা হামলা করতে পারি এটা স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না সিদোরভ। আর সেটাই আমাদের সবচেয়ে বড় সুবিধা। এবার শোনো ওর বাড়ির ব্যাপারে কয়েকটা কথা বলি। বাড়ি না বলে ওটাকে প্রাসাদ বললেই মানায় বেশি। আয়তনে ত্রিশ হাজার বর্গফুট, পাঁচ তলা। ছাদ ঢালাই করার সময় স্লেটপাথর ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো আছে। তামার প্রলেপ দেয়া গম্বুজাকৃতির মিনার আছে একাধিক। পুরো বাড়ি ঘিরে রেখেছে সিমেন্টের পুরু প্রলেপ দেয়া পাথরের দেয়াল। আর দেয়াল ঘিরে জায়গায় জায়গায় বানানো হয়েছে কাঁটাগাছের ঝোপ—যারা অনুপ্রবেশ করতে চায় তাদেরকে ঠেকানোর প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।'

রানার মুখের উপর থেকে চোখ সরিয়ে টাইখোনের দিকে আবার তাকাল সোহানা, দেখল কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ঐতিহাসিক কোনো কিছু জড়িত আছে এ জায়গাটার সঙ্গে।'

'ঠিকই ধরেছ,' শার্টের পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করল রানা, অপির সঙ্গে কথা বলার সময় নোট নিয়েছে। ওটা দেখে বলতে লাগল, 'আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে যাত্রা শুরু করে টাইখোন। তখন এক ক্রাইমিয়ান নিজের ঘাঁটি গেড়েছিল

এলাকাটাতে। ওই সর্দার আর তাঁর বংশধরেরা এক শ' বছরের মতো টিকে ছিল ওই জায়গায়। তারপর ওটা দখল করে নেয় জনৈক কোসাক মিলিটারি কমাণ্ডার। কিন্তু বছর ত্রিশেক পর তার চেয়েও শক্তিশালী আরেক কমাণ্ডারের হাতে চলে যায় টাইখোন ক্রাইমিয়ান যুদ্ধের সময় জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পক্ষে এলাকাটা দখল করে নিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করেন জনৈক অ্যাডমিরাল যুদ্ধের পর এখানে বানানো হয় একটা যাদুঘর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সোভিয়েত সৈন্যদের বিশাল একটা বাহিনী ঘাঁটি গাড়ে এখানে। পরে এটা পরিণত হয় সৈন্যদের অবকাশযাপন কেন্দ্রে। কিন্তু উপযুক্ত দেখভালের অভাবে দিন দিন জায়গাটার অবস্থা খারাপ হচ্ছিল। শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আলাদা হওয়ার পর অর্থলোলুপ ইউক্রেনিয়ান সরকার নিলামে তোলে টাইখোনকে। বলা বাহুল্য, শুনলে চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে এমন দামে পুরো জায়গা কিনে নেয় সিদোরভ। তারপর দু'বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই ধ্বংসস্তূপ থেকে বিলাসবহুল বাসস্থানে পরিণত করে সে একে।'

'বুঝলাম। কিন্তু তোমার প্ল্যানটা কী?'

হাতেধরা চিরকুটটা উল্টাল রানা, উল্টোপিঠের লেখাগুলো দেখছে। 'প্রথমে যে-সর্দারের কথা বললাম, সে আসলে ছিল একটা স্মাগলার।'

ভ্রূ কুঁচকাল সোহানা। 'তো?'

'পশুর দামি চামড়া, মণিমুক্তা, মদ, দাস—যখন যা পারত চোরাকারবারি করত।'

'ওই লোকের যা খুশি করুক, তার সঙ্গে তোমার প্ল্যানের সম্পর্ক কী?'

'একটু ধৈর্য ধরে শোনো, বুঝতে পারবে। চোরাকারবারি ব্যবসায় বড় একটা সমস্যা হলো, মাল লুট হয়ে গেলে

আইনপ্রয়োগকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করা যায় না। স্মাগলিং করতে গিয়ে ওই সর্দারকেও এই সমস্যায় পড়তে হলো। আরও কয়েকজন সর্দার একসঙ্গে হয়ে লুট করতে লাগল তার মাল। তখন দারুণ এক বুদ্ধি বের করল টাইখোনের প্রতিষ্ঠাতা।'

'কী?'

'দাসদেরকে কাজে লাগাল সে। টাইখোনকে ঘিরে-থাকা পাহাড় আর গিরিখাতের ভিতর দিয়ে অনেকগুলো সুড়ঙ্গ বানাল। পাচার করে আনার পর চোরাকারবারের মাল এসব সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রাখত সে। পরে সুযোগ বুঝে অন্য সুড়ঙ্গ দিয়ে চালান করে দিত মালগুলো। শক্ত পাহাড়ি মাটি কেটে সুড়ঙ্গ বানানো সহজ কাজ না, দাসদেরকে মেরেকেটেও খুব একটা লাভ হচ্ছিল না সর্দারের, কাজেই আরেকটা চাল চালে সে। দাসদের মনোরঞ্জনের জন্য অনেক দাসী কিনে এনে তাদেরকে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করেছিল, টাইখোনের এক পাহাড়ের নীচে বসিয়েছিল পতিতাপল্লী। ব্যস, আর যায় কোথায়? যে দাস সুড়ঙ্গ বানানোর কাজে যত বেশি শ্রম দেবে, রাত কাটানোর জন্য তত বেশি পতিতা পাবে সে এবং তার জন্য একটা পয়সাও খরচ করতে হবে না তাকে।'

'তারমানে এসব সুড়ঙ্গের কোনো একটা ধরে ঢুকে পড়তে চাচ্ছ সিদোরভের প্রাসাদে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তবে সিদোরভ এসব সুড়ঙ্গের কথা জানে কি না তা কিন্তু জানি না আমরা। যদি জেনে থাকে তা হলে কি সে ওগুলো বন্ধ করে দিয়েছে এতদিনে? যদি বন্ধ করে না থাকে, নিজের কোনো কাজে ব্যবহার করছে?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'উত্তর জানার কোনো উপায় আছে?'

'বেট্রো মিরোস্লাভ।'

'কে এই লোক?'

'সেভ্যাস্টাপোল ইউনিভার্সিটি অভ সাইন্স অ্যাণ্ড টেকনোলজিতে একটা আর্কাইভ আছে, সেটার কিউরেটর।'

'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে অপি আমাদেরকে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'সিদোরভের সুড়ঙ্গের সঙ্গে এই লোকের সম্পর্ক কী? আর আমাদের কাছে সব কথা বলবেই বা কেন সে?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবো আমরা। ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে রেখেছে অপি। সিদোরভের সুড়ঙ্গের সঙ্গে ওই লোকের সম্পর্কটা বুঝতে পারবে তখনই। আমাদের কাছে মিরোস্লাভ মুখ খুলবে কেন সেটা বলে রাখি। লোকটার বাবা ইউক্রেনিয়ান, মা ইটালিয়ান। ইউক্রেইন মোটেও ভালো লাগে না তাঁর, অনেক আগে থেকেই চেষ্টা করছেন ইটালিতে পাড়ি জমানোর। কিন্তু টাকার অভাবে পারছেন না। কিউরেটরের সামান্য চাকরি করে বেতন যা পান তা সংসারের পেছনেই খরচ হয়ে যায়। কিছুই জমাতে পারেন না। কোনোরকম সঙ্কোচ না করে অপির সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি, জানিয়ে দিয়েছেন উপযুক্ত টাকা পেলে টাইখোনের দুর্লভ ব্লুপ্রিন্ট তুলে দিতে রাজি আছেন আমাদের হাতে। সেই সঙ্গে সুড়ঙ্গগুলোর ব্যাপারে তাঁর অভিজ্ঞতাও শেয়ার করবেন আমাদের সঙ্গে।'

উপকূল থেকে কয়েক মাইল দূরে মামুলি এক রেস্টুরেন্টে দেখা হলো মিরোস্লাভের সঙ্গে।

রাত নেমেছে ততক্ষণে। রেস্টুরেন্টের ভিতরে আধো আলো আধো অন্ধকার। পেটমোটা হারিকেন জ্বালিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে প্রতিটি টেবিলের উপর। দেয়ালে ঝুলছে ফার্ন, তার আড়ালে আছে লাউডস্পীকার। স্থানীয় সফ্ট মিউযিক বাজছে।

সসেজ আর পিঁয়াজ ভাজার সুঘ্রাণ বাতাসে।

রেস্টুরেন্টের ভিতরে ঢুকে দরজা থেকে একটুখানি সরে দাঁড়াল রানা। কথামতো কোনার দিকের একটা টেবিলে বসে থাকবে মিরোস্লাভ। তাকাল রানা চারকোনায়। ওকে তাকাতে দেখেই হয়তো, একদিকের এক টেবিলে একাকী বসে-থাকা একটা লোক মাথা তুলে তাকাল। টানা পাঁচ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল রানা-সোহানার দিকে। তারপর, যেন চিনতে পেরেছে এমন ভঙ্গিতে খানিকটা উঁচু করল হ্যাট, কিছুক্ষণ পরই খুলে নামিয়ে রাখল টেবিলের উপর। মেনুটা টেনে নিল হঠাৎ, এতক্ষণ ওটার কথা মনেই ছিল না যেন। মনোযোগ দিয়ে দেখছে কী কী অর্ডার দেয়া যায়।

এ-রকম আচরণ করারই কথা ছিল মিরোস্লাভের। সোহানার দিকে তাকাল রানা, দৃষ্টি বিনিময় হলো দু'জনের। তারপর বিশেষ সেই টেবিলের দিকে হাঁটা ধরল ওরা। কিছু বলতে হলো না মিরোস্লাভকে, যার যার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল রানা-সোহানা।

ধবধবে সাদা ব্লাউয আর টকটকে লাল স্কার্ট পরিহিতা এক ওয়েইট্রেস এগিয়ে এল ওদের দিকে।

'কিছু খাবেন আপনারা?' রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল মিরোস্লাভ।

'না,' বলল রানা। মাথা নাড়ল সোহানাও।

মাথা ঝাঁকিয়ে ওয়েইট্রেসকে চলে যেতে বলল মিরোস্লাভ। মেয়েটা চলে যাওয়ার পর রানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস মাসুদ রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

কী কারণে যেন মাথা ঝাঁকাল মিরোস্লাভও, মাথা নিচু করে তাকিয়ে আছে মেনুর দিকে। লোকটা মধ্যবয়স্ক, কিন্তু দুর্ভাবনা-

দুশ্চিন্তার কারণে বয়স আরও বেশি মনে হয়। অর্ধেক মাথা জুড়ে টাক পড়ে গেছে। বেঢপ লম্বা নাকটা তিলেভরা। গালে বসন্তের দাগ। 'আপনারা টাইখোনে ঢুকবেন, নাকি?' হঠাৎ মুখ তুলে বলল সে।

'সে-রকম কিছু বলেছে নাকি আমাদের এজেন্ট?' বিরক্ত হওয়ার ভান করল রানা।

'না, বলেনি। আমি অনুমান করছি আর কী।'

'আপনার অনুমান ভুল, মিস্টার মিরোস্লাভ। আমরা আসলে ক্রাইমিয়ান ওঅরের উপর একটা বই লিখছি।'

'ও আচ্ছা। কথাটা আগেও বলেছে আপনাদের এজেন্ট, কিন্তু কেন যেন বেখাপ্পা মনে হয়েছে আমার কাছে। ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি। এখন আপনার মুখ থেকে শুনে নিলাম আরেকবার। তা, যে-বই লিখছেন তা কি সেভ্যাস্টাপোলের ইতিহাস নিয়ে, নাকি শুধু যুদ্ধ নিয়ে?'

'আসলে দুটো দিকই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবো আমরা,' গম্ভীর হওয়ার ভান করল রানা। 'ইউক্রেনিয়ান যুদ্ধ নিয়ে কিছু লিখতে হলে সেভ্যাস্টাপোলের ইতিহাস এড়ানো যাবে না। তাই ওদিকটাও হাইলাইট করতে চাচ্ছি।'

'তা হলে তো বিস্তারিত বিবরণের দরকার হবে আপনাদের,' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসছে মিরোস্লাভ। 'ভালো দাম দিতে হবে।'

'রাজি। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

'কী?'

'আপনার বিবরণ আসলেই বিস্তারিত হতে হবে। দুই, আমাদের বইয়ে চূড়ান্তভাবে কিছু লেখার আগে আপনার বক্তব্য যাচাইবাছাই করে দেখবো।'

'যত খুশি যাচাইবাছাই করুন, কোনো আপত্তি নেই। কারণ

আমার মনে হয় না টাইখোনের ব্যাপারে আমার চেয়ে ভালো তথ্য আর কেউ দিতে পারবে। তবে আগে একটা কথা বলুন তো। ওখানে এখন কে থাকে জানেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'না, জানি না। জানাটা কি জরুরি?'

দাঁত বের করে হাসল মিরোস্লাভ, যেন বোকার মতো কোনো প্রশ্ন করে ফেলেছে সোহানা। 'খুবই জরুরি। টাইখোন নিয়ে পড়াশোনা করার আগে, কিছু লেখার আগে, সবচেয়ে জরুরি এখন সেখানে কে থাকে তা জানা।'

'কে থাকে?' অভিনয় করছে সোহানা।

'একজন ভয়ঙ্কর ক্রিমিনাল। নাম সিদোরভ। মাফিয়া সর্দার। ওর নাম শুনলে কলিজা ঠাণ্ডা হয় না এ-রকম লোক নেই ইউক্রেইনে। পুরো টাইখোন কিনে নিয়ে সেখানেই নিজের আস্তানা গেড়েছে লোকটা। প্রহরীদের সংখ্যা নেহায়েত কম না।'

'তথ্যটার জন্য ধন্যবাদ। তবে টাইখোনে ঢোকার কোনো ইচ্ছা নেই আমাদের,' মিথ্যা বলল সোহানা। 'আপনার ব্যাপারে কিছু বলুন। আমাদের এজেন্ট বলেছে অনেক কিছু জানেন আপনি টাইখোন সম্বন্ধে। এত কথা জানতে পারলেন কীভাবে? ব্লুপ্রিন্ট থেকেই কি...'

আবারও হাসল মিরোস্লাভ। 'সামান্য এক ব্লুপ্রিন্ট থেকে কি এত কিছু জানা যায়? ক্রাইমিয়ান যুদ্ধের পর, আমরা যখন জার্মানদের তাড়িয়ে দিই, কপাল খুলে যায় আমার। কপাল খুলে যায় মানে একটা চাকরি পেয়ে যাই। তার আগে অনেক চেষ্টা করেও কোনো উপায় করতে পারছিলাম না। যা-হোক, সেনাবাহিনী ঘাঁটি গাড়ে এখানে, জেনারেলের খাস-পাচকের দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। একসময় এখান থেকে চলে যায় ওরা। যাওয়ার আগে আমার আরেকটা উপায় করে দিয়ে যান জেনারেল। সেভ্যাস্টাপোল ইউনিভার্সিটিতে কিউরেটরের চাকরি

দিয়ে যান। ইতিহাস নিয়ে পড়তে ভালো লাগে আমার, আর তখন ভার্সিটিতে লোকবল কম, তাই ভ্যাকেন্সি আছে—ইতিহাস বিভাগে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টশিপের জন্য আবেদন করামাত্র পেয়ে যাই কাজটা। অবশ্য পার্টটাইম নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। যা-হোক, সরকার একসময় সিদ্ধান্ত নেয় টাইখোনে যাদুঘর বানাবে। এজন্য একটা প্রজেক্ট দাঁড় করায়, সেটার দায়িত্ব দেয় সেভ্যাস্টাপোল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগকে। সার্ভে করার কাজটা এসে পড়ে আমার উপর। অবশ্য সঙ্গে আরও কয়েকজন ছিল। প্রায় টানা দু'মাস কাটিয়ে দিই টাইখোনে। ম্যাপ এঁকেছি, ছবি তুলেছি, স্কেচ করেছি, নোট লিখেছি। অনেক সময় নিজের আগ্রহেই ঘুরে বেড়িয়েছি বিভিন্ন জায়গায়। আপনারা চাইলে সেসব দেখাতে... মানে বিক্রি করতে রাজি আছি আমি।'

'ব্লুপ্রিন্টটা সহ?'

মাথা ঝাঁকাল মিরোস্লাভ।

'কিন্তু সমস্যা হলো,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল রানা, 'ওগুলো অনেক বছর আগের। এতদিনে হয়তো অনেক পরিবর্তন এসেছে টাইখোনে। নতুন মালিক তাঁর খেয়ালখুশিমতো অনেক কিছু বানিয়ে থাকতে পারেন। আবার অনেক কিছু ভেঙে ফেলে থাকতে পারেন।'

আবারও হাসল মিরোস্লাভ, কিন্তু এবারকার হাসিটা দেখে মনে হলো যেন রাজ্য জয় করেছে সে। 'আপনার কথাটা ঠিক নয়, মিস্টার রানা। কারণ, এক বছর আগে আমাকে ভাড়া করেছিলেন মিস্টার সিদোরভ।'

'কেন?'

'লোকটা খারাপ, কিন্তু আর্টের কদর বোঝে। আর্টিস্টদের দাম দেয়, যারা আর্ট নিয়ে পড়াশোনা করে তাদেরকে দাম দেয়। আর বিশেষ করে অ্যান্টিকের ব্যাপারে বদ্ধ পাগল। যা-হোক, লোক

মারফত আমার সঙ্গে যোগাযোগ করল সে, টাইখোনে যেতে বলল। গেলাম একদিন। দেখা হলো মাফিয়াসর্দারের সঙ্গে। বলল, ভিতরের অনেক কিছুই আগের মতো নেই আর; যুদ্ধ, সময় ইত্যাদি কারণে আসল ডিজাইন নষ্ট হয়ে গেছে। সে চায় সব ঠিক আগের মতো, পারলে কোসাক আমলের মতো বানাতে। সেই কাজে সাহায্য করতে বলল আমাকে।'

'সাহায্য করেছিলেন?'

'হুঁ। তিন সপ্তাহের মতো ছিলাম। তবে ডেকোরেশন ছাড়া অন্যকিছুর তেমন কোনো পরিবর্তন করতে হয়নি। আসলে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি। তবে ওই তিন সপ্তাহে আমাকে ঘুরেফিরে বেড়ানোর জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিল সিদোরভ। যেখানে খুশি সেখানে গিয়েছি, কেউ বাধা দেয়নি।'

'কত?'

রানার হঠাৎ জিজ্ঞেস-করা প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে ভ্রূ কুঁচকে গেল মিরোস্লাভের। 'মানে?'

'ইনফরমেশনগুলো কত দামে বেচতে চান আমাদের কাছে?'

কিছুক্ষণ কী যেন ভেবে জবাব দিল মিরোস্লাভ, 'বিশ হাজার ডলার। ক্যাশ।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'হতে পারে,' হেলান দিল মিরোস্লাভও। 'কিন্তু আমি যা বেচতে যাচ্ছি, আপনাদের উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, সেটার মূল্য বিশ হাজারের চেয়ে অনেক বেশি বলে মনে হয় আমার।'

লোকটার চোখে চোখ রাখল রানা। 'কেন করছেন কাজটা, মিস্টার মিরোস্লাভ?'

রানার দিকে "সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ?" এমনি প্রশ্ন নিয়ে তাকাল মিরোস্লাভ। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'টাকার জন্য। এখানে থাকতে থাকতে ঘেন্না ধরে গেছে

আমার। ইটালিতে চলে যেতে চাই। আমি...'

হাত তুলে মাঝপথে ওকে থামিয়ে দিল রানা। 'জানি, মিস্টার মিরোস্লাভ, আমাদের এজেন্ট বলেছে। আমার প্রশ্নটা ছিল, সিদোরভের সঙ্গে বেঈমানি করছেন কেন? ওর যে-বর্ণনা দিলেন আপনি, আপনার এই বাটপারির কথা জানতে পারলে...'

একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে মিরোস্লাভ, কিছু বুঝবার চেষ্টা করছে যেন। কিছুক্ষণ পর নিচু গলায়, অপরাধ স্বীকার করার ঢঙে বলল, 'প্রিপয়াটের নাম শুনেছেন?'

'চেরনোবিলের কাছাকাছি একটা শহর,' জবাব দিল সোহানা।

'দুর্ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আমার স্ত্রী ছিল ওখানে। আমাদের বিয়ে হয়নি তখনও। সবকিছু ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে আসার আগে দশবার ভাবতে হয় ওদেরকে, কারণ সহায়সম্বল বলতে প্রিপয়াটের বাড়িটা ছাড়া আর কিছু ছিল না ওদের। তাই শহর ছেড়ে বের হতে অনেক দেরি হয়ে যায়। চড়া মূল্য দিতে হয়েছে আমার স্ত্রীকে—ওর জরায়ুতে ক্যান্সার ধরা পড়েছে কিছুদিন পরেই। আমি ঠিক জানি না, তবে হতে পারে এ-কারণেই মা হতে পারেনি সে কখনোই। টাকার অভাবে ঠিকমতো চিকিৎসা করাতে পারছি না ওর। শুধু তা-ই না, মা'র মুখ থেকে শোনা ইটালির গল্প কতবার যে শুনিয়েছি ওকে নিজেও জানি না। ওকে কথা দিয়েছি ও মরার আগে অন্তত একবারের জন্য হলেও ওকে নিয়ে যাবো ইটালিতে। ইদানীং শরীর খুব খারাপ যাচ্ছে ওর। এই অবস্থায়, মিস্টার রানা, আমার কাছে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করাটাই বড়, সিদোরভ কী করবে না করবে তা নিয়ে ভাবছি না। তা ছাড়া আমি মরলেই কী আর বেঁচে থাকলেই বা কী? আমাদের মতো মানুষ, যাদেরকে সারাজীবন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়, তারা কি কখনও বেঁচে থাকে?'

রানা-সোহানা কিছু বলল না। মিরোস্লাভের কষ্টটা বুঝতে

পারছে।

'বিশ হাজার ডলার, ক্যাশ,' বলে চলল মিরোস্লাভ, 'যদি দেন, কথা দিচ্ছি, টাইখোনের ব্যাপারে সিদোরভ যা জানে, তার চেয়ে বেশি জানতে পারবেন আপনারা।'

'রাজি,' বলল রানা। 'আপনার অ্যাকাউন্ট নম্বর বলুন। টাকা জমা করার ব্যবস্থা করছি।'

অ্যাকাউন্ট নম্বর বলল মিরোস্লাভ। স্যাটেলাইট ফোন দিয়ে বিশেষ একটা নম্বরে যোগাযোগ করল রানা। কিছু নির্দেশনা দিল অপরপ্রান্তের লোকটাকে। তারপর মিরোস্লাভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যদি বিশ্বাস রাখতে পারেন আমাদের ওপর, কাল সকালে আপনার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হয়ে যাবে। ইন্টারন্যাশনাল ফাণ্ড ট্রান্সফারের সাহায্যে করা হচ্ছে কাজটা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল মিরোস্লাভ। 'ঠিক আছে। চলুন তা হলে।'

'কোথায়?' উঠে দাঁড়িয়েছে রানাও।

'রেলস্টেশনে,' মুচকি মুচকি হাসছে মিরোস্লাভ।

'রেলস্টেশনে?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে সোহানার। 'কেন?'

'গেলেই বুঝতে পারবেন,' রেস্টুরেন্টের দরজার উদ্দেশে হাঁটা ধরল মিরোস্লাভ।

রেলস্টেশনের বাইরে, গাড়িতে বসে আছে রানা-সোহানা। ইঞ্জিন বন্ধ করেনি রানা, জানে হঠাৎ করেই বিপদ আসতে পারে। স্টেশনের ভিতরে কী যেন আনতে গেছে মিরোস্লাভ।

'কী মনে হয় তোমার?' জানালা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'কী আনতে গেছে লোকটা? আসলেই কি কিছু আনতে গেছে? নাকি ও আসলে কারও চর? আমাদেরকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এখানে নিয়ে এসে খবর

দিতে গেছে দোসরদেরকে?'

'আমার মনে হয় স্টেশনের কোনো লকার ভাড়া নিয়েছে নিজের নামে,' বলল রানা। 'মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ কিছু রাখে সে ওটার ভিতরে। হয়তো...'

কথা শেষ করতে পারল না রানা, কারণ স্টেশনের ভিতর থেকে বের হয়ে আসছে মিরোস্লাভ। বগলের নীচে মাঝারি সাইজের একটা ব্যাগ। কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা গাড়ির ভিতরে এসে ঢুকল লোকটা। ব্যাগটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। চোখের ইশারায় সোহানাকে ওটা নিতে বলল রানা। নিল সোহানা। খুলে দেখল কী আছে ভিতরে। একগাদা কাগজ। হতে পারে মিরোস্লাভের তথাকথিত স্কেচ, নোট, ফটো আর ব্লুপ্রিন্ট। আবার সব ভুয়াও হতে পারে। সেক্ষেত্রে, মানতেই হবে, লোকটা মস্ত বড় জালিয়াত।

একনজর দেখে তেমন কিছু বুঝতে পারল না সোহানা। ইশারায় কথাটা রানাকে জানিয়ে দিল ও। রানাও ইশারায় বলল এখন কিছু করার নেই।

মিরোস্লাভকে নির্দিষ্ট জায়গায় নামিয়ে দিয়ে ওরা সোজা ফিরে এল হোটেলরুমে। দেরি না করে ব্যাগের চেইন খুলল সোহানা, ওটা উপুড় করে ভিতরের সব কাগজ ফেলল বিছানার উপর। টানা এক ঘণ্টা ধরে ওরা দু'জনে মিলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কাগজগুলো। বিশেষ করে স্কেচগুলো। প্রতিটা প্রবেশপথ, সিঁড়ি, টাইখোনের প্রতিটা ঘর যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে চোখের সামনে। চমৎকার বর্ণনা দেয়া হয়েছে স্মাগলিং টানেলগুলোর, সঙ্গে স্কেচ। আরেকটা বিষয় ভালো লাগল রানার। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে টাইখোনোর বেশ কয়েকটা স্কেচ করা হয়েছে; কখনও কাছ থেকে, কখনও দূর থেকে, কখনও বাঁ দিক থেকে আবার কখনও ডান দিক থেকে। মনোযোগ দিয়ে দেখলে সিদোরভের প্রাসাদ

সম্বন্ধে স্পষ্ট একটা ধারণা চলে আসে।

আরও একটা ব্যাপার বোঝা গেল। শুধু চোরাকারবারের জন্য ব্যবহার করা হয়নি টানেলগুলো, নাৎসি এবং এমনকী সোভিয়েত রেড আর্মিও তাদের কাজে ব্যবহার করেছে ওগুলোকে। কেউ করেছে অ্যামুনিশন ডিপো হিসেবে, কেউ আবার শেল্টার অথবা অস্থায়ী পতিতাপল্লী হিসেবে। কয়েকটা নোট পড়ে জানা গেল, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিশেষ কিছু গোপন আর সুরক্ষিত টানেল ব্যবহৃত হতো ভল্ট বা সিন্দুক হিসেবে, সাধারণ সৈন্যরা তাদের দামি জিনিস গচ্ছিত রাখত সে-সব জায়গায়।

মিরোস্লাভের সঙ্গে কথা বলে যা জানা যায়নি, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই পয়েন্টটা জানা গেল বিশেষ কিছু নোট পড়ে—রাম কে'র সে-ই বোতলটা কোথায় রেখেছে সিদোরভ। ওই ব্যাপারে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে চলে এল রানা-সোহানা।

'আমাদেরকে কিন্তু সিদ্ধান্তটা আঁকড়ে থাকলে চলবে না,' বিষয়টা নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলার পর বলল রানা, 'কারণ বোতলটা অন্য কোনো জায়গায়ও লুকিয়ে রাখতে পারে সিদোরভ।'

'আমার সন্দেহ আছে,' অনেকক্ষণ মেঝেতে বসে থাকার পর উঠে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ল সোহানা। 'লোকটা যাকে বলে জাতে মাতাল তালে ঠিক। ওর মতো পার্সোনালিটির মানুষরা যে-জিনিসটাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে সেটাকে হাতের কাছেই রাখতে চাইবে, অন্য কারও জিম্মায় দিয়ে শান্তি পাবে না। নিজের সবচেয়ে দামি অ্যান্টিকগুলো, আমার মনে হয়, এনভায়রোনমেন্টালি কন্ট্রোল্ড কোনো জায়গায় রাখবে সে। মানে, জায়গাটা হবে এয়ারকণ্ডিশণ্ড, আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকবে, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ থাকবে। হয়তো অগ্নিনির্বাপণের অত্যাধুনিক ব্যবস্থাও করে রেখেছে।' কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল। 'আবার

তোমার কথাও ঠিক হতে পারে। মূল ভবন থেকে কিছুটা দূরে যাদুঘরের মতো বানিয়ে থাকতে পারে, হয়তো সেখানেই...। চলো মিরোস্লাভের নোটগুলো আরও একবার পড়ি ভালোমতো।'

আরও টানা এক ঘণ্টা খাটল দু'জনে। ঘরে কোনো শব্দ নেই, শুধু মাঝেমধ্যে পাতা উল্টানোর খসখস আওয়াজ। শেষপর্যন্ত টাইখোনের পশ্চিমদিকের বিশেষ একটা ঘরের দিকে সোহানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা। 'সিকিউর্ড ইউটিলিটি রুম,' বলল ও, 'কী মনে হয়?'

'মনে হয় যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি। আরেকটা নোটে আমি কী পেয়েছি শোনো। মিরোস্লাভ লিখেছে, টাইখোনের প্রায় সব জায়গায় আমার অবাধ যাতায়াতের সুযোগ আছে। কিন্তু পশ্চিমপ্রান্তে যেতে চাইলেই বাধা দেয়া হয়। কেন? কী রেখেছে ওখানে লোকটা? বুঝতেই পারছ, এখানে লোকটা বলতে সিদোরভকে বোঝানো হচ্ছে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, কিছু কাগজ হাতড়ে টেনে নিল টাইখোনের মূল নকশাটা। 'প্রাসাদের মূল অংশটা মাঝখানে আছে,' আঙুল রাখল সে ওটার উপর। 'তারপর দুটো উইং চলে গেছে দু'দিকে—একটা দক্ষিণে আরেকটা উত্তরে। পশ্চিমদিকে গেছে আরেকটা। সবগুলোই পাথরের নিচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা।'

'সমস্যাটা কোথায় জানো?' নকশাটার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সোহানাও কয়েক তা কাগজ হাতড়ে টানেলগুলোর একটা স্কেচ টেনে নিল। সেটার উপর চোখ রেখে বলল, 'চোরাকারবারিদের টানেলগুলো ম্যানসনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দু'জায়গায়। মূল বাড়ি থেকে প্রায় দু'শ' গজ দূরে আগে যেখানে আস্তাবল ছিল সেখানে, আর দক্ষিণপুব উইং-এর সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়িয়েছে রানা, আড়মোড়া ভাঙছে। 'ধরে নিলাম টানেলগুলোতে পৌঁছাতে কোনো সমস্যা হবে না আমাদের।

আরও ধরে নিলাম ওগুলো ধরে ঠিকমতোই পৌঁছে যাবো ঠিক জায়গায়। তারপরও দু'পায়ের উপর নির্ভর করে অনেকখানি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে আমাদেরকে। যদি তা না পারি, দক্ষিণপুব উইং ধরে ঢুকে পড়তে হবে বাড়ির ভিতরে, গার্ডদেরকে যে-কোনোভাবেই হোক ফাঁকি দিয়ে পৌঁছে যেতে হবে সিদোরভের সেই "প্রবেশ নিষেধ" লেখা এলাকায়।'

ছয়

মাথার উপরে যে-বাতিটা জ্বলছে তা তেমন উজ্জ্বল নয়। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল সোহানা, একটা চার্ট দেখছে। হাতের কম্পাস আর ডিভাইডার নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক কোন্ জায়গায় আছে ওরা, জানতে চায়। দাঁতে কামড়ে-ধরা পেন্সিলটা হাতে নিয়ে কিছু হিসেবনিকেশ করল, সেগুলো লিখে রাখল চার্টের মার্জিনে। কোর্স লাইনের উপর একটা গোল দাগ দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'পৌঁছে গেছি।'

হাল ধরে দাঁড়িয়ে ছিল রানা, কথাটা শোনামাত্র বন্ধ করে দিল ইঞ্জিন। কমেছে, কিন্তু থামেনি ফিশিং ট্রলারটার গতি, কুয়াশার পাতলা চাদর ভেদ করে এগোচ্ছে এখনও। খোলের দু'পাশ দিয়ে হিসহিস শব্দ তুলে বয়ে যাচ্ছে পানি। আস্তে আস্তে কমতে কমতে একসময় থেমে গেল ট্রলারের গতি। মাথা নুইয়ে পাইলটহাউসের দরজা দিয়ে বের হয়ে এল রানা। শিকলে-বাঁধা ভারী নোঙরটা পানিতে ফেলতে গিয়েও কী মনে করে ফেলল না। একমাত্র

কেবিনটাতে ঢুকে সোহানার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

রানাকে দেখে একটু হেসে সরে দাঁড়াল সোহানা। ওকে পাশ কাটিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বিনকিউলারটা তুলে ধরল চোখের সামনে। দূরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। কুয়াশার কারণে কিছুই দেখতে পেল না প্রথমে। তারপর, যেন একটু একটু করে, বেশ দূরে, দেখতে পেল সাদা আলোর একটা ফুটকি—কাঁপছে ওটা থেকে থেকে. আসলে জ্বলছে আর নিভছে নির্দিষ্ট সময় পর পর।

'পারফেক্ট হিসাব তোমার, সোহানা.' প্রশংসা করল রানা।

ঘুরে জিভ বের করে রানাকে ভেংচি কাটল সোহানা। মুচকি হেসে আবার বিনকিউলারটা চোখে লাগিয়ে তাকাল রানা দূরের লাইটহাউসটার দিকে।

আসলেই কাজের কাজ করেছে সোহানা। ভাড়া-করা ট্রলার নিয়ে বন্দর থেকে এ-পর্যন্ত আসাটা ছিল প্রথম চ্যালেঞ্জ। কারণ মাছ-ধরার এই নৌকায় জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেম নেই, থাকাটাই অস্বাভাবিক। নিজের নেভিগেশন বিদ্যার পুরোটাই কাজে লাগিয়েছে সোহানা। চুলচেরা হিসেব কষেছে বোটের কোর্স আর স্পিডের। সময়ে সময়ে রানার কাছ থেকে জেনে নিয়েছে নির্দিষ্ট কিছু ল্যাণ্ডমার্ক দেখা যাচ্ছে কি না। কখনও কখনও কাজে লাগিয়েছে শর্ট রেঞ্জের একটা রেইডার—নৌকার একমাত্র আধুনিক যন্ত্র।

বিনকিউলারটা জায়গামতো রেখে দিল রানা। হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল, 'চলো ইউনিফর্ম পরে নিই।'

মিরোস্লাভের দেয়া কাগজপত্র, স্কেচ ইত্যাদি ভালোমতো দেখার পর কাছের একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে নিয়েছিল দু'জনে। খেতে খেতে প্ল্যান করেছে কীভাবে কী করবে। তখন রানার

চোখে পড়ে, রেস্টুরেন্টের উল্টোদিকে পুরনো-কাপড়ের একটা দোকানে শীতলযুদ্ধের সময়কার কমাণ্ডো ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম ঝুলছে। কথাটা জানানোমাত্র রাজি হয়ে যায় সোহানা। দু'জনের জন্য দুই প্রস্থ ইউনিফর্ম কিনে নেয় রানা। পরে বন্দরের কাছে ফিরে এসে একটা ফিশিং-ট্রলার ভাড়া করে। সঙ্গে রাবারের সাত ফুটী একটা ডিঙি। এটার মোটর ব্যাটারিতে চলে নিঃশব্দে।

জায়গামত পৌঁছে এবার ঝট্‌পট্ ক্যামোফ্লাজ ইউনিফর্ম পরে নিল দু'জনে। কালো পেইন্ট মাখল মুখে। বাতাস ভরে ফুলাল নৌকাটাকে। তারপর ছোট্ট মোটরটাকে জায়গামতো বসিয়ে ফিশিং-ট্রলারের একপ্রান্ত দিয়ে নামিয়ে দিল পানিতে। যার যার ব্যাকপ্যাক কাঁধে ঝুলিয়ে নেমে পড়ল ওরা ডিঙিতে। ট্রলারের গলুইয়ে জোরে একটা ধাক্কা দিল সোহানা। জমাট-বাঁধা কুয়াশায় ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল সেটা।

মোটরের ইগনিশন চালু করল রানা। ঝাঁকি দিয়ে গুঞ্জন তুলল ওটা, কাঁপতে লাগল একটানা। গলুইয়ে গিয়ে বসেছে সোহানা। কম্পাস বের করে হাতে নিয়েছে। লাইটহাউসের দিকে ধরল যন্ত্রটাকে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। তারপর আঙুল তুলে ইশারায় দেখিয়ে দিল কোন্‌দিকে নিতে হবে ডিঙি।

থ্রটলে চাপ বাড়াল রানা।

মোটরটা যত জোরে কাঁপছে তত জোরে আওয়াজ করছে না। গতি যথাসম্ভব সীমিত রেখেছে রানা, তাড়াহুড়ো করতে চায় না। তিন নট বেগে এগোচ্ছে এখন। ঘণ্টাখানেক চলার পর আবারও হাত তুলল সোহানা, থামতে ইশারা করছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে লাইটহাউসের বীকনের দিকে। থ্রটলে চাপ আস্তে আস্তে কমিয়ে এনে ইঞ্জিনটা বন্ধ করে দিল রানা।

ডিঙি ঘেঁষে বয়ে-চলা পানির শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ

নেই এখন। চারপাশে পাক খেয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে কুয়াশা। কাছের কয়েক ফুটের মধ্যে কালো পানি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে কি পড়ে না। কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল রানা—ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে দূরে, চাপা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সোহানা, তারপর হাত তুলে ইঙ্গিত করল আবার।

সামনে প্রথম বাধা—প্রাকৃতিক এবং নির্মম—কৃষ্ণসাগরের পর্বতপ্রমাণ ঢেউ। জোয়ার-ভাটার হিসেব কষে রানা-সোহানা ঠিক করেছে দক্ষিণদিক থেকে এগোবে। এতে খুব বেশি যুঝতে হবে না ঢেউয়ের বিরুদ্ধে। সিদোরভের এলাকা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে কিছু ডুবোপাথরের জটলা, ওই জায়গা ধরে এগিয়ে যাবে ওরা। এই কুয়াশাঢাকা ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাজটা নিঃসন্দেহে ঝুঁকিপূর্ণ, কিন্তু কম সময়ে জায়গামতো পৌঁছুতে হলে অন্য উপায় নেই। আরও একটা কারণ আছে। সিদোরভের গার্ডরা

হয়তো কখনোই কল্পনা করবে না এত রাতে, এরকম ভূতুড়ে পরিবেশে ডুবোপাথরের জট ডিঙিয়ে কেউ হানা দিতে যাবে ওদের আস্তানায়। তবে ভাগ্যের উপরও অনেকখানি নির্ভর করতে হবে রানা-সোহানাকে। সাগরের কিনারা ঘেঁষে সিদোরভ যদি সার্চলাইট বসিয়ে থাকে, ওগুলোর আলো বিপজ্জনক হতে পারে ওদের জন্য।

মাঝারি গতিতে ছুটছে ডিঙি। নাক বরাবর সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। টানা ত্রিশ সেকেণ্ড এগোনোর পর ইশারা করল সোহানা, গতি কমাতে কমাতে ডিঙি প্রায় থামিয়েই ফেলল রানা। কান খাড়া করে রেখেছে সোহানা। ডানে-বাঁয়ে একইসঙ্গে, কিছুটা দূরে, ঢেউয়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে ঢেউ। চোখ বন্ধ করল সোহানা, এদিক-ওদিক মাথা ঘুরিয়ে একমনে ঢেউয়ের আওয়াজ শুনল কিছুক্ষণ। তারপর হাত তুলে ইঙ্গিত করল

আবার।

থ্রটলে চাপ বাড়াল রানা, ডিঙিটা চলতে শুরু করল।

এবার বিশ সেকেণ্ড পর হাত তুলে থামার ইশারা করল সোহানা। থ্রটলে চাপ কমাল রানা, তবে ডিঙিটা যাতে একজায়গায় স্থির থাকতে পারে সেজন্য যতটুকু ধরে না রাখলেই নয় ততটুকু ধরে রেখেছে।

ইঞ্জিনের আওয়াজ হঠাৎ করে কমে যাওয়ায় নীরবতা বেশি মনে হচ্ছে। গর্জন করতে করতে ধেয়ে আসছে ঢেউ, বাড়ি খাচ্ছে একটা আরেকটার সঙ্গে, তারপর হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ছে সাগরের বুকে। বিশাল একটা ঢেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডিঙির ডানে। এরপর দু'সেকেণ্ডের বিরতি দিয়ে বাঁয়ে আবার একটা। পরমুহূর্তেই পিছনে আরেকটা। রানা-সোহানা বুঝল, উন্মত্ত অগণিত ঢেউ ঘিরে ধরেছে ওদেরকে।

হঠাৎ করেই ডিঙির সামনের দিকে ঢেউয়ের বিশাল একটা দেয়াল ভেঙে পড়ল যেন। কুয়াশার চাদর ভেদ করে বয়ে গেল সাদা পানির বন্যা। ডিঙির নীচের পানি যেন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে আচমকা, লোফালুফি খেলছে ওটাকে নিয়ে।

'রানা!' চাপা গলায় বলে উঠল সোহানা।

'হাতের কাছে যা পাও শক্ত করে ধরে থাকো!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। 'দরকার হলে শুয়ে পড়ো!'

কুয়াশার চাদর সরে গেছে হঠাৎ করেই, সরে গেছে বিশাল ঢেউটাও। নীচের দিকে তাকিয়ে ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরে। কয়েক ফুট সামনে ডুবোপাথরের একটা জট। আরেকটু হলেই ডিঙিটা গিয়ে আছড়ে পড়বে ওটার উপর। সন্দেহ নেই, রাবার কেটে গিয়ে বাতাস বের হয়ে মুহূর্তে চুপসে যাবে ওটা।

থ্রটল বন্ধ করে দিল রানা। একইসঙ্গে হাতলটা ঘুরাল প্রায় ষাট ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। সংঘর্ষ ঘটতে ঘটতেও ঘটল না,

ডুবোপাথরের জটটাকে শেষমুহূর্তে এড়িয়ে গেল ডিঙি। কিন্তু রানা জানে নিথর দাঁড়িয়ে থাকলে পরের স্রোতটা এসে আবার বাড়ি মারবে ডিঙির গায়ে, আছড়ে নিয়ে ফেলবে পাথরগুলোর উপর। তাই সংঘর্ষ এড়ানোমাত্র চালু করল ইঞ্জিন। প্রপেলারে পানির স্পর্শ পাওয়ামাত্র চলতে শুরু করল ডিঙি।

মোচার মতো আকার ধারণ করে একের পর এক ঢেউ মাথা তুলছে ডিঙির সামনে। দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের শান্ত পানিতে ল্যাণ্ড করামাত্র গতি বাড়িয়ে বা কমিয়ে, হাতল ডানে-বাঁয়ে ঘুরিয়ে নৌকাটাকে কিছুটা হলেও নিরাপদ জায়গায় নেয়ার চেষ্টা করছে রানা। বেমক্কা ঢেউয়ের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য কখনও বন্ধ করে দিচ্ছে ইঞ্জিন। একবার হঠাৎ বিগড়ে গেল প্রপেলার, জরুরি মুহূর্তে গতি বাড়াতে গিয়ে রানা টের পেল কাজ হচ্ছে না। কী করবে ভাবতে গিয়ে মূল্যবান দুটো মুহূর্ত নষ্ট করল ও, তখনই বিশাল এক ঢেউ শূন্যে তুলে ফেলল ওদেরকে। একটু আগে যে-ডুবোপাথরের জট এড়িয়ে গেছে ওরা, ওটার দিকেই ধেয়ে চলেছে আবার—টের পেয়ে খানিকটা আতঙ্কিত হলো রানা। কিন্তু কপাল ভালো, ঢেউটা ওদেরকে নিয়ে ফেলল ওই জট ছাড়িয়ে আরও দূরে।

মাত্র একটা মুহূর্ত, তারপরই আরেকটা ঢেউ তুলে নিল ওদেরকে। ডুবোপাথরের জটটা কোথায় হারিয়ে গেল বলতে পারবে না রানা-সোহানা, কুয়াশার চাদর গিলে নিয়েছে ওদেরকে। রানা টের পেল দুটো ঢেউয়ের মাঝখানের শান্ত পানিতে ল্যাণ্ড করেছে আবার। এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনল ও, জানে আবার চালু করতে গেলে ভেঙে গিয়ে ইঞ্জিন থেকে আলগা হয়ে যেতে পারে প্রপেলার, তারপরও ঝুঁকিটা নিল। কান পেতে শুনছে। শুয়ে পড়েছিল সোহানা, উঠে বসেছে এখন। 'আমার মনে হয় ডানে যেতে হবে তোমাকে, রানা,' বলল ও।

'উঁহুঁ, আমার মনে হয় বাঁয়ে।'

'কিন্তু...'

'ঠিক আছে, রাখলাম তোমার কথা,' ডানে মোচড় কাটল রানা।

দশ সেকেণ্ড পর চিৎকার করে উঠল সোহানা, 'থামো! টের পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ,' এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা।

ডিঙিটা সামনে এগোচ্ছে বললে ভুল হবে, আসলে সামনে এগোতে গিয়ে পারছে না, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে একদিকে। এবং আতঙ্কের বিষয়, গতি যত কমাতে চাচ্ছে রানা ততই দ্রুত এগোতে শুরু করেছে ওটা। ছুটে এল দানবীয় একটা ঢেউ, রানা-সোহানাকে তুলে নিল মাথার উপর; মাত্র দশ ফুট দূরে ডুবোপাথরের আরেকটা জট, বোঝাই যাচ্ছে ওটার উপর ডিঙিটাকে আছড়ে ফেলে আক্রোশ মেটাতে চায়। কিন্তু মাত্র দেড়-দু'ফুটের জন্য ইচ্ছা পূরণ হলো না ঢেউয়ের, আরও একবার দু'ঢেউয়ের মাঝখানের শান্ত পানিতে ল্যাণ্ড করল ডিঙি।

প্রপেলার কোনো কাজে লাগবে না এখন, রানা তাই চেঁচিয়ে বলল, 'বৈঠা!' পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল একটা।

সোহানাও হাতে নিল আরেক বৈঠা। 'সাবধান, রানা!' বলল গলা ফাটিয়ে। 'তোমার পিছনে!'

ঘুরল রানা। নিজের অজান্তেই বৈঠা উঠে গেছে পানি থেকে। ওটা এমনভাবে ধরে আছে যে, মনে হচ্ছে বর্শা উঁচিয়ে আছে।

এক হাত দূরে মাথা তুলছে আরেকটা ঢেউ। এদিকে একটা ডুবোপাথরের সঙ্গে লেগে থেমে গেছে ডিঙি। দানবীয় ঢেউটা ওদের উপর আছড়ে পড়লে নির্ঘাৎ উল্টে যাবে ডিঙি।

বৈঠাটা পাথরের গায়ে ঠেকাল রানা, শরীরের সব ওজন দিয়ে ভর দিল ওটার উপর। তারপর জোরে ঠেলা মারল। কিন্তু

পেছনের ঢেউটা ভীষণ শক্তিশালী, একচুল সরতে দিল না। বরং ডিঙিটা জায়গায় দাঁড়িয়ে চক্কর খেল দু'বার।

কোনোরকমে উঠে এসে রানার পাশে বসে পড়ল সোহানা। নিজের বৈঠা ঠেকাল পাথরের গায়ে। ডিঙিটাকে যদি ডুবোপাথরের অপরপাশে নিয়ে যাওয়া যায় তা হলে হয়তো উল্টাবে না। কিন্তু ততক্ষণে আরও শক্তিশালী হয়েছে ঢেউ, প্রচণ্ড চাপে সোহানার বৈঠা ভেঙে দু'টুকরো হয়ে গেল। ততক্ষণে পানির মাথায় চড়ে ডুবোপাথরের লেবেলে চলে এসেছে ডিঙি, দাঁতে দাঁত চেপে নিজের বৈঠা দিয়ে আরেকবার ঠেলা মারল রানা পাথরের গায়ে। লাফিয়ে উঠল ডিঙি, ডুবোপাথরের ওপাশে গিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে টন টন পানি আছড়ে পড়ল যে-জায়গায় একটু আগে নৌকাটা ছিল সেখানে।

ইঞ্জিন চালু করল রানা, গতি বাড়িয়ে সরে যেতে চায় দূরে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করল ডিঙি এগোচ্ছে না, বরং বাতাসে প্রপেলার ঘুরবার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঝট্ করে ঘাড় ঘোরাল ও পেছনদিকে। ডুবোপাথরের এদিকের ঢেউ ফুঁসে উঠছিল, আর তখনই এখানে ল্যাণ্ড করেছে ডিঙিটা, পানির সঙ্গে ধাক্কা লেগে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় শূন্যে উঠে গেছে ডিঙির পেছনের দিক।

ওটা নামার অবকাশ পাওয়া গেল না, ঢেউ ততক্ষণে মাথা তুলেছে সাপের ফণার মতো। চিৎকার করে সোহানাকে ডাকতে চাইল রানা কিন্তু সে-সুযোগ পেল না। খেয়াল করল হাত থেকে ছুটে গেছে বৈঠা, শূন্যে উড়াল দিয়েছে ওর শরীর। ডুবোপাথরের আরেকটা জটের দিকে উড়ে যাচ্ছে ও।

ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে কালো একটা চাদর নেমে এল রানার চোখের সামনে। ঢেউয়ের ফোঁসফোঁসানি মুছে গেল কান থেকে।

শান্তি!

সাত

ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল রানা—কতক্ষণ পর বলতে পারবে না। টের পেল, সবগুলো ইন্দ্রিয় একসঙ্গে না, এক এক করে কাজ করতে শুরু করছে।

পালকের মতো কী যেন বার বার লাগছে গালে। পালক আসবে কোত্থেকে? চোখ বন্ধ করেই ভাবল রানা। নারকেল তেল আর বাদাম তেলের মিশ্র একটা গন্ধও লাগছে নাকে।

তারমানে, ভাবল রানা, সোহানার শ্যাম্পু।

চোখের পাতাগুলো সেঁটে লেগে থাকতে চাইছিল, জোর করে খুলল রানা। চিত হয়ে পড়ে আছে ও। চোখ ঘুরিয়ে তাকাল চারদিকে। ডিঙির নীচে চাপা পড়েছে। ওর মাথাটা নিশ্চিন্তে পড়ে আছে সোহানার কোলের উপর।

সামনে ঝুঁকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সোহানা, রানাকে চোখ মেলতে দেখে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছো?'

'আছি। সরো আমার ওপর থেকে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

সরল সোহানা।

'হয়েছিল কী?' উঠে বসল রানা। ধাক্কা দিয়ে একপাশে সরিয়ে দিল ডিঙিটাকে।

'ঢেউয়ের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে পড়লে পাথরের উপর। মাথা ঠুকে গেল। দড়ি ছুঁড়ে মারলাম তোমার দিকে কিন্তু দেখলাম ওটা আঁকড়ে ধরার কোনো লক্ষণ নেই তোমার মধ্যে। যা বোঝার বুঝে

নিয়ে লাফিয়ে পড়লাম পানিতে। কোনোরকমে সাঁতার কেটে এসে তোমাকে মাত্র ধরেছি, এমন সময় বিশাল আরেক ঢেউ এসে ধাক্কা মারল আবার। আমরা দু'জন আর ডিঙিটা বলতে গেলে উড়ে এসে পড়লাম এখানে। এই হলো ঘটনা।'

'কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'বিশ-পঁচিশ মিনিট হবে।'

হাত তুলে কপালটা আলতো করে স্পর্শ করল রানা। কাপড়। আঘাতের জায়গায় ইতিমধ্যেই জলপট্টি বেঁধে দিয়েছে সোহানা।

'ব্যথা করছে এখনও?' জানতে চাইল সোহানা।

জবাব না দিয়ে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা।

'দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। 'অসুবিধা হচ্ছে কি না বোঝার উপায় নেই। চারদিকে ঘুটঘুটে আঁধার। তোমাকেও দেখতে পাচ্ছি না ঠিকমতো।'

'স্বাভাবিক। এখন রাত। আর আমরা আসবো বলে এই জায়গায় আলোকসজ্জা করে রাখেনি কেউ। আচ্ছা, এই দেখো, তোমার চোখের সামনে কয়েকটা আঙুল ধরলাম। বলো তো, ক'টা?'

'এক...দুই...তিন...মোট বারোটা।'

'রানা!'

'উফ্, সোহানা বাদ দাও তো এসব। আমি ঠিক আছি। কী ভাবছ? পাথরের সঙ্গে মাথা ঠুকে গিয়ে স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে আমার? এটা সিনেমা? তবুও বলছি, আমি মাসুদ রানা, আর তুমি সোহানা। একটা ডিঙিতে করে কৃষ্ণসাগরের তীরের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, উদ্দেশ্য ছিল সিদোরভের ঘাঁটিতে হানা দেবো। নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের একটা বোতল উদ্ধার করে

আনাই আমাদের লক্ষ্য। সন্তুষ্ট?'

হাতঘড়ি দেখল সোহানা। 'প্রায় বারোটা। ভাগ্য আমাদেরকে কোথায় ল্যাণ্ড করিয়েছে ঠিক জানি না। হাঁটতে পারবে? একটু ঘুরে-ফিরে দেখতে হবে জায়গাটা। সিদোরভের কতটা কাছে এসেছি, জানা দরকার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা, সোহানার সাহায্য ছাড়াই।

একবার চক্কর দিয়েই বুঝল রানা-সোহানা, ভাগ্য ঠিক জায়গাতেই ল্যাণ্ড করিয়েছে ওদেরকে।

এখন ছোট্ট একটা বেলাভূমিতে আছে ওরা। চারদিকে শত শত ডুবোপাথর, মাঝখানে বিশ ফুট বাই ত্রিশ ফুটের একফালি সৈকত। সরু হতে হতে একটা পাহাড়ি-দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে; শেষপ্রান্তটা চওড়ায় দু'ফুটের বেশি হবে কি না সন্দেহ।

কয়েক শ' গজ এগোনোর পর পাহাড়ি দেয়ালটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো ওদেরকে। কাঁধ ঝাঁকাল রানা, উত্তরদিকে তাকাল। হাঁটতে শুরু করল, পিছন পিছন সোহানা। আধ মাইলের মতো যাওয়ার পর ঝোপজঙ্গলে-ছাওয়া খাড়া একটা পথ দেখতে পেল—সোজা উঠে গেছে পাহাড়টার দিকে। এটা ওই পাহাড়েরই অংশ কি না সন্দেহ হলো রানার, অন্য কোনো টিলাও হতে পারে। পিছনে ফিরে মাথা ঝাঁকিয়ে ইশারা করল ও সোহানাকে, তারপর উঠতে শুরু করল। বেশ খানিকটা ওঠার পর তাকাল চারদিকে।

সমুদ্র সমতল থেকে অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে ওরা। এখানে বাতাস বেশ জোরালো আর ঠাণ্ডা। কুয়াশা নেই বললেই চলে। তাই অনেকদূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে। বেশ নীচে কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে এখনও সমানে তর্জন-গর্জন চালিয়ে যাচ্ছে সাগর।

পকেট থেকে কম্পাস বের করল রানা। মনোযোগ দিয়ে

কিছুক্ষণ দেখার পর বলল, 'আমরা মনে হয় সরে এসেছি।' তাকাল সোহানার দিকে।

মুচকি মুচকি হাসছে সোহানা। রানার দৃষ্টিতে বড় একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেখতে পেয়ে হাত তুলে দূরে দেখাল।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা।

সম্ভবত দু'মাইল দূরে, অন্ধকারের বুক ক্ষণে ক্ষণে চিরে দিচ্ছে উজ্জ্বল একটা আলো।

সার্চলাইট।

এবার হাসল রানাও। 'তারমানে আমাদের সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়নি এখনও। কী বলো?'

মিনিট দশেক পর ডিঙিটাকে নিয়ে আবার পানিতে নেমে পড়ল ওরা। ধীরেসুস্থে এগোচ্ছে রানা, উত্তরদিকে চলেছে। একবার সামনে তাকাচ্ছে, পরক্ষণে দেখছে বড় কোনো ঢেউ ধেয়ে আসছে কি না। কুয়াশার চাদর আগের চেয়ে আরও ঘন হয়েছে মনে হচ্ছে। তাই দৃষ্টির চেয়ে শ্রবণশক্তির উপর ভরসা করতে হচ্ছে বেশি। ডুবোপাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে অদ্ভুত হিসহিস আওয়াজ তুলছে ঢেউ, সে-শব্দের যতটা কাছাকাছি পারা যায় থাকতে চাচ্ছে রানা। আবার ডুবোপাথরের জটগুলোর বেশি কাছেও থাকতে চাচ্ছে না। ওরা যখন রওয়ানা হয়েছিল তখন জোয়ার ছিল, এখন পানি নেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। তাই ঢেউগুলো আগের মতো বড় হচ্ছে না।

মিনিট ত্রিশেক এভাবে চলার পর ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা, হাতল ছেড়ে দিল। ডিঙিটাকে ছেড়ে দিয়েছে ঢেউয়ের মর্জির উপর। সোহানা ওর সামনে, তাই ব্যাপার কী বোঝার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ও। মোনাজাত করার ভঙ্গিতে দুই হাত জড়ো করে কয়েকবার দোলাল রানা, তারপর ফিসফিস করে বলল, 'নৌকা।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় ঘুরিয়ে নিল সোহানা। রানা কী বলেছে শুনতে না পেলেও বুঝতে পেরেছে। কারণ বিরামহীন ঢেউয়ের আওয়াজ ছাপিয়ে শক্তিশালী একটা ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না বোটটাকে, স্রোতের ফোঁসফোঁসানির কারণে ঠিক বোঝাও যাচ্ছে না কোথায় বা কত দূরে আছে। তবে দুটো বিষয় পরিষ্কার। ওদের সামনে আছে নৌকাটা এবং বাঁ দিক থেকে ডান দিকে যাচ্ছে। আশ্চর্যের বিষয়, এত আওয়াজ ছাপিয়ে রেডিয়োর খড়খড়ানি শোনা গেল হঠাৎ। তারপর অনেকটা যান্ত্রিক কণ্ঠে কথা বলে উঠল কেউ। কিন্তু কী বলল লোকটা, অথবা কোন্ ভাষায় কথা বলল কিছুই বোঝা গেল না।

দশ সেকেণ্ড কাটল।

ডানদিকে হঠাৎ জ্বলে উঠল অত্যুজ্জ্বল একটা স্পটলাইট। কুয়াশার চাদর ভেদ করে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আলো। এদিক-ওদিক ঘুরছে আলোটা। সৈকতের জলসীমায় সন্দেহজনক কিছু আছে কি না দেখছে। কিছুক্ষণ পর, যেমন হঠাৎ করে জ্বলে উঠেছিল, তেমনভাবেই নিভে গেল। নৌকাটাও কোন্‌দিকে চলে গেল যেন।

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'সিদোরভের গার্ড?' জানতে চাইল ফিসফিস করে।

'ইউক্রেনিয়ান নেভির কোস্টাল পেট্রোলও হতে পারে,' বলল রানা। 'যারাই হোক, সামনাসামনি পড়তে চাই না।'

'যদি সিদোরভের গার্ড হয়?'

'তা হলে একদিক দিয়ে আমাদের জন্য ভালো।'

'মানে?'

'মানে, এখন পর্যন্ত ধরা পড়িনি আমরা।'

'বুঝতে পারছি না।'

'যদি আমাদেরকে দেখে ফেলত ওরা, অথবা সন্দেহ করত,

একটা না, একের বেশি বোট পাঠাত। কিন্তু তা যখন করেনি তখন ধরে নিচ্ছি এখনও দেখেনি আমাদেরকে। কিংবা দেখলেও সন্দেহ করেনি।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল সোহানা, কিছু বলল না।

পরের একটা ঘণ্টা ইঁদুর-বিড়াল খেলা চলল রহস্যময় ওই নৌকা আর রানাদের ডিঙিটার মধ্যে। কুয়াশার কারণে দেখাও যাচ্ছে না নৌকাটাকে, ঢেউয়ের জোরালো আওয়াজের কারণে বোঝাও যাচ্ছে না ওটার আরোহীরা ঠিক কোন্‌দিকে আছে। কিন্তু রানা-সোহানা বার বার টের পাচ্ছে যথেষ্ট কাছে চলে আসছে নৌকাটা, আবার যে-কোনো কারণেই হোক যথেষ্ট দূরেও চলে যাচ্ছে। নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে না রানাদের উপস্থিতি টের পেয়েছে কি না। আরেকটা ব্যাপার, যতবার কাছে এসেছে ততবারই কিন্তু জ্বলে ওঠেনি স্পটলাইট। বরং কখনও কখনও জ্বলেছে। আলোটা ঘুরতে ঘুরতে একবার প্রায় এসে পড়েছিল রানাদের ডিঙির উপর, চট করে ডিঙির নাক ঘুরিয়ে নিয়ে সামাল দিয়েছে রানা।

'টহলে বেরিয়েছে নৌকাটা,' নিচু গলায় বলল সোহানা। 'টাইমিং হিসেব করেছি আমি। আমার মনে হয় ওরা সিদোরভের লোক।'

'কেন?'

'নেভির লোক হলে একই জায়গায় বার বার আসবে কেন?'

'গুড পয়েন্ট! তারমানে ওরা কি কিছু সন্দেহ করেছে?'

'বলতে পারবো না। ধরা পড়তে পড়তেও তো বেঁচে গেলাম একবার।'

আরও কয়েক মিনিট পর দূরে সরে গেল পেট্রোল বোটের ইঞ্জিনের আওয়াজ। ডিঙির নাক ঘুরিয়ে নিল রানা, যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে চলতে শুরু করল আবার। বেশ কিছুদূর

এগোনোর পর অনেকখানি ডানে, একটা পাহাড়ের মাথায় আবার নজরে পড়ল লাইটহাউসের আলোটা। চোখে বিনকিউলার লাগাল সোহানা, সময় নিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর উৎফুল্ল কিন্তু চাপা গলায় বলে উঠল, 'এসে গেছি, রানা! ওটাই টাইখোন!'

তেমন একটা ভাবান্তর হলো না রানার মধ্যে। মন দিয়ে ডিঙি চালাচ্ছে ও। ইঞ্জিনের গতি কমিয়ে এনেছে অনেকখানি। যতদূর জেনেছে টাইখোনের সৈকতসংলগ্ন সমুদ্রসীমার কয়েক বর্গমাইলে ডুবোপাথর নেই তেমন। কিন্তু যেদিক দিয়ে এগোচ্ছে ওরা সেদিকে দু'-চারটে "জট" থাকলেও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে গেলে পাথরের সঙ্গে খোঁচা লেগে ফুটো হবে ডিঙি, তীরে এসে ডুববে তরী।

রানার মনোযোগ লক্ষ করে বিনকিউলারটা সরিয়ে রাখল সোহানা। সাগরের ঢেউগুলোর উপর নজর দিয়েছে। ডুবোপাথরের কোনো জট চোখে পড়লে সতর্ক করবে রানাকে। কিন্তু কপাল ভালো, সে-রকম কিছুর মুখোমুখি হতে হলো না। ঢেউয়ের মতিগতি বুঝে নিয়ে একটু একটু করে এগোচ্ছে রানা।

লাইটহাউসটা যে-পাহাড়ের উপর আছে সেটা, কুয়াশার চাদরের পটভূমিতে হঠাৎ করেই দেখা দিল একসময়। দিক বদল করল রানা। লাইটহাউসটা বাঁয়ে রেখে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

টাইখোনের ড্রয়িং আর ব্লুপ্রিন্ট থেকে জেনেছে, নির্জন সৈকতের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে পাহাড়ি দেয়ালের একটা প্রাকৃতিক টানেল আছে—প্রায় আশি ফুট উঁচু আর দু'শ' গজের মতো চওড়া। রানারা এখন যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে, অর্থাৎ সৈকত থেকে খানিকটা ডানে প্রায় একশ' গজের মতো এগিয়েছে দেয়ালটা। ডিঙি নৌকা তো বটেই, মাঝারি আকারের একটা ক্রুয শিপও যেতে পারবে এদিক দিয়ে।

ডিঙির গতি আরও কমাল রানা, কারণ পাহাড়ি দেয়ালে বাড়ি

খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। সোহানার দিকে তাকাল। 'একটু ঝুঁকি নিতে হবে আমাদেরকে।'

'কী রকম?'

'আলো জ্বালতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করল সোহানা। ডিঙির নাকের কাছে গিয়ে লাইটধরা হাতটা কিছুটা ঝুলিয়ে দিল নীচের দিকে। এতে আলোর বৃত্তটা ছোট থাকবে, ফেনিল স্রোতের কম অংশই আলোকিত হবে। দূর থেকে দেখলে একটা ডিঙি নৌকার উপস্থিতি টের পেতে সময় লাগবে দর্শকের।

আরও কিছুদূর যাওয়ার পর ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বৈঠা তুলে নিল রানা। দাঁড় বাইছে আর এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। খানিক বাদে বলল, 'সোহানা, আলোটা তুলে ধরো। আমাদের বাঁয়ে, পাহাড়ি দেয়ালের গায়ে। দেখতে পাচ্ছ?'

রানা বলার সঙ্গে সঙ্গে জায়গামতো আলো ফেলল সোহানা। প্রথমে চোখ এড়িয়ে গেলেও এবার আর অসুবিধা হচ্ছে না দেখতে।

সোহানার নাগালের মধ্যেই পাহাড়ের দেয়াল থেকে বের হয়ে আছে অনেকটা রেইলরোড স্পাইকের মতো দেখতে কিছু একটা। সেটার এক ফুট উপরে আরেকটা, তার এক ফুট উপরে আরও একটা। এভাবে অনেকগুলো।

কোনো কোনো স্পাইক বেঁকেচুরে গেছে, কোনো কোনোটাতে মরচে ধরে গেছে। কোনোটা আবার দেয়াল থেকে খুলে গিয়ে পড়ি পড়ি করছে।

কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, উপরে ওঠার মইয়ের সামনে হাজির হয়েছে রানা-সোহানা।

'পেট্রোলবোটটা যদি রুটিন টহলে বের হয়ে থাকে,' ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনদিকে দেখে নিয়ে বলল সোহানা, 'তা হলে আমার

মনে হয় ইতিমধ্যে ফিরতি পথ ধরেছে। হাতে বড়জোর চার কি পাঁচ মিনিট সময় পাচ্ছি আমরা।'

পেট্রোলবোটের ব্যাপারটা রানার পরিকল্পনায় নাড়া দিয়েছে। ডিঙিটাকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছে। এখানে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে গেলে কারও-না-কারও চোখে পড়বেই। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠবে টাইখোনের অ্যালার্ম সিস্টেম। ডিঙিটাকে লুকিয়ে রাখার মতো জায়গা খুঁজে বের করার সময়ও নেই। তার মানে রানার হাতে একটা মাত্র অপশন আছে।

যার যার ব্যাকপ্যাক কাঁধে ঝুলাল ওরা। পাহাড়ি দেয়ালে একটা হ্যাণ্ডহোল্ড দেখা যাচ্ছে, দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে ওটা ধরল রানা, ডিঙির দুলুনি অনেকখানি কমল। তারপর ইশারা করল সোহানাকে। একহাতে দেয়ালে ভর দিয়ে রানার কাঁধে দাঁড়িয়ে গেল সোহানা, প্রথম স্পাইকটা ধরল। দেরি না করে উঠে গেল বেশ কিছুটা উপরে। ওর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা সুইস আর্মি নাইফ বের করল রানা, ফলা খুলল। ডিঙির সাইড টিউবের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত চিরে দিল একটানে। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ধরল প্রথম স্পাইকটা। পর পর কয়েকটা স্পাইক ধরে উঠে গেল উপরে, সোহানার কাছাকাছি। নীচে তখন মৃদু হিসহিস আওয়াজ তুলে ডুবে যাচ্ছে ডিঙি।

'হাতে কতখানি সময় পাচ্ছি আমরা?' নিচু গলায় সোহানাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বেশি হলে তিন মিনিট,' আরও উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে সোহানা।

অর্ধেকটা পথ ওঠা হয়েছে, এমন সময় ডানদিকে থেকে আউটবোর্ড ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল রানা। চিন্তার বিষয়, কারণ আওয়াজটা প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে। তারমানে টানেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বোটটা।

'সোহানা, আমাদের বন্ধুরা হাজির!' বিড়বিড় করল রানা।

'আরেকটু উপরে একটা টানেল দেখতে পাচ্ছি,' চাপা গলায় বলল সোহানা। 'ওটা ভেতরের দিকে অনেকখানি ঢুকে গেছে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কতদূর গেছে বুঝতে পারছি না।'

'ঝড়ের সময় জাহাজ ভেড়ানোর মত বন্দর হলেই হলো, সেটা কোন্ বন্দর দেখে কাজ নেই। উঠতে থাকো।'

আরও কাছিয়ে এসেছে ইঞ্জিনের আওয়াজ। রানা-সোহানার মনে হচ্ছে পেট্রোলবোটটা ওদের ঠিক নীচেই এসে হাজির হয়েছে যেন। নীচের দিকে তাকাল রানা। কুয়াশার কারণে দেখা যাচ্ছে না বোট। ইঞ্জিনের শব্দ যেখান থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে, উপর থেকে সেদিকে তাকালে দেখা যায় অস্পষ্ট কিছু একটাকে ঘিরে পাক খাচ্ছে কুয়াশা। এবং পাক খেতে খেতে ক্রমশ আরও ঘন হচ্ছে যেন। স্পটলাইটটা জ্বলে উঠল হঠাৎ। আলো গিয়ে পড়ল প্রথম স্পাইক যেখানে ছিল সে-জায়গার কাছাকাছি। এদিক-সেদিক ঘুরছে আলোটা, আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে।

চমকে গেল রানার কলজেটা।

আট

'ঢুকে গেছি,' টানেলের ভিতর থেকে সোহানার ফিসফিসানি শোনা গেল।

ভিতর থেকে প্রচণ্ড একটা তাড়া অনুভব করছে রানা। বারো-

চোদ্দ ফুট উপরে টানেলটা, মাঝখানে কয়েকটা স্পাইক। নীচের পাক-খাওয়া কুয়াশা ম্লান থেকে আরও ম্লান হয়ে যাচ্ছে স্পটলাইটের আলোর কাছে। তাড়া খেলে টিকটিকি যেভাবে হন্তদন্ত হয়ে ছুটতে শুরু করে, সেভাবে কখন উঠতে শুরু করল রানা নিজেও বলতে পারবে না। বলতে পারবে না কখন হাজির হলো টানেলটার কাছে, কখন সোহানার হাত দুটো আঁকড়ে ধরল ওর দুই হাত, কখন কনুইয়ে ভর দিয়ে দু'পা ভাঁজ করে ধুলোর ছোট্ট একটা মেঘ তৈরি করে ঢুকে গেল ও টানেলের ভিতরে।

দুই কি বেশি হলে তিন সেকেণ্ড পরই টানেলের মুখ ভেসে গেল উজ্জ্বল আলোর বন্যায়। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে স্থির থাকল আলোটা, পেট্রোলবোটের লোকগুলো বোধহয় বুঝতে চাচ্ছে কী কারণে ধুলোর মেঘ তৈরি হয়েছে হঠাৎ। নিশাচর কোনো পাখি—সিদ্ধান্ত নিল ওরা সম্ভবত, তারপর আলোটা মসৃণ গতিতে উঠতে শুরু করল আরও উপরের দিকে।

টানেলের ভিতরে অন্ধকার। হাঁপাচ্ছে রানা। হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকানি টের পাচ্ছে। মুখ হাঁ করে দম নিচ্ছে তবে খেয়াল রেখেছে কোনো শব্দ যাতে না হয়। স্পটলাইটটা নিভে গেল। ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বোঝা গেল পেছাতে শুরু করেছে বোটটা। প্রতিধ্বনি কমছে, প্রতি মুহূর্তে কমে যাচ্ছে আগের চেয়ে বেশি। তারপর একসময় মিলিয়ে গেল। এখন চারপাশে নিথর নীরবতা।

'কোন্ জায়গায় হাজির হয়েছি?' কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসেছে রানা, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। টানেল কিছুটা ডিম্বাকৃতির, পাঁচ ফুটের মতো উঁচু, চওড়ায় ফুট ছয়েক।

জবাব দিল না সোহানা। এদিক-ওদিক দেখছে সে-ও।

টানেলের মুখের কাছে, ছাদের কাছাকাছি জায়গায় আঁকাবাঁকা কয়েকটা কাঠের-বীম দেখা যাচ্ছে। কুচকুচে কালো রঙের কারণে

বোঝা যায় এককালে আলকাতরার পুরু প্রলেপ দেয়া হয়েছিল ওগুলোতে। টানেলের দেয়ালের সঙ্গে কায়দা করে আটকিয়ে দেয়া হয়েছে কয়েকটা গুঁড়ি, ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে বীমগুলোকে। মরচে-পড়া, ঝুলন্ত ইস্পাতের দড়ি আর হস্তচালিত কপিকল দেখলে বোঝা যায় ওটা আসলে একটা পুলি-সিস্টেম। টানেলের মুখ থেকে শুরু হয়ে এগিয়ে এসেছে রেললাইনের মতো দুটো সমান্তরাল ন্যারো-গেইজ পাত। তারপর আরও ভিতরের দিকে ঢুকে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। মেঝেতে, বিশেষ করে দুই রেইলের মাঝখানে নুড়িপাথরের ছড়াছড়ি। কোনো কোনো জায়গা মাখামাখি হয়ে আছে নুড়ির গুঁড়োয়।

'চোরাচালানের মাল আনা-নেওয়ার জন্য কত চমৎকার লোকেশন বাছাই করা হয়েছে দেখেছ?' গলা খাদে নামিয়ে বলল সোহানা। 'খোলা সাগর থেকে এই পাহাড়ি দেয়ালের দিকে তাকালে, আগে থেকে জানা না থাকলে টানেলটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

উঠে দাঁড়াল রানা। সোহানার হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটটা নিল। 'চলো ভিতরে ঢুকি। দেখি ভাগ্য আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যায়।'

টানেল ধরে এগিয়ে চলেছে রানা-সোহানা। ফ্ল্যাশলাইটটা এখনও রানার হাতে। সতর্ক পায়ে এগোচ্ছে, বার বার এদিক-ওদিক আলো ফেলে দেখে নিচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় ডিনামাইট ফাটিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বড় করা হয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে হাতুড়ি শাবল আর গাঁইতি। টানেলটা বানিয়েছে যেসব শ্রমিক, হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়েছে তাদের।

মেঝের এখানে-সেখানে পড়ে আছে কাঠের টুলবক্স, আধা-পচা দড়ির বাণ্ডিল, মরচে-ধরা কুড়াল আর স্লেজহ্যামার। চামড়ার একপাটি বুট দেখা গেল একজায়গায়, অর্ধেক পচে গেছে।

আরেক জায়গায় কিছুটা গোটানো অবস্থায় পড়ে ছিল বেশ বড় সবুজ তেরপল, পথ করে নেয়ার জন্য সোহানা লাথি মারাতেই ছিঁড়ে গেল।

দু'দিকের দেয়ালেই ফুট দশেক পর পর কায়দা করে বসানো আছে তেলের কুপি। কাঁচগুলোতে কালি জমে জমে ঝুল পড়ে গেছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোতেও দেখা যায় ব্রোঞ্জের রিযার্ভয়ার আর হাতলগুলোতে তৈরি সবুজ দাগ। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একটা কুপির হাতলে টোকা দিল রানা, ধাতব আওয়াজ শুনল।

গজ পঞ্চাশেক এগোনোর পর থামল সোহানা। ট্রাউজারের পকেট থেকে স্কেচটা বের করল, ইঙ্গিতে রানাকে বলল আলো ধরতে। তারপর স্কেচটা কিছুক্ষণ দেখে বলল, 'আউটার ওয়ালের ঠিক নীচে আছি আমরা। আর একশ' গজ এগোলে মূল ভবনের নীচে গিয়ে হাজির হবো।'

দু'-তিন মিনিট পর চওড়া একটা জায়গায় গিয়ে হাজির হলো ওরা। টানেলের এই অংশটা দেখতে ইন্টারসেকশনের মতো—রানা-সোহানা যেদিক থেকে এসেছে সেটা সোজা চলে গেছে সামনের দিকে, একটা অংশ ডানদিকে বের হয়ে এগিয়ে গেছে অনেকখানি। বাঁ দিকের দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে পুরনো আমলের পাঁচটা ওর-কার্ট। আরও একটা কার্ট আছে; ডানদিকের ট্র্যাকের একধারে পড়ে আছে নিতান্ত অবহেলায়।

'সোজা আস্তাবলের দিকে এগোবো আমরা,' হাতঘড়ি দেখে নিয়ে বলল রানা। 'আমার ধারণা পুব উইং-এর অনেক কাছে চলে যেতে পারবো তা হলে। দেখি কী পাওয়া যায় সেখানে।'

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

আরও আধ মাইলের মতো এগোনোর পর হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সোহানা, ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে কথা বলতে নিষেধ

করল রানাকে। কান পেতে কী যেন শুনল কিছুক্ষণ। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতল রানাও। কিছুক্ষণ শোনার পর মাথা ঝাঁকাল। 'মিউযিক।' টানা দশ সেকেণ্ড মন দিয়ে শুনল ও বাজনাটা। তারপর আবার ফিসফিসিয়ে বলল, 'স্প্রিং হুইস্পার।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'মানে?' জিজ্ঞেস করল ফিসফিস করে।

'শোনোনি ওটা? বিখ্যাত একটা গান। এম টিভি টপ চার্টে বেশ কয়েক সপ্তাহ ছিল গানটা।'

'তুমি যে গান শোনারও সময় পাও আজ জানলাম।'

'চিত্ত বিনোদন,' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তবে মাঝেমধ্যে।'

'লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ পাচ্ছি। হাসছে অনেকে... একসঙ্গে গাইছেও বোধহয়।'

'হুঁ। চলো এগোই।'

এগিয়ে চলল ওরা। একসময় শেষ হয়ে গেল টানেলটা। সামনে এখন পাথরের কয়েক ধাপ সিঁড়ি, শেষমাথায় কাঠের একটা ট্র্যাপডোর।

নাক উঁচু করে গন্ধ শুঁকল রানা কয়েকবার। 'পেশাবের গন্ধ না?' বলল ফিসফিস করে।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তার মানে ঠিক জায়গাতেই হাজির হয়েছি।'

গান আর হাসাহাসির আওয়াজ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। মনে হচ্ছে রানা-সোহানার ঠিক উপরেই বাজছে মিউযিক, হুড়োহুড়ি করছে লোকে। সিঁড়ির শেষধাপে পা রাখল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাপডোরের উপর কার যেন পা পড়ল, মচমচ করে উঠল পুরনো কাঠ। বরফের মতো জমে গেল রানা।

একটু পর আবার শোনা গেল মচমচানি। তারমানে এবার ট্র্যাপডোরের উপর দু'পা তুলে দাঁড়িয়েছে লোকটা। দু'-তিন সেকেণ্ড পরই আরেকজোড়া হালকা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল, ট্র্যাপডোরের উপরই। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে, পায়ের মালিকদের আসা-যাওয়ার কারণে কয়েকবার বাধাগ্রস্ত হলো।

খিলখিল করে হাসল একটা মহিলা। কড়া রাশান টানে ন্যাকামি করে ইংরেজিতে বলল, 'আহ্ কী করছ? ছাড়ো না! সুড়সুড়ি লাগে।'

'যাতে সুড়সুড়ি লাগে সেজন্যই তো দিচ্ছি,' গদগদ কণ্ঠে বলল তার পুরুষ সঙ্গী। 'এটা আমার নতুন আইডিয়া। একটু পরই পাগল বানিয়ে দেব তোমাকে।'

'কিন্তু...তোমার স্ত্রী...'

'জাহান্নামে যাক শাকচুন্নীটা। ওকে নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই আমার।'

'চলো ফিরে যাই পার্টিতে। এখানে কেউ আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখে ফেললে সন্দেহ করবে।'

'যাবো। কিন্তু তার আগে কথা দিতে হবে তোমাকে।'

'কী কথা?'

'সামনের সপ্তাহে তোমার বাসায় যাবো আমি। তোমার ওই খোদার-খাসি স্বামীটা যখন বাসায় থাকবে না তখন...' বাকিটা না বলে খিকখিক করে হেসে বুঝিয়ে দিল লোকটা।

'আচ্ছা যাও, কথা দিলাম। সামনের সপ্তাহে। এবার চলো।'

বিদায় নিল কপোতকপোতী। দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পেল রানা-সোহানা। উপরের কোনো এক জায়গায় মৃদু হ্রেষাধ্বনি করল একটা ঘোড়া। তারপর সব চুপচাপ।

'পার্টি দিয়ে বসে আছে সিদোরভ,' রানার কাছে ঘেঁষে এসেছে সোহানা, ফিসফিস করে বলছে, 'কপাল খারাপ থাকলে যা হয়

আর কী।'

'কেন? কপাল ভালোও তো হতে পারে।'

'মানে?'

'আপাতদৃষ্টিতে যা খারাপ তাকে কাজে লাগাতে পারার মধ্যেই তো কৃতিত্ব, নাকি?'

'কীভাবে?'

'উপরে যারা আছে তাদের মধ্যে সিদোরভসহ হাতেগোনা কয়েকজন আমাদেরকে চেনে। বাকিরা?'

'মানে...তুমি...'

'হ্যাঁ, যা ভাবছ তা-ই। এবার এসো, সময় নষ্ট করা ঠিক না।' সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেল রানা, ট্র্যাপডোরের হ্যাচ খোলার আগে কান পেতে শুনল আরও একবার। উপরে কেউ নেই নিশ্চিত হওয়ার পর হ্যাচ খুলে পাল্লা ধরে ঠেলে খুলল। পাল্লাটা খোলা অবস্থায় ধরে রেখে ঘাড় উঁচু করে তাকাল এদিক-সেদিকে। তারপর নীচের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বলল, 'এটা একটা ল্যাট্রিন, পুরনো আমলের। তবে খুব একটা ব্যবহৃত হয় বলে মনে হয় না। হলে দুর্গন্ধ আরও বেশি হতো। এসো।'

বলতে বলতে পাল্লাটা উপরের দিকে আরও ঠেলে উঠে গেল ও। সোহানা না ওঠা পর্যন্ত ধরে রাখল ওটা। তারপর যেভাবে ছিল সেভাবে লাগিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দু'দিকে দুটো দরজা। একটা দরজা কিছুক্ষণ আগে টেনে দিয়ে গেছে কপোতকপোতী, আরেকটা আধখোলা। শেষের দরজা দিয়ে মৃদু আলো আসছে। ওপাশে আস্তাবল।

এগিয়ে গিয়ে আস্তাবলে উঁকি দিল রানা।

পুরু তক্তা কেটে খাঁজে খাঁজে বসিয়ে বানানো হয়েছে সারি সারি হর্সস্টল। ভিতরে বেশ কয়েকটা ঘোড়া আছে, থেকে থেকে কানে আসছে মৃদু হ্রেষাধ্বনি আর নাক ঝাড়ার আওয়াজ। উঁচু

ছাদের দু'দিকের দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর এগ্‌যস্ট ফ্যান বসানো। কয়েকটা ফ্যান চলছে, তবে বেশিরভাগই বন্ধ। যেগুলো বন্ধ করে রাখা হয়েছে সেগুলোর ফাঁক গলে ভিতরে ঢুকে পড়েছে চাঁদের আলো। আস্তাবলে খেলা করছে অদ্ভুত আলোআঁধারি।

সরে এল রানা। সোহানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ইশারায় দেখিয়ে দিল দ্বিতীয় দরজাটা দিয়ে বের হতে চায়। কিছু না বলে ওর পিছু নিল সোহানা। গজ ত্রিশেক এগোনোর পর দরজাটা খুলে সাবধানে উঁকি দিল রানা। সামনে সবুজ ঘাসে-ছাওয়া বিশাল লন। লনটা এত বড় যে, বিশাল বললেও আসলে কম বলা হয়। শেষপ্রান্তে দেখা যাচ্ছে বুক সমান উঁচু কিছু ঝোপঝাড়, সুন্দর করে ছেঁটে রাখা। লনের নির্দিষ্ট জায়গায় জ্বলছে অনেকগুলো টিকি লণ্ঠন—বিশেষভাবে বানানো তেপায়া নরম মাটিতে গেঁথে দিয়ে উপরে বসানো হয়েছে সুদৃশ্য বোল, তাতে কেরোসিন ঢেলে সলতেয় দেয়া হয়েছে আগুন।

লনজুড়ে টানানো হয়েছে লম্বা লম্বা তার। সেগুলোতে ঝুলছে বহু বর্ণের বিচিত্র রেশমী ব্যানার। ডিনার জ্যাকেট অথবা ইভনিং গাউন পরা ডজন ডজন অতিথিকে দেখা যাচ্ছে। বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে বেশিরভাগ, কেউ কেউ হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে। বেশিরভাগই যুগল, যারা একা তাদের দৃষ্টিতে সঙ্গী পাওয়ার আকুলতা। আলাপে ব্যস্ত প্রায় সবাই, কেউ কেউ আবার হেসে কুটিকুটি হচ্ছে।

সাদা ইউনিফর্ম পরে ব্যস্ত পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে ওয়েটাররা, সমানে পরিবেশন করছে শ্যাম্পেন বা ককটেল। ঝোপঝাড় কিংবা টেবিলের তলায় লুকানো লাউডস্পিকারে এখনও বাজছে স্প্রিং হুইস্পার গানটা, তবে শেষ হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। অতিথিদের কেউ কেউ জড়ানো গলায় "এগেইন এগেইন" বলে চেঁচাচ্ছে। অর্থাৎ গানটা আবার শুনতে চায় তারা।

অল্পবয়সী পার্টি ডিজেকে দেখতে পেল রানা একধারে। একগাদা ইন্সট্রুমেন্টে ভরা চওড়া একটা টেবিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে গানের তালে তালে শরীর দোলাচ্ছে, আর অকারণেই দাঁত বের করে হাসছে একটু পর পর। বিশাল ইয়ারফোনের কারণে অদৃশ্য হয়ে গেছে দু'কান। কাজেই যারা এগেইন এগেইন বলছে, ধরে নেয়া যায় তাদের আবেদন শোনেনি ছোকরা।

লন ছাড়িয়ে দূরে তাকালে চোখে পড়ে সিদোরভের ম্যানসন, অর্থাৎ, ম্যানসনের উপরের তলাগুলো। আকাশে চাঁদ আছে, মেঘও আছে; তাই আলোআঁধারির পটভূমিতে দূর থেকে অদ্ভুত এক ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে বিশাল বাড়িটাকে। হাতের বাঁ দিকে, নির্দিষ্ট এক জায়গায়, উধাও হয়ে গেছে ঝোপঝাড়ের সারি। ওটা এন্ট্রেন্স গ্যাপ। এখান দিয়ে দেখা যায় নুড়িপাথর বিছানো সুন্দর পার্কিংলট। কয়েক মিলিয়ন ডলার দামের কিছু মার্সিডিস, ল্যাম্বর্ঘিনি আর বেণ্টলিও চোখে পড়ে।

'অতিথিদের পাশে যদি গিয়ে দাঁড়াই আমরা,' নিচু গলায় বলল সোহানা, 'আমাদেরকে সিদোরভের চাকরও মনে করবে না, কেউ। ওদের ড্রেস দেখো- আর আমরা কী পরে আছি দেখো।'

'সিদোরভকে দেখতে পাচ্ছ কোথাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

দরজার পাল্লাটা ঠেলে আরেকটু খুলল সোহানা। পুরো লন, পার্কিং লট, এমনকী দূরের বাড়িটাও দেখল কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে। তারপর মাথা নাড়ল। 'এখানে সে থাকলেও আলাদা করে চেনার উপায় নেই। কারণ প্রথম কথা অনেক দূরে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। দুই, ওই টিমটিমে আলোতে কাউকে আলাদা করে চেনাও মুশকিল।'

দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'চলো দক্ষিণপুব উইংটা দেখে আসি।'

ল্যাট্রিনের ট্র্যাপডোর দিয়ে টানেলে নেমে এসেছে ওরা দু'জনে, পুবদিকে এগোচ্ছে। কয়েকটা সাইড টানেল চোখে পড়ল ওদের, বিশ-ত্রিশ ফুট পর পর বানানো হয়েছে।

'স্টোরেজ চেম্বার,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলল হাতে-ধরা স্কেচের উপর। 'সাইড-টানেলগুলো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কোন্‌দিকে গেছে সে-ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেনি মিরোস্লাভ।'

হাঁটার গতি কমিয়ে সামনে আলো ফেলল রানা। অন্ধকার এত বেশি যে, দশ ফুটের বেশি দূরে দেখা যায় না। শব্দ করে বয়ে যাচ্ছে বাতাস, কান পাতলে শোনা যায়, কিন্তু তা-ও এখান থেকে যথেষ্ট দূরে মনে হচ্ছে।

ধীর গতিতেই হাঁটতে হাঁটতে আরও কয়েক শ' গজ এগোল ওরা, তারপর হঠাৎই দেখতে পেল পাথরের আরেকটা সিঁড়ি। এবার এগিয়ে গেল সোহানা, শেষধাপে উঠে কান খাড়া করে শুনল কিছুক্ষণ। ট্র্যাপডোরের ওপাশটা নিস্তব্ধ, কেউ নেই মনে হয়। হ্যাচ খুলে পাল্লা ঠেলে উপরে তুলল ও, চট করে ডানে-বাঁয়ে দেখে নিয়েই আবার নামিয়ে রাখল পাল্লাটা।

'কী?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, সিঁড়ির শেষধাপের কাছে দাঁড়িয়ে আছে।

'আলকাতরার মতো অন্ধকার,' চাপা গলাতেই জবাব দিল সোহানা। 'উপরে কী আছে না আছে বোঝার উপায় নেই।'

'চলো উঠি,' দুটো ধাপ ডিঙাল রানা। 'চোখে অন্ধকার সয়ে এলে হয়তো বোঝা যাবে।'

পাল্লাটা উঠিয়ে উপরে উঠে গেল সোহানা। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ধরে রাখল ওটা যাতে রানা এসে দাঁড়াতে পারে পাশে। জায়গামতো হাজির হওয়ার পর হ্যাচ লাগিয়ে দিল রানা, সোজা

হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। অন্ধকার আস্তে আস্তে সয়ে এল চোখে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে চার ফুট বাই চার ফুটের বর্গাকৃতির একটা জায়গায় হাজির হয়েছে। কিছুক্ষণ আগে সোহানা বলেছিল আলকাতরার মতো অন্ধকার, কিন্তু আসলে তা না। খুবই সরু আলোর রেখা আসছে হাতের বাঁ দিক থেকে। পা টিপে সেদিকে এগিয়ে গেল রানা। যে-ছিদ্র বা ফুটো দিয়ে আলো আসছে, চোখ রাখল সেটাতে। কিছুক্ষণ দেখার পর ফিরে এল সোহানার কাছে।

'কী?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সোহানা।

'আমি...নিশ্চিত না। মনে হয় বুকশেল্ফ।'

'বুকশেল্ফ?'

আলোটার দিকে আবারও এগিয়ে গেল রানা। দেয়ালের কুলুঙ্গিতে হুড়কা বা খিলের মতো কিছু একটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়, হাত দিয়ে ধরে বুঝল রানা জিনিসটা কাঠের। হুড়কাটা তুলল ও, পাঁচ আঙুলসহ হাতের তালু রাখল কুলুঙ্গির গায়ে, আস্তে ঠেলা দিল। লুকানো কব্জার কারণে দেয়ালটা ভিতরের দিকে ঢুকে গেল কিছুটা। উন্মুক্ত হয়ে গেছে একফুট চওড়া একটা গহবর।

ভিতরে মাত্র পা রেখেছে রানা এমন সময় যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছে এ-রকমভাবে ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে এল। হাতের চাপ সরিয়ে নিল কুলুঙ্গির উপর থেকে। স্বয়ংক্রিয় কব্জার উপর ভর করে দেয়ালটা লেগে গেল আগের জায়গায়। মৃদু ক্লিক আওয়াজ শোনা গেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা পুরুষ কণ্ঠও, 'কে, মারিয়া?'

'দম বন্ধ করে ফেলেছে রানা-সোহানা। কুলুঙ্গিটার কাছ থেকে সরে গেছে দু'জনে, দু'দিকে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে

আছে।

'মারিয়া?' দেয়ালের ওপাশ থেকে আবারও ডাকল পুরুষকণ্ঠ।

কোনো সাড়া নেই। থাকার কথাও না।

কয়েক সেকেণ্ড পর পানি পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। সেটা থেমেও গেল কিছুক্ষণ পর। মৃদু ঘর্ষণের শব্দ শোনা গেল। কার্পেটের উপর দিয়ে পা টেনে টেনে কেউ হেঁটে যাচ্ছে সম্ভবত। দরজা খুলল কেউ। তারপর বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল বোধহয়।

টানা দু'মিনিট অপেক্ষা করল রানা। তারপর কুলুঙ্গিতে ঠেলা দিয়ে বুকশেল্ফটা খুলল আবার। উঁকি দিল ভিতরে। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল সোহানাকে, 'অল ক্লিয়ার।'

ভিতরে ঢুকল দু'জনে।

এটা কারও বেডরুম। আনুমানিক পঁচিশ ফুট বাই বিশ। লাগোয়া বাথরুম আছে। দামি আখরোট-কাঠের ভারী ভারী আসবাবে ঠাসা। পুরনো আমলের একটা খাট দেখা যাচ্ছে এককোনায়। মেঝেতে বহুল ব্যবহৃত তুর্কি কার্পেট।

'এবার?' রানার কানের কাছে ফিসফিস করল সোহানা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এবার একটু সাজুগুজু করতে হবে আমাদের।'

ভ্রূ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

'সিদোরভের পার্টিতে যোগদান করতে হবে না?' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল রানা।

নয়

'তুমি সিরিয়াস, রানা?' বোঝা গেল আশ্চর্য হয়েছে সোহানা।

'কেন, তোমার কি মনে হয় দুষ্টামি করছি?'

'তুমি...তুমি আসলে কী বলছ বুঝতে পারছি না।'

'আমিও বুঝতে পারছি না না বোঝার মতো কী বললাম।'

'আমাদের পক্ষে কি পার্টিতে গিয়ে যোগ দেয়া সম্ভব?'

'সম্ভব।'

'কীভাবে?'

'ওখানে কোনো সিকিউরিটি গার্ড দেখেছ?'

কিছুক্ষণ ভাবল সোহানা। তারপর বলল, 'না। কিন্তু...লনে নেই, অন্য কোথাও থাকতে পারে।'

'এই তো বুঝতে পারছ আস্তে আস্তে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই অন্য কোথাওটা কোন্ জায়গা?'

আবারও কিছুক্ষণ ভাবল সোহানা। তারপর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'সিদোরভের বিশেষ সেই যাদুঘর?'

'আমারও তা-ই ধারণা। আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে বিশেষ সেই যাদুঘর থেকে দূরে রাখার জন্য সিকিউরিটি গার্ডদের কাজে লাগাচ্ছে সিদোরভ। নিশ্চিত থাকতে পারো লনে হাজির হওয়ার আগে ওদেরকে ভালোমতো চেক করা হয়েছে, কারও কাছে কোনো অস্ত্র আছে কি না দেখা হয়েছে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। লনে যারা মাতামাতি করছে, তাদের কারও ইনভাইটেশন কার্ড তো

চেক করতে দেখলাম না কাউকে।'

'তারমানে তুমি বলতে চাইছ...'

'হ্যাঁ, আমি বলতে চাচ্ছি আমরা যদি গিয়ে হাজির হই ওখানে তা হলে আমার মনে হয় না কেউ চ্যালেঞ্জ করবে আমাদেরকে। তা ছাড়া সিদোরভ কল্পনাও করবে না ওর বাড়িতে হানা দিতে পারি আমরা। এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট।'

চুপ করে আছে সোহানা।

'কী ভাবছ?' জানতে চাইল রানা। 'সাহসী আর বলদদেরকে ভাগ্য সাহায্য করে, জানো না?'

'জানি। আমি সাহসী আর তুমি বলদ বলে ডবল সাহায্য পাচ্ছি। কিন্তু সিদোরভ নিজে যদি হাজির হয় হঠাৎ করে, কী করবে?'

'বার বার একই ভুল করছ, সোহানা। সিদোরভ হঠাৎ করে হাজির হলেও সমস্যা নেই। কারণ সে আমাদেরকে পাকড়াও করার জন্য হাজির হবে না। ওরও জানা নেই আমরা এসেছি এখানে। আর সে-রকম কিছু যদি ঘটেও, আমার মনে হয় লুকিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে যাবো। আমাদেরকে প্রাথমিকভাবে যে-কাজটা করতে হবে তা হলো, গেস্টদের উপর চোখ রাখা, ওদের ভিড়ে মিশে থাকা। পরিচিত কারও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা কম, তারপরও সে-রকম কেউ যদি থাকে তা হলে তার বা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে আমাদেরকে। অতিথিদেরকে কভার হিসেবে ব্যবহার করে বিশেষ সেই যাদুঘরের দিকে এগিয়ে যাবো। আর তোমার কথা অনুযায়ী যদি হঠাৎ করে হাজির হয় সিদোরভ, অতিথিদের হাবভাবেই তা জানতে পারবো।'

'যদি তোমার কোনো প্ল্যানই কাজে না লাগে? যদি সব ভেস্তে যায়?'

'তা হলে এখানে ফিরে এসে নতুন করে প্ল্যান করবো,' আরও

একবার নিঃশব্দে হাসল রানা। 'অনেক জামাকাপড় আছে এই ঘরে, কোন্‌গুলো আমাদের গায়ে হবে বেছে নিয়ে এসো পরে ফেলি চটপট। মারিয়া বা তার স্বামীর হাতে ধরা পড়তে চাই না।'

মারিয়ার স্বামীর একটা ঝকঝকে পার্টি-স্যুট চমৎকার মানিয়ে গেল রানাকে। ভয় হচ্ছিল শু নিয়ে, তবে তা-ও থাকল না যখন রানা পুরনো কিন্তু পলিশ-করা একপাটি বেছে নিয়ে পায়ে দিয়ে বুঝল মারিয়ার স্বামীর পা ওর চেয়ে সামান্য ছোট। জুতোজোড়া একটু টাইট হচ্ছে, তাবে কাজ চালানো যাবে। যে-ওয়েস্টব্যাণ্ডটা পরেছে রানা তা দেখলে কেউ বলবে না ওটা ওর না, যদিও পরার সময় অনেক তাড়াহুড়ো করতে হয়েছে।

সমস্যা হলো সোহানাকে নিয়ে। মারিয়ার ভি-গলার একটা কালো ইভনিং গাউন বাছাই করেছে ও। গায়ে দেয়ার আগেই বোঝা গেল মারিয়া মোটেও স্বাস্থ্যসচেতন না। কালো রঙের কয়েকটা সেফটিপিন খুঁজে বের করতে গিয়ে মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট করতে হলো রানাকে। শেষে জায়গামতো সেফটিপিন আটকে গাউনটা যখন সেঁটে দিল সোহানার গায়ের সঙ্গে, দেখে বোঝার উপায় থাকল না ওটা সোহানার না।

আগেই পালাক্রমে মুখহাত ধুয়ে নিয়েছে ওরা, এবার চুল আঁচড়ে নিল পরিপাটি করে। ক্যামোফ্লাজ কভারল আর ব্যাকপ্যাকগুলো বুকশেল্ফের আড়ালে রেখে এল রানা, তবে তার আগে জরুরি কিছু জিনিস বের করে ঢুকিয়ে নিল পকেটে। বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দেখে নিল শেষবারের মতো। তারপর সোহানার সঙ্গে হাত ধরাধরি করে দরজা খুলে বেরিয়ে এল বাইরে। হল ধরে হাঁটতে শুরু করল।

হলরুমের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে কালচে কাঠের কারুকাজ। ট্যাপেস্ট্রি আছে, আরও আছে ল্যাণ্ডস্কেপ অয়েল পেইন্টিংস।

মেঝেতে ছোট ছোট গালিচা বিছানো আছে, একটা একটা করে দরজা পাশ কাটাচ্ছে আর মনে মনে গুনছে রানা। ত্রিশতম দরজাটা পাশ কাটানোর পর হঠাৎ থেমে দাঁড়াল ও। থেমে দাঁড়াল সোহানাও, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে রানার দিকে।

'কারা যেন কথা বলছে এই ঘরের ভিতর, শুনতে পাচ্ছ?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল রানা।

কান পাতল সোহানা। কিন্তু কিছু শুনতে পেল না। একটু আগে যে বা যারা কথা বলছিল তারা এখন হয়তো চুপ হয়ে গেছে।

মাথা নেড়ে রানার হাত ধরে টান দিল সোহানা। আবার হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। হলের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল। সামনে পুরু, কালচে কাঠে বানানো একটা দরজা, ওটা খুলে ঢুকে গেল ভিতরে।

এই ঘরের ছাদ বেশ উঁচু। একদিকে শোভা পাচ্ছে বাদামি গ্র্যানিট পাথর দিয়ে বানানো সর্পিল সিঁড়ি। দামি ডিভান আর চামড়ার গদিমোড়া চেয়ার দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ঘরটাকে। দু'দিকের দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ঝুলছে মোমদানি, সেগুলোতে জ্বলছে সুদৃশ্য মোমবাতি; অদ্ভুত এক আভা রানা-সোহানার দু'পাশে। খানিকটা এগিয়ে গেলে, হাতের ডানদিকে, খিলানাকৃতির একটা ডোরওয়ে।

এ-মুহূর্তে দরজাটা খোলা। সেখান দিয়ে একজন-দু'জন করে অথবা জোড়ায় জোড়ায় অতিথিরা ভিতরে ঢুকছে। কেউ বসে পড়ছে চেয়ারে বা ডিভানে, কেউ আবার সরে যাচ্ছে কোনার দিকে।

রানার কোটের হাতা ধরে মৃদু টান দিল সোহানা। ওর দিকে তাকাল রানা।

'তুমি আমি কেউই রাশান বা ইউক্রেনিয়ান ভালো পারি না।'

'কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ তো পারি,' রানার মুখে মুচকি হাসি।

'ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ? ইংরেজির কথা বলছ?'

'না। মুচকি হাসি আর সামান্য নডের চেয়ে বড় আর কোনো আন্তর্জাতিক ভাষা নেই।'

পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল এক দম্পতি, রানাকে কী যেন জিজ্ঞেস করল পুরুষটা, জবাবে মিষ্টি করে হেসে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা। প্রত্যুত্তরে হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা।

'দেখলে?' নিচু গলায় সোহানাকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কী গুণ আন্তর্জাতিক ভাষার?'

মুচকি হেসে রানার হাত ধরে টেনে ওকে খিলানাকৃতির দরজাটার কাছাকাছি নিয়ে গেল সোহানা।

সুসজ্জিত ওয়েটাররা ইতিমধ্যে ছোটাছুটি শুরু করে দিয়েছে ঘরের ভিতর। প্রত্যেকের হাতে চকচকে ট্রে, তাতে অনেকগুলো পানপাত্র, আর সেগুলো কানায় কানায় পূর্ণ বুদবুদ ছড়ানো মাত্র-ঢালা দামি শ্যাম্পেনে। আমন্ত্রিত অতিথিরা চিলের মত ছোঁ মেরে শ্যাম্পেনের পাত্র তুলে নিয়ে চুমুক দিচ্ছে। ভাবখানা এমন, কিছুক্ষণের মধ্যেই দুনিয়া থেকে শ্যাম্পেন নামের পানীয়টা উধাও হয়ে যাবে।

মাথা নেড়ে সামনে-দাঁড়ানো ওয়েটারকে জানিয়ে দিল রানা শ্যাম্পেনে আগ্রহ নেই ওর। পূর্ণ দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল লোকটা, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করল সোহানাও। ঝকঝকে দু'পাটি দাঁত দেখিয়ে বিদায় নিল লোকটা।

'কেউ যদি এগিয়ে আসে আমাদের দিকে?' সোহানার শঙ্কা এখনও যায়নি। 'কেউ যদি যেচে পড়ে কথা বলতে চায়?'

'আমার সঙ্গে সে-রকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা কম,' বলে সোহানাকে আপাদমস্তক দেখল রানা। 'কিন্তু তোমার বেলায়

তেমনটা ঘটতে পারে। তোমার মতো সুন্দরী আছে লাখে একটা। না, ভুল বললাম, দশ লাখে... না, দশ কোটিতে একটা। কাজেই...'

'উফ্, রানা! চুপ করো তো। কাজের কথা বলো।'

'কেউ সে-রকম কিছু করলে রাশান ভাষায় এক্সকিউয মি বলেই কাশতে শুরু করবে। কাশতে কাশতে চোখে পানি এনে ফেলবে। হাত ধরে তোমাকে দূরে নিয়ে যাবো আমি। তোমার ব্যাপারে যে লোক আগ্রহ দেখাবে সে বুঝবে, যক্ষ্মা টাইপের কোনও অসুবিধা আছে তোমার।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'তা হলে এবার কোন্‌দিকে যাচ্ছি?'

'ওয়েস্ট-উইং। সিদোরভ যদি তার কালেকশনগুলো সেখানেই কোথাও রেখে থাক, আশা করছি, যা খুঁজছি পেয়ে যাবো। স্কেচটা আছে না তোমার কাছে?'

'আছে।'

'কোথায়?'

'তা-ও জানতে হবে?'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

'গাউনের ভিতরে, বুকের কাছে...নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?'

রানার ভ্রূ জোড়া কপালে উঠে গেল। 'স্কেচটার জীবন ধন্য হলো। ঠিক আছে, আপাতত ওখানেই থাক ওটা। চলো ইউটিলিটি রুমটার দিকে যাই। একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? এখানে কোনো সিকিউরিটি নেই। এমনকী কোনো ক্যামেরাও চোখে পড়ছে না। তুমি কোথাও কোনো ক্যামেরা দেখেছ?'

'না।'

আরেক দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে এগিয়ে আসছে রানা-সোহানার দিকে। ওদেরকে এড়ানোর জন্য তাড়াহুড়ো করে

ওয়েটারকে ডাকল সোহানা। লোকটার কাছে আসার পর ট্রে থেকে দুটো শ্যাম্পেন গ্লাস তুলে নিল, নিজে একটা রেখে আরেকটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। তারপর কাছে-আসা দম্পতিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে দূরের একজোড়া কপোত-কপোতীকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করল। অপমানিত বোধ করল দম্পতি, চেহারা কালো করে দূরে সরে গেল।

'রানা,' সরে-যাওয়া দম্পতিকে একনজর দেখে বলল সোহানা, 'একটা কথা ভেবে দেখেছ?'

'কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সন্দেহ নেই মারিয়া আর ওর স্বামী উপস্থিত আছে এখানে। আমরা ওদেরকে চিনি না। ওরাও আমাদেরকে চেনে না, কিন্তু আমাদের পরনের কাপড় চেনে। আমরা ওদের নজরে পড়ে গেলে কী হবে?'

'কী আর হবে?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কারও চোখে সে-রকম দৃষ্টি দেখলে যেভাবেই হোক কেটে পড়তে হবে আমাদেরকে। চলো, এগোই।'

অতিথিদেরকে পাশ কাটিয়ে পরের যে-ঘরে ঢুকল ওরা, মিরোস্লাভ তার নোটে সে-ঘরটার নাম দিয়েছে "সোর্ড রুম"। ঘরটা বেশ বড়, সত্তর ফুট বাই চল্লিশ ফুট হবে কমপক্ষে। চারদিকের দেয়ালে কালো রঙ-করা। মেঝেতে কালো স্লেট পাথর, একনজর তাকালেই বোঝা যায় অদক্ষ মিস্ত্রি দিয়ে কাটানো হয়েছে বলে সবগুলো সমান মাপের হয়নি। ঘরের ঠিক মাঝখানে আয়তাকার একটা কাঁচের বাক্স। ওটার ঠিক নীচে, মেঝেতে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে বসানো আছে দুটো স্পটলাইট। জ্বলছে লাইট দুটো, তাই আলোকিত হয়ে আছে বাক্সটা।

এত বড় বাক্স আগে কখনও দেখেনি রানা-সোহানা। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এ-রকম বাক্স, কিন্তু কোনোটাই

এটার মতো বড় না। পঞ্চান্ন ফুট বাই ত্রিশ, অনুমান করল রানা। ভিতরে শোভা পাচ্ছে কম করে হলেও পঞ্চাশটা অ্যান্টিক অস্ত্র। কুড়াল, তরবারি, বর্শা, খঞ্জর—কী নেই বাক্সটার ভিতরে? মার্বেলের বেঁটে ভিত্তির উপর ভর দিয়ে শুয়ে আছে সবগুলো, যেন বিশ্রাম নিচ্ছে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। প্রতিটা অস্ত্রের নীচে ছোট প্ল্যাকার্ড আছে। দর্শকরা যাতে কৌতূহল মেটাতে পারে সেজন্য রাশান আর ইংরেজিতে লেখা আছে সংশ্লিষ্ট অস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

আট-দশ জোড়া দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে বাক্সটা ঘিরে দাঁড়িয়ে কেমন ঘোর-লাগা দৃষ্টিতে ভিতরের অস্ত্রগুলো দেখছে। মাঝেমধ্যে মৃদু প্রশংসাধ্বনি উচ্চারণ করছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিল রানা-সোহানাও। ইশারায় সোহানাকে কথা বলতে নিষেধ করে দিল রানা।

অবসরে ইতিহাসের বই পড়া রানার একটা শখ। তাই বাক্সের

ভিতরের অনেকগুলো অস্ত্র একনজর দেখেই চিনতে পারছে। যেমন চওড়া ফলার স্কটিশ হাইল্যাণ্ডার তরবারি ক্লেইমর, যেটা দুই হাতে ধরে চালাতে হয়; দীর্ঘ হাতলবিশিষ্ট রাশান কুঠার বারডিক, চওড়া কিন্তু বাঁকানো ফরাসি তরবারি ফলচন যেটার উত্তলদিকটা ধারালো, পারস্য অঞ্চলের অশ্বারোহীদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত বাঁকানো ফলার ভারী তলোয়ার শামশের, হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা ওমানি খঞ্জর, সামুরাইদের বিশেষ পছন্দের হালকা তরবারি কাতানা, ক্লাসিক রোমান খাটো তলোয়ার গ্লাডিয়াস, বারো শ' পঞ্চাশ সাল থেকে পনেরো শ' সতেরো সাল পর্যন্ত মিশর শাসন-করা শ্বেতাঙ্গ সেনাদাসদের উদ্ভাবিত তরবারি মেমলুক, তুর্কি তলোয়ার ইয়াতাঘান এবং ছুঁড়ে মারার উপযোগী ভাইকিং কুড়াল মামেন।

হাতলে রুবি পাথর-বসানো মরক্কোর বিশেষ একজাতের

তরবারিও দেখতে পাচ্ছে রানা, কিন্তু ওটার নাম মনে করতে পারছে না।

'ঠিক মানায় না, তা-ই না?' রানাকে খানিকটা চমকে দিয়ে ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বলল সোহানা।

ভ্রূ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কী মানায় না?'

'এত ভয়ঙ্কর একটা খুনি, অথচ তার সংগ্রহশালায় আদ্যিকালের সব অস্ত্র। বরং যত লোককে সে খুন করেছে, তাদের খুলি সাজিয়ে রাখলে মানাত বেশি।'

কোনো মন্তব্য না করে ধীর গতিতে হাঁটা ধরল রানা, বাক্সটার শেষমাথায় গিয়ে দাঁড়াতে চায়। ওখানে চকচকে একটা খোপেশ, মানে প্রাচীন মিশরীয় কাস্তে দেখা যাচ্ছে; ওটা আরও কাছ থেকে দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু চার-পাঁচ কদম এগিয়ে হাঁটার গতি আরও ধীর করতে হলো ওকে। কারণ উপস্থিত দম্পতিরা সবাই কী নিয়ে যেন গুঞ্জন তুলেছে একসঙ্গে। আড়চোখে দেখল, ও আর সোহানা বাদে বাকিরা সরে দাঁড়াচ্ছে একপাশে কারণ কেউ একজন ঢুকছে ঘরের ভিতরে।

'সিদোরভ,' রানার কানের কাছে আবারও ফিসফিস করে উঠল সোহানা, 'বাজি ধরে বলতে পারি।'

দশ

'গুড ইভনিং, লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন,' আইভান সিদোরভের গলা ভরাট কিন্তু আকর্ষণীয়, 'আপনাদের দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে আমার

কালেকশন দেখে মুগ্ধ হয়েছেন আপনারা।'

লোকটা ঘরে ঢোকার আগেই তাড়াহুড়ো করে সোহানাকে নিয়ে দম্পতিদের ভিড়ে সরে এসেছে রানা। এখন দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজনের পিছনে। ওর সামনের লোকগুলো ওর চেয়ে কয়েক ইঞ্চি খাটো, তাই সিদোরভকে দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না।

কিছু কিছু লোককে দেখলে মনে হয় শুধু নেতা হওয়ার জন্যই পৃথিবীতে এসেছে তারা, সিদোরভ তাদের একজন। ওর চেহারা সেনাবাহিনীর জেনারেলদের মতো। চুল পাতলা হয়ে এসেছে, কিন্তু সুন্দর করে ছাঁটিয়ে এমন পরিপাটি করে রেখেছে যে, কেউ বলবে না সে টেকো। কলপ ব্যবহার করে, কিন্তু চেহারাটা ভারিক্কি করে তোলার জন্য ইচ্ছা করেই সব পাকা চুল কালো করেনি। কাঁচাপাকা চুল আসলেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে ওকে। চওড়া ভাঁজহীন কপালে ধনুকের মতো বাঁকানো মোটা ভ্রূ জোড়া বাড়িয়েছে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা—সব দম্পতির দিকেই তাকাচ্ছে সে, কিন্তু কাউকেই সেভাবে খেয়াল করছে না, অথচ মনে হচ্ছে আপাদমস্তক জরিপ করছে সবাইকে। চোখে না আছে সাপের চোখের শীতলতা, না আছে হায়েনার চোখের ধূর্ততা, না আছে বাঘের চোখের হিংস্রতা। কিন্তু এমন একটা কিছু আছে যা দেখলে, যে বা যারা ওকে চেনে তাদের মেরুরজ্জু বেয়ে শীতল স্রোত নীচে নামতে বাধ্য। কৌতুকের ঝিলিক কখনও কখনও খেলা করছে সে-চোখে, কিন্তু তা কয়েক মুহূর্তের জন্য মাত্র। নাক, গড়পড়তা রাশানদের মতো, লম্বা আর চওড়া না, বরং তীক্ষ্ণ; দেখে কেন যেন ফেন্সিং সোর্ডের কথা মনে পড়ল রানার। চেহারা ক্লিনশেভ্ড; এত বেশি যে, মনে হচ্ছে এই কিছুক্ষণ আগে দাড়ি কামিয়েছে। শেভ করার সময় বয়সের ছাপটাকেও চেঁছে ফেলেছে সম্ভবত, আনুমানিক বয়সের চেয়ে দশ-পনেরো বছর কম দেখাচ্ছে ওকে। উচ্চতায় রানার কাছাকাছি, কাঁধে কাঁধ মেলালে

এক-দেড় ইঞ্চি বেশিও হতে পারে। যখন খোশমেজাজে থাকে তখন প্রতিটা বাক্যের শেষে একটুখানি হাসে, ফলে সোনা-দিয়ে-বাঁধানো একটা দাঁত দেখা যায়। এই হাসি সিদোরভের মুদ্রাদোষ, দাঁতটা কয়েকবার ঝিলিক দিয়ে ওঠায় ভাবল রানা।

ওর পরনের ইভনিং স্যুটটা বড় বেশি চকচকে, হতে পারে আজ রাতের অনুষ্ঠানের জন্য অর্ডার দিয়ে বানিয়েছে। কিন্তু কেউ বলতে পারবে না তাতে বেমানান লাগছে ওকে। বরং মনে হচ্ছে ওই পোশাক শুধু ওর গায়েই মানায়। একপশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার আগে আকাশের এককোণে যেমন একটুখানি মেঘ জমে, ওর গায়েও তেমন সামান্য মেদ জমেছে। কিন্তু যথেষ্ট উচ্চতার কারণে ওই মেদকে বেকসুর খালাস দেয়া যেতে পারে। সাদা সিল্কের পাতলা শার্ট নীরবে বলে দিচ্ছে লোকটার বুক লোমশ। এবং তার বলিষ্ঠ অবয়ব জানান দিচ্ছে এই বয়সেও যথেষ্ট শক্তি রাখে সে।

ধনকুবের শিল্পপতিদের মতো দু'হাত পকেটে ঢুকিয়ে না, আবার আত্ম-অহঙ্কারে বেসামাল অ্যান্টিক-কালেক্টরদের মতো দু'হাত বুকের উপর ভাঁজ করেও না, "আরামে দাঁড়াও" আদেশ করলে সৈন্যরা যেভাবে দাঁড়ায় সেভাবে দাঁড়িয়ে আছে সিদোরভ। তবে খানিকটা বাঁকা হয়ে, যেন অধীনস্থদের পরবর্তী কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছেন জেনারেল কুচকাওয়াজের পর।

'দখল করতে চাওয়া আর দখল করতে দিতে না চাওয়া,' বলছে সিদোরভ, 'এই হলো যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কারণ। আর যেহেতু আমি একজন যোদ্ধা এবং আরও বড় কথা বিজয়ী, অস্ত্রের কদর আমার চেয়ে বেশি আছে আর কার কাছে? লেডিস অ্যাণ্ড জেণ্টেলমেন, আমার সংগ্রহশালায় শুধু বহু পুরনো জিনিসকেই ঠাঁই দিইনি, বরং বৈচিত্র্যময়তাকেও স্থান করে নেয়ার সুযোগ দিয়েছি। কারণ আমি দেখাতে চেয়েছি যুদ্ধের ধারণা, যুদ্ধের ইচ্ছা, যুদ্ধের ফলাফল জেনেটিকালি বহন করে মানুষ। মারার জন্য অথবা

প্রতিহত করে টিকে থাকার জন্য যুগ যুগ ধরে লড়াই করে যাচ্ছে তারা, এবং করতে থাকবে। পাশবিকতাকে তারা কখনও অস্বীকার করতে পারবে না, কখনও ছাড়তেও পারবে না। প্রাচীন রোম বলুন বা আধুনিক তুরস্ক, সামুরাইদের তলোয়ার বলুন বা ভাইকিংদের কুড়াল—সবকিছুই আমার বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায়।' হঠাৎ থামল, কেউ তার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করে কি না জানার জন্য দেখছে আশপাশের লোকগুলোকে। না, কেউ কোনো বিরূপ মন্তব্য করল না। নিজের উপরই সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল সিদোরভ, হাঁটতে শুরু করল আবার।

রানা-সোহানাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সময় দেখা গেল, সিদোরভের চুল পাতলা হওয়ার ব্যাপারটা আসলে ওর মাথার সামনের দিকে। পেছনের দিকে যথেষ্ট চুল আছে, ঝুঁটি করে পনিটেইল বানিয়ে রেখেছে। মোটামুটি সুপুরুষ বলা যায় তাকে। অতিথিদের কারও দিকেই তেমনভাবে তাকাচ্ছে না সে, যদিও যখন চোখ তুলছে তখন আশ্চর্য এক দ্যুতি দেখা যাচ্ছে ওর দৃষ্টিতে। ওকে দেখে অতিথিদের কার কী অবস্থা তা-ও দেখে নিল রানা একপলক। পুরুষদের কারও দৃষ্টিতে বিষণ্নতা, কারও দৃষ্টিতে নগ্ন ঈর্ষা। আর নারী অতিথিরা সবাই কৌতূহলী। বাকি জীবনটা সিদোরভের সঙ্গে কাটানোর কোনো উপায় আছে কি না, দু'-একজন সে-চিন্তাও করছে হয়তো। তবে সিদোরভের সামনে দাঁড়িয়ে থাকছে না কেউ। সে যেদিকে যাচ্ছে, সরে গিয়ে পথ করে দিচ্ছে তাকে।

'এই যে দেখুন,' কাঁচবাক্সের সামনে, বিশেষ একটা খঞ্জরের কাছে এসে থেমে দাঁড়াল সিদোরভ, আনমনে টোকা দিচ্ছে কাঁচে, 'এই খঞ্জরটাকে দেখুন। ঐতিহ্যবাহী একটা অস্ত্র। মালয়েশিয়ার প্রত্যন্ত এক জনপদ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। ওখানকার এককালের রাজার ব্যক্তিগত জিনিস ছিল। ফলাটা দেখেছেন,

ঢেউয়ের মতো আঁকাবাঁকা? শুধু রাজার জন্যই বানানো হয়েছিল এই জিনিস। তা না হলে এ-রকম খঞ্জর অন্য কোথাও-না-কোথাও পাওয়া যেতই। অনেক খুঁজেছি আমি, কিন্তু পাইনি। আর কারিগরের হাতের কাজ দেখুন। প্রতিটা খাঁজের সূক্ষ্ম মাপ করিয়েছি আমি একাধিক বিশেষজ্ঞ দিয়ে। কেউ বলেনি একদিকের খাঁজের সঙ্গে অন্যদিকের খাঁজের একচুল বেশ-কম আছে।'

'কিন্তু...' বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত সাহস করে বলেই ফেলল জনৈক পুরুষ অতিথি, 'এই খঞ্জর কার কী কাজে লাগবে? আঁকাবাঁকা ফলার জন্য তো...'

'জানি,' হাত নেড়ে লোকটাকে থামিয়ে দিল সিদোরভ। 'জিনিসটা আসলে কাজের জন্য না, বরং বংশমর্যাদা বা প্রভুত্বের প্রতীক হিসেবে বানানো হয়েছিল। ওটার পাশে-রাখা চাইনিয দা-টা দেখুন। মনে হয় না একেবারে সাধারণ? কিন্তু বিশেষ একটা অসাধারণত্ব আছে অস্ত্রটার। ওটাও রাজার জিনিস, কিন্তু বংশমর্যাদার প্রতীক নয়। শুনেছি ওটা দিয়ে নাকি নিজের হাতে কয়েক'শ' লোকের জান কবজ করেছেন সেই রাজা। রক্তের দাগ কখনও ভালোমতো মুছতেন না তিনি দা'র ফলা থেকে। লেগে-থাকা রক্ত তাঁর রক্তপিপাসা আরও বাড়িয়ে দিত।' বলতে বলতে দর্শকদের মনোযোগ আরেকটা অস্ত্রের দিকে নিয়ে গেল। ওটার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলতে শুরু করল।

একটা করে "নতুন" অস্ত্রের কাছে যাচ্ছে সিদোরভ, নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করছে, আর একটু একটু করে ওর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে রানা-সোহানা। সে যে-দরজা দিয়ে ঢুকেছে সে-দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা একসময়। পাশে সোহানা। দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ার আগে আরেকবার সিদোরভের দিকে তাকাল রানা।

ওদের দিকে উল্টো ঘুরে আছে লোকটা। সমস্ত মনোযোগ সামনের কাঁচবাক্সের কোনো একটা অস্ত্রের উপর। ওর চেহারার প্রতিবিম্ব পড়েছে কাঁচের গায়ে। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে বিশেষ সেই অস্ত্রটার জন্য গর্ব বোধ করছে সে। ওর আশপাশে বিক্ষিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে দম্পতিরা, রানা-সোহানার দিকে মনোযোগ নেই কারোরই।

ঘুরল রানা, সোহানার উদ্দেশ্যে ছোট করে নড করে ঢুকে পড়ল দরজাটা দিয়ে। ওর পিছু নিল সোহানা।

সিদোরভের ম্যানসনটা আসলেই বিশাল; মিরোস্লাভের স্কেচ আর নোট না থাকলে কোন্‌দিকে যাচ্ছে অথবা কোন্ ঘর কোথায় আছে ঠাহর করা অসম্ভব হয়ে যেত রানা-সোহানার জন্য। পার্লার, ডেন, বেশ বড় একটা লাইব্রেরি আর কয়েকটা সিটিং রুমের ভেতরে গোলকধাঁধার চক্কর দিয়ে শেষপর্যন্ত প্রায়-অন্ধকার একটা কনযারভেটরিতে হাজির হলো দু'জনে।

এখানে টবে হরেক জাতের গাছ লাগানো হয়েছে। অন্ধকারের কারণে শুধু চেনা গেল একজাতের বেঁটে নিঃসঙ্গ তালগাছকে। কয়েকটা গাছের লতানো ফুল জড়াজড়ি করে দেয়াল বেয়ে উঠে গেছে ছাদের দিকে। ছাদটা ঢালাই-করা সিমেন্টের না, পুরু কাঁচের। উপরে তাকালে চোখে পড়ে কালো আকাশের পটভূমিতে লক্ষ তারার ঝিকিমিকি। হাতের বাঁ দিকে, মেঝে থেকে কাঁচের ছাদ পর্যন্ত, ঝোপঝাড়বেষ্টিত লম্বা পোর্চ।

এখান দিয়ে বের হলে ম্যানসনের উত্তর-পশ্চিমদিকের দেয়াল, তাতে একটামাত্র দরজা। কনযারভেটরি দিয়ে বের হলো দু'জনে, তারপর ঢুকল, পরে আবার বের হলো। আসলে নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে কোথাও গোপন ক্যামেরা আছে কি না। কেউ ওদেরকে ফলো করছে কি না তা-ও জানা দরকার। কিন্তু ক্যামেরার সন্ধান পাওয়া গেল না, কোনো অনুসরণকারীর অস্তিত্ব সম্পর্কেও নিশ্চিত

হওয়া গেল না।

রানার মনের ভিতরে খুঁতখুঁত করতে লাগল। তারপরও, আশপাশে কেউ নেই সে-ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে সোহানাকে নিয়ে এগিয়ে গেল ওই দরজার সামনে। কাছে গিয়ে বোঝা গেল ওটা লক্‌ড।

কাজের কিছু পাওয়া যায় কি না সে-আশায় পকেট হাতড়াতে শুরু করল রানা। পেছন থেকে ভেসে এল ভারী একটা কণ্ঠ, 'এক্সকিউয মি, স্যর, আমি কি জানতে পারি আপনারা এখানে কী করছেন?'

চমকে উঠল রানা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্স অ্যাকশন দেখাল। জুতোর সোলের উপর ভর দিয়ে ঘুরে মুখোমুখি হলো অচেনা লোকটার। একনজর দেখেই বুঝল সিকিউরিটি। ক্ষোভ প্রকাশের ঢং-এ মেকি রাশান টানে ইংরেজিতে বলল, 'শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল! এতক্ষণ ছিলে কোথায়? ভিতরে যে হিউমিডিটি কন্ট্রোল সিস্টেম কাজ করছে না সে-খবর রাখো?'

'জী?' চোয়াল ঝুলে পড়েছে সিকিউরিটি গার্ডের। 'বুঝতে...'

'পারলে না, তা-ই তো? মিস্টার সিদোরভ আমাদেরকে বললেন সোজা এখানে চলে আসতে, তোমাদের কারও-না-কারও সঙ্গে দেখা হবেই। কিন্তু কীসের কী? পাঁচ মিনিট হলো দাঁড়িয়ে আছি, কারও পাত্তা নেই। বলি, ডিউটি বাদ দিয়ে কোথায় যাও তোমরা? কথাটা জানাতে হবে মিস্টার সিদোরভকে।'

'স্যর, স্যর, ও-রকম কিছু করবেন না দয়া করে,' ভয়ে কেঁচো হয়ে গেছে সিকিউরিটি গার্ড, 'আমি এখনই খবর নিচ্ছি।' বলতে বলতে হাত বাড়িয়ে কোমরে-ঝোলানো রেডিয়ো বের করল।

'খবর নেয়ার আগে তোমার কর্তব্যে-গাফিলতির কারণে কী হয়েছে দেখো একবার,' লোকটার দিকে দু'কদম আগে বাড়ল রানা। 'কনযারভেটরির ভিতরে একটা তালগাছ দেখতে পাচ্ছ

না? ওটার উপরের দিকে কয়েকটা পাতা ছড়িয়ে আছে, দেখা যায়?'

রেডিয়ো চালু করতে গিয়েও করল না গার্ড, রানা যেদিকে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকাল। ততক্ষণে লোকটার আরও কাছে চলে গেছে রানা। একমুহূর্ত সময় নষ্ট করল না ও। ডানহাত মুঠো পাকিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঘুষি মারল লোকটার নাকের উপর। একইসঙ্গে বাঁ পায়ে লাথি মেরেছে লোকটার বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর।

গার্ডের হাত থেকে রেডিয়োটা আলগা হয়ে গেছে আপনা থেকে। চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু মাটিতে সজোরে আছড়ে পড়ার কারণে তা শূকরের ঘোঁৎ জাতীয় আওয়াজে পরিণত হলো। কোনো দয়া দেখাল না রানা, লোকটা ভূপাতিত হওয়ামাত্র ডান পায়ে ফুটবলের কিক মারল ওর বাঁ পাঁজরে। ঘোঁৎ শব্দ হলো আবারও। পরের লাথিটা মারল রানা লোকটার বাঁ কানের একটু উপরে, জুতোর ডগা দিয়ে, প্রচণ্ড জোরে। এবার কোনো আওয়াজ নেই। কারণ জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা।

ওর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। লোকটার কোমরে-আটকানো রেডিয়োটা খুলে নিল প্রথমে। ওর শরীরের কোথাও কোনো অস্ত্র আছে কি না জানার জন্য তল্লাশি করল তারপর, দ্রুত এবং অভ্যস্ত হাতে। হিপ প্যাডল হোলস্টারে পাওয়া গেল একটা নাইন মিলিমিটার ল্যুগার, সঙ্গে দুটো এক্সট্রা ম্যাগাজিন। আরও পাওয়া গেল এক জোড়া হ্যাণ্ডকাফ, একটা হোটেল-স্টাইল কার্ড-কী এবং একটা কী-রিং।

চাবির ছড়াটা সোহানার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। ওটা লুফে নিল সোহানা, বিনা বাক্য ব্যয়ে এগিয়ে গেল বন্ধ দরজাটার দিকে, কাজ শুরু করে দিল।

গার্ডকে ঠেলে উপুড় করল রানা। হ্যাণ্ডকাফ দিয়ে পিছমোড়া

করে আটকাল লোকটার দু'হাত। ওর গলা থেকে টাই খুলে গুঁজে দিল মুখের ভিতরে। এবার সর্বশক্তিতে চেঁচালেও বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না লোকটা। শার্টের কলার ধরে অচেতন দেহটাকে টানতে টানতে নিয়ে এল এক কোণে। বেঁটে তালগাছের কতগুলো টব এনে রাখল লোকটার সামনে। অচেতন লোকটাকে কেউ যদি খুঁজে বের করতে চায়, কষ্ট করতে হবে তাকে।

'খুলে গেছে,' মৃদু গলায় জানান দিল সোহানা।

'দরজাটা চেক করেছ?' সতর্ক গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'হুঁ। কোনো অ্যালার্ম তার নেই।'

'পাঁচ সেকেণ্ডের মধ্যেই নিশ্চিত হওয়া যাবে,' বলতে বলতে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল রানা, ডান হাতে কার্ড-কী।

দরজাটা একইসঙ্গে সাধারণ এবং অসাধারণ। সাধারণ, কারণ, মামুলি ধাতব চাবি দিয়ে ওটার একটা লক খোলা যায়। আর অসাধারণ ব্যাপারটা হলো, দরজার বিশেষ এক জায়গায় বসানো আছে শক্তিশালী চুম্বক, ওদিকের পাল্লাটা পুরোপুরি চৌম্বকীয় পদার্থে তৈরি। এই চৌম্বকীয় আবেশ দূর করতে হলে দরকার কার্ড-কী। ওটা জায়গামতো প্রবেশ করানোমাত্র ব্যাহত হবে বিদ্যুৎপ্রবাহ, ফলে পাল্লা থেকে আলগা হবে দরজা।

কার্ড কী-টা জায়গামতো ঢুকিয়ে পাঁচ সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা। কিছুই ঘটল না। তারপর সাবধানে মোচড় দিল হাতল ধরে।

নীরবতা। কানফাটানো শব্দে অ্যালার্ম বাজছে না কোথাও।

'রানা, অন্য কোথাও সাইলেণ্ট অ্যালার্ম থাকতে পারে,' চাপা গলায় সতর্ক করল সোহানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল রানা। কার্ড কী-টা জায়গামতো রেখে টান মারল সোহানার একটা হাত ধরে। দৌড়ে চলে এল টবগুলোর আড়ালে, অচেতন গার্ডকে যেখানে শুইয়ে রেখেছে।

লোকটার পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ল দু'জনে।

এক মিনিট কাটল। তারপর দুই। ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। লাউডস্পীকারেও ঘোষিত হচ্ছে না কোনো বিপদবার্তা।

'সবকিছু বেশি সহজ হয়ে যাচ্ছে না?' রানার কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল সোহানা।

'হুঁ,' স্বীকার করে নিল রানা। 'সবকিছু যখন বেশি সহজ মনে হয়, বিপদ তখনই ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়ের উপর। আমার অভিজ্ঞতা তা-ই বলে। কিন্তু এখন পিছু ফেরার উপায় নেই আমাদের। ফিরতে চাই-ও না।' সোহানার দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না চেহারাটা। 'নাকি চাও?'

'আমি?' দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল সোহানা। 'তুমি সঙ্গে থাকলে দরকার হলে নরকেও অ্যাডভেঞ্চারে যেতে রাজি আছি। কারণ, নিজেকে বাঁচানোর কোনো-না-কোনো উপায় বের করে ফেলবে, আমাকেও মরতে দেবে না। এ-জন্যেই তুমি মাসুদ রানা।'

হেসে কান পাতল রানা।

রাতটা নিস্তব্ধ, কিন্তু নিঃশব্দ না। চারদিকের বাতাস স্থির হয়ে আছে। আশপাশের নাম-না-জানা শত প্রজাতির গাছের পাতা নড়ছে না বলা যায়। অনেক দূর থেকে, দূরত্বটা অনুমান করা যায় না ঠিক, ভেসে আসছে সিদোরভের অতিথিদের হই-হুল্লোড়ের আওয়াজ। এখানে, একটা-দুটো ঝোপের আড়ালে, দু'-চারটে জোনাকি পোকা জ্বলে উঠেই হারিয়ে যাচ্ছে। ঝিঁঝি ডাকছে, কিন্তু তা-ও একটানা না। বার বার এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে রানা, কোনো ছায়ামূর্তি চোখে পড়ছে না। অন্ধকারে দিক বদল করে চট করে সরে পড়ছে না কেউ। ধরে নেয়া যায় এই জায়গায় রানা-সোহানা আর অচেতন গার্ডটা ছাড়া কেউ নেই।

সোহানার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল রানা, সতর্ক পায়ে এগিয়ে

যাচ্ছে দরজাটার দিকে। হাতল ধরে মোচড় দিল আবার। সোহানাকে আড়াল করে দরজা জুড়ে দাঁড়াল নিজে।

সামনে দশ ফুট লম্বা একটা করিডোর। দু'ধারে ধবধবে সাদা রঙ-করা দেয়াল। মাথার উপরের কুলুঙ্গিতে জ্বলছে প্রায়-লুকানো ফ্লুরোসেন্ট বাতি। তাতে আলোকিত হয়ে আছে করিডোরটা। ওটার শেষমাথায় আরেকটা দরজা, একনজর দেখলেই বোঝা যায় ভারী স্টিল দিয়ে বানানো। ওই দরজায় কোনো চাবি নেই। দেয়ালের একদিকে বসানো আছে কার্ড-রিডার, নির্দিষ্ট কার্ড সেখানে পাঞ্চ করলে খুলে যাবে।

'বুদ্ধি খারাপ না,' চাপা গলায় মন্তব্য করল রানা।

'কেন?' বুঝতে না পেরে জানতে চাইল সোহানা।

'দরজার পাশে কার্ড-রিডার বসিয়েছে ঠিকই, কিন্তু ওটা আসলে শুধু কার্ড-কী দিয়ে খোলে না।'

'বুঝলে কীভাবে?'

'কার্ড-রিডারের উপরে কোয়ার্টার সাইযের একটা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ?'

দেখল সোহানা। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

'ওটা কী বলে মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পরিচিত মনে হচ্ছে...কিন্তু...'

'বায়োমেট্রিক থাম্বপ্রিন্ট স্ক্যানার,' বলে দিল রানা।

'তার মানে...'

'হ্যাঁ, তুমি যা ভাবছ তা-ই। একটু অপেক্ষা করো। অজ্ঞান গার্ডটাকে নিয়ে আসছি আমি।'

মিনিট দু'-এক পর অচেতন গার্ডটাকে কাঁধে করে করিডোরে ঢুকল রানা। এগিয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয় দরজাটার দিকে, পেছন পেছন সোহানা।

'আমার মনে হয় সিকিউরিটি সিস্টেমটা এ-রকম,' হাঁটতে

হাঁটতে বলছে রানা, 'কার্ড কী-টা ঢোকাতে হবে কার্ড রিডারে, একইসঙ্গে এই ব্যাটার বুড়ো আঙুল ঠেসে ধরতে হবে স্ক্যানারের স্ক্রিনে। আমি কার্ড রিডারের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো, জায়গা ছেড়ে দেবো তোমার জন্য। তুমি একহাতে কার্ডটা নেবে, আরেক হাতে ধরবে এই ব্যাটার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল। তারপর একইসঙ্গে কার্ডটা ঢোকাবে আর আঙুল ঠেসে ধরবে স্ক্রিনে।'

'কিন্তু রানা, এ-রকম কি হতে পারে না, স্ক্যানারটা ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুলকে চেনে?'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল রানা। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

'এই ব্যাটার রেডিয়ো ঝোলানো ছিল কোমরের ডানদিকে,' বলছে সোহানা, 'ওটা বের করার জন্য ডান হাত বাড়িয়েছিল সে। তোমার সঙ্গে যখন মারামারি করছিল তখন বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে শরীর বাঁকা করেছিল, দেখেছি আমি। সবকিছু ইঙ্গিত করে, সে ডানহাতি। এখন একজন ডানহাতি লোক, একটা বায়োমেট্রিক থাম্বপ্রিন্ট স্ক্যানারকে নিজের বাঁ হাতের ছাপ চেনাবে না, অন্তত সে-রকম করার কথা নয়। তা ছাড়া স্ক্যানারটাকে দেখো ভালোমতো। ওটা এত বড় না যে, একসঙ্গে পাঁচ আঙুলের ছাপ নিতে এবং পড়তে পারবে। আবার বুড়ো আঙুল ছাড়া অন্য কোনো আঙুলের ছাপ পড়ার মতোও লম্বা না। তাই সবকিছু মিলিয়ে আমার মনে হচ্ছে, ওই স্ক্যানার এই লোকের ডান হাতের বুড়ো আঙুলটাকে চেনে।'

'না,' সিদ্ধান্তহীনতার ছাপ বিদায় নিয়েছে রানার চেহারা থেকে, 'নিজেকে দিয়ে ভাবো। কার্ড রিডারের সামনে দাঁড়িয়ে আছো তুমি। ওটা তোমার ডান দিকে। এখন রিডারে বাঁ হাত দিয়ে কার্ড ঢুকিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল স্ক্যানারের স্ক্রিনে চেপে ধরাটা কি একজন ডানহাতির জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যায় না? তার চেয়ে ডান হাতে কার্ড-কী ঢুকিয়ে বাঁ হাতটা স্ক্যানারে

রাখাটাই কি সুবিধাজনক না?'

খানিকক্ষণ ভেবে সোহানা বুঝতে পারল ঠিক বলেছে রানা। মাথা ঝাঁকাল ও।

কার্ড রিডারের ঠিক পাশেই অচেতন গার্ডকে নামাল রানা, ধরে রাখল শক্ত করে। সোহানার হাতে কার্ড-কী। গার্ডটাকে এমনভাবে ধরেছে রানা যেন কোলাকুলি করছে। লোকটার দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলটাকে সুবিধামতো কাজে লাগাতে পারবে সোহানা।

'দুটো কাজ কি একসঙ্গে করতে হবে?' জানতে চাইল সোহানা।

এক মুহূর্ত ভাবল রানা। তারপর বলল, 'না। কার্ডটা পাঞ্চ করো আগে। তারপর আঙুল।'

'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

রানার বলে-দেয়া উপায়ে কাজ করল সোহানা। প্রথমে মৃদু একটা টুং শব্দ শোনা গেল কার্ড রিডার থেকে, তারপর থাম্বপ্রিন্ট স্ক্যানার থেকে মিষ্টি একটা নারীকণ্ঠ বলে উঠল, "ওয়েলকাম।" হালকা "ক্লিক" শব্দ শোনা গেল স্টীলের দরজা থেকে, চোখে না দেখলেও বোঝা গেল পাল্লা থেকে দরজাটা আলগা হয়ে গেছে একটুখানি। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ পায়ের জুতোর ডগা একটুখানি ঢুকিয়ে দিল রানা ফাঁকা জায়গা দিয়ে, যাতে অটোমেটিক কোনো কারসাজিতে বন্ধ হয়ে না যায় ওটা। 'সোহানা,' ফিসফিস করে ডাকল, 'এদিকে এসো। ধরে রাখো দরজাটা। আমি এই ব্যাটাকে আগের জায়গায় রেখে ফিরে আসছি।'

ঠিক দু'মিনিট পর ফিরে এল রানা। 'কিছু দেখলে?' জিজ্ঞেস করল সোহানাকে।

মাথা নেড়ে দরজাটা ঠেলে এক ইঞ্চি ফাঁক করল সোহানা। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য চোখ রাখল ফাঁকা জায়গাটায়। তারপর

দরজাটা ধরে রেখে রানার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'যতদূর দেখেছি, কোনো ক্যামেরা নেই।'

'তা হলে চলো ঢুকে পড়ি,' আগে বাড়ল রানা, ঠেলে দরজাটা খুলল আরেকটু।

ওরা দু'জনে ঢুকল ভিতরে।

ঘরটা অনেকটা বৃত্তাকার। দেয়ালগুলোতে ধূসর রঙ করা। নেভি ব্লু কার্পেট বিছানো আছে মেঝেতে। মাটির পাত্রের মতো কতগুলো বাল্বহোল্ডার ঝুলছে ছাদ থেকে, সেগুলোতে জ্বলছে একাধিক বাল্ব। অনেকগুলো আলোর বৃত্ত তৈরি হয়েছে কার্পেটের উপর। খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর আরও দুটো দরজা। ডানদিকে একটা, বাঁয়ে আরেকটা।

বাঁ দিকের দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। সোহানা গেল ডানদিকেরটার দিকে। কোথাও কোনো গোপন তার, ক্যামেরা বা ওই জাতীয় কিছু আছে কি না খুঁজছে। কিন্তু সে-রকম কোনো কিছু নজরে পড়ল না।

ভাগ্য ভালো, এই দুই দরজার কোনোটাতেই থাম্বপ্রিন্ট স্ক্যানার নেই। চাবির যে-গোছাটা পাওয়া গেছে গার্ডের কাছ থেকে, সেটা কাজে লাগিয়ে একে একে দুটো দরজাই খুলল রানা।

প্রথমে খুলল বাঁ দিকেরটা। কার্পেট-বিছানো কয়েক ধাপ সিঁড়ি নেমে গেছে নীচের দিকে, পনেরো ফুটের মতো যাওয়ার পর বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। এখানে মাথার উপর জ্বলছে অনুজ্জ্বল বেসবোর্ড লাইট, করিডোরটা তাই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

মাথা নেড়ে সরে এল রানা দরজাটার কাছ থেকে, এগিয়ে গেল ডানদিকেরটার দিকে। একটুখানি খুলে উঁকি দিল ভিতরে, সঙ্গে সোহানা। কিছুক্ষণ দেখার পর রানার কানের কাছে ফিসফিস করল সোহানা, 'দেখে তো চোরাকুঠুরি বলে মনে হচ্ছে আমার। জায়গাও বেশি নেই ভিতরে, মাত্র দশ ফুট বাই দশ ফুট।

শেষপ্রান্তে আরও একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। কোনো লক নেই, কিন্তু হুড়কো আছে।'

রানাও দেখছে ভিতরের ঘরটাকে। ডানদিকের দেয়ালের অর্ধেকটা জুড়ে পুরু কাঁচ বসানো, কোমর থেকে শুরু করে একেবারে ছাদ পর্যন্ত। আসলে ইট-সিমেন্টের বদলে মোটা কাঁচ দিয়ে দেয়াল বানানো হয়েছে। ভিতরে দুটো কম্পিউটার আর রেডিয়ো কন্ট্রোল সিস্টেম দেখা যাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে ওটা একটা ওয়ার্কস্টেশন। ভিতরে কোনো বাতি জ্বলছে না, তবে কম্পিউটারের স্ক্রিন দুটো চালু আছে বলে মৃদু আলো এসে বাড়ি খাচ্ছে কাঁচে।

দরজার কাছে মেঝের উপর শুয়ে পড়ল রানা। দু'হাতে ভর দিয়ে শরীরটাকে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরের দিকে। মাথাটা সামনের দিকে আছে বলে ওটাই দরজা দিয়ে আগে ঢুকল। কিন্তু খানিকটা যাওয়ার পরই থেমে গেল রানা, যতটুকু এসেছে তাতেই কাজ চলবে। এখন যে-পজিশনে আছে ও, ডানে-বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে রুমের প্রায় সবকিছু দেখতে পাচ্ছে।

আসলে দেয়াল বা ছাদে বসানো ক্যামেরা খুঁজছে রানা, চায় না ওদের ভিতরে ঢোকার প্রমাণ রেকর্ড হয়ে যাক কোনো হার্ডডিস্কে। ক্যামেরাটা চোখে পড়তে বেশি সময় লাগল না ওর। হাতের ডানদিকে, কাঁচদেয়ালের শেষপ্রান্তে, ছাদের কাছাকাছি বসানো আছে। অনুজ্জ্বল একটা সবুজ আলো জ্বলছে আর নিভছে একটু পর পর।

রানার পাশে বসে পড়েছে সোহানাও, দরজায় পিঠ ঠেকিয়েছে আলতো করে। 'ক্যামেরার সন্ধান পাওয়া গেল?' আগেরমতোই ফিসফিস করে জানতে চাইল রানার কাছে।

'হুঁ।'

'একজায়গায় ফিক্সড? নাকি রোটেট করছে?'

বাঁ হাতটা বের করে দুটো আঙুল দেখাল রানা। তারমানে সোহানার দ্বিতীয় প্রশ্নটার জবাব হ্যাঁ-বাচক।

'অর্থাৎ আমাদের অবস্থা সুবিধার নয়,' আবারও ফিসফিস করল সোহানা।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। 'আমার মনে হয় উল্টোটা।'

ভ্রূ কুঁচকাল সোহানা। 'কীভাবে?'

'একটামাত্র ক্যামেরার উপর নির্ভর করছে ওরা। পাহারার কাজে কেউ নেই। এই রুমের ভিতরে ঢুকতে হলে কৌশল খাটাতে হবে আমাদেরকে। আশা করছি কারও কাছ থেকে বাধা পাবো না। ক্যামেরাটা এক পাক খেতে কত সময় নেয় হিসেব করেছি—চার সেকেণ্ড। সময়টা খুব অল্প।'

'তা হলে?'

'তা হলে বাঁ দিকের রুমটা দেখতে হচ্ছে আগে। তোমার আপত্তি আছে?'

মাথা নাড়ল সোহানা।

'চলো তা হলে।'

বাঁ দিকের রুমটার দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ওরা। যত নামছে, ছাদ যেন তত নিচু হচ্ছে; কুঁজো হয়ে হাঁটতে হচ্ছে দু'জনকেই। এখানে কোথাও কোনো ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না। এগিয়ে চলল ওরা।

ত্রিশ ধাপ নামার পর সামনে দেখা গেল ওক কাঠের একটা দরজা। তাতে পুরু সোনার পাতে রাশান ভাষায় খোদাই করে লেখা আছে:

ব্যক্তিগত। দূরে থাকুন।

দরজার হাতলটাও সোনার। নিঃশব্দে পাল্লা ঘেঁষে দাঁড়াল রানা, হাতলটা ধরে এমনভাবে ঘুরাল যাতে কোনো আওয়াজ না

হয়।

তালা মারা নেই দরজাটায়। নিঃশব্দে খুলে গেল ওটা। মাথা গলাবার মতো ফাঁক তৈরি করে উঁকি দিল রানা। ওর সামান্য নীচে দিয়ে সোহানাও।

আরেকটা বৃত্তাকার রুম। এটার ব্যাস ত্রিশ ফুটের মতো। আখরোট গাছের কাঠ মাপমতো কেটে পলিশ করে ডেকোরেশন করা হয়েছে ঘরটার। মেঝেতে শোভা পাচ্ছে পারশিয়ান কার্পেট, দেখে মনে হচ্ছে হাতেবোনা। আখরোট কাঠ বিশেষ মাপে কেটে কুলুঙ্গি বানানো হয়েছে দেয়ালে। প্রতিটা কুলুঙ্গিতে শোভা পাচ্ছে বিশেষ আকৃতির একেকটা কাঁচের বাক্স। প্রতিটা বাক্সেই মার্বেলের পেডাস্টালের উপর ভর দিয়ে আছে কোনো-না-কোনো অস্ত্র। একটা করে হ্যালোজেন ল্যাম্প জ্বলছে প্রতিটা বাক্সের ভিতরে. এছাড়া ঘরে আর কোনো আলো নেই।

"সোর্ডরুমের" সঙ্গে তুলনা করলে একটা বিষয় স্পষ্ট বোঝা যায়, এই ঘরের অস্ত্রগুলো দেখে শুধু সিদেরভ। এবং কাজটা করতে গিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করে সে, কারণ উঁচু পিঠওয়ালা পুরু গদির একটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে ঘরের ঠিক মাঝখানে; কেউ বলে না দিলেও বোঝা যায় অস্ত্রগুলো দেখার সময় ওই চেয়ারে আরাম করে বসে থাকে লোকটা।

'মাফিয়াসর্দারের সিংহাসন,' নিচু গলায় মন্তব্য করল সোহানা।

মুচকি হাসল রানা. কিছু বলল না। পা রাখল ঘরের ভিতরে। ওর পিছন পিছন সোহানা। দরজাটা খোলাই থাকল।

পাশাপাশি হাঁটছে রানা-সোহানা. একদিকের দেয়ালের কাছে এসে থেমে দাঁড়াল। বড় একটা কাঁচবাক্স আছে এখানে। ভিতরে বেশ অদ্ভুত একটা ঢাল। বেত আর চামড়া দিয়ে বানানো. অনেকটা ডিম্বাকৃতির। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ দেখল রানা ঢালটা,

তারপর নিচু গলায় বলল, 'এটার নাম কী, জানো?'

'না।'

'অ্যাগেরন। পারস্য-সেনারা এককালে ব্যবহার করত এই জিনিস। পাশের তলোয়ারটা দেখছ? ওটার নাম অ্যানাকিনেক্স, অ্যাকিমেনিড রাজবংশের প্রতীক।'

'সবকিছু শুধু পারস্য সংক্রান্ত, তা-ই না? কেন যেন মনে হচ্ছে একটা ক্লু পাচ্ছি আমরা।'

'কী বলতে চাও? এবার যে-জিনিসের পেছনে লেগেছে সিদোরভ তা-ও পারস্যের?'

'হতে পারে।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল রানা। তারপর অনতিদূরের একটা কুড়াল দেখিয়ে বলল, 'ওটার নাম অ্যাসাগারিস—পারস্য রণকুড়াল। ওটাও অ্যাকিমেনিড রাজবংশের প্রতীক।'

'তার মানে এই ঘরে যত ঢাল, বর্শা, খঞ্জর, ধনুক আছে সবই কি অ্যাকিমেনিড রাজবংশের?'

জবাব দেয়ার আগে অস্ত্রগুলো ভালোমতো দেখল রানা। কোনো কোনো অস্ত্রের নীচে ছোট্ট প্ল্যাকার্ড আছে, ওগুলো পড়ল। তারপর বলল, 'শুধু অ্যাকিমেনিড রাজবংশেরই না, আমার কী মনে হয় জানো? এগুলো সবই রাজা প্রথম যারক্সিযের আমলের।'

'তার মানে নিজের একান্ত সংগ্রহশালায় শুধু প্রথম যারক্সিযের জিনিস সাজিয়েছে সিদোরভ? তার মানে...'

'হ্যাঁ,' সোহানা কী বলতে চায় বুঝে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা, 'হতে পারে, সে যে-জিনিস খুঁজছে, সেটাও প্রথম যারক্সিযের আমলের। যাক, ছোট্ট এই যাদুঘরে আসায় একটা লাভ হলো আমাদের। কী খুঁজছে সিদোরভ সে-বিষয়ে মোটামুটি ধারণা পাওয়া গেল।'

'মানলাম। কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

'তোমার প্রশ্নটা অনুমান করতে পারছি। প্রথম যারক্সিয়ের সঙ্গে নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের যোগাযোগটা কোথায়, তা-ই তো?'

নিঃশব্দে হেসে মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

'প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে বের করবো আমরা। চলো।'

ক্যামেরাওয়ালা রুমটার দরজার বাইরে হাঁটু গেড়ে বসে আছে রানা-সোহানা। দরজাটা ইঞ্চি তিনেক খুলে আরও একবার উঁকি দিয়েছে রানা। কাউকে দেখতে পায়নি।

'কীভাবে ঢুকবে, ভেবেছ?' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'সরাসরি ঢুকে পড়বো, কপালে যা আছে হবে। তুমি দরজার বাইরে থাকবে। একসঙ্গে দু'জন ঢুকতে পারবো না, ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবো।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল সোহানা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। 'কিন্তু...'

'এবার কোনো কিন্তু চলবে না। যা বলছি করতে হবে তোমাকে। যদি ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাই আমি, যদি সে-রকম কোনো লক্ষণ টের পাও, বুদ্ধি খাটিয়ে লুকিয়ে পড়বে কোথাও। ভরসা রাখো আমার ওপর। নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে পালাতে পারবো শত্রুর কবল থেকে।'

এখন রানাকে একা ছেড়ে দেয়া ছাড়া উপায় নেই, বুঝতে পারছে সোহানা। বলল, 'তুমি ভেতরের দরজার কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কি এখানেই অপেক্ষা করবো?'

এক সেকেণ্ড ভাবল রানা। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, করো।' চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছে ক্যামেরাটাকে। 'ভিতরে ঢুকতে গেলে আমার শরীরের ধাক্কায়

আরও কিছুটা সরে যাবে দরজা। সোহানা, তোমার কাজ হচ্ছে, হাতল ধরে যতখানি পারো আমার শরীরের কাছাকাছি রাখবে ওটাকে। আসলে একটা চান্স নিচ্ছি আমি। যার বা যাদের তাকিয়ে থাকার কথা ক্যামেরাটার সঙ্গে যুক্ত টিভিস্ক্রিনের দিকে, ধরে নিচ্ছি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভুগছে তারা, কল্পনাও করছে না কেউ এভাবে হানা দিতে পারে তাদের দুর্গে। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

আর কিছু না বলে এগোতে শুরু করল রানা।

দু'কনুই আর দু'পা কাজে লাগিয়ে চিৎ হয়ে থাকা অবস্থাতেই এগোচ্ছে ও। দরজা দিয়ে ঢুকেই পুরোপুরি কাত হয়ে গেল ডান দিকে। শরীরের ভর ছেড়ে দিয়েছে ডান কনুই, বাঁ হাত, ডান হাঁটু আর বাঁ পায়ের উপর। ক্যামেরাটা ততক্ষণে ডান দিক থেকে সরে আসতে শুরু করেছে বাঁ দিকে—রানার দিকে।

দেয়ালের সঙ্গে যতখানি সম্ভব সেঁটে গেছে রানা, মড়ার মতো পড়ে থাকতে চাইছে। হাঁটু পর্যন্ত ঢুকিয়ে ফেলতে পেরেছে রুমের ভিতরে। দরজাটা যতখানি সম্ভব ভিড়িয়ে দিয়েছে সোহানা, খেয়াল রেখেছে রানা যাতে ব্যথা না পায়। যতটুকু ফাঁক আছে সেখান দিয়ে উঁকি দিয়েই দেখছে রানাকে।

আবারও ঘুরতে শুরু করেছে ক্যামেরার পিভট মোটর, রুমের পিনপতন নীরবতায় সে-আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায়। মাথা তুলে কাঁচদেয়ালে ক্যামেরার প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছে রানা। ঘুরে গিয়ে আরও একবার পুরোপুরি ডানদিকে স্থির হয়েছে ক্যামেরা। হাতে-থাকা চার সেকেণ্ড কাজে লাগিয়ে দু'পা রুমের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলল রানা। তারপর এগোল আরও কিছুটা।

আবারও পিভট মোটরের গুঞ্জন। আবারও দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে স্থির হয়ে গেল রানা। করার কিছু নেই, তাই পরের চার সেকেণ্ডে কাঁচের দেয়াল ভেদ করে দেখে নিতে চাইল রুমের

যতখানি সম্ভব না, আর কোনো ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না। ঘাড় কাত করল রানা, কাঁচের দেয়ালে দেখা যাচ্ছে ক্যামেরাটা সরে যাচ্ছে আবার।

পরের চার সেকেণ্ডে যত দ্রুত গতিতে সম্ভব এগোল রানা। যে-দিকের দেয়ালে লাগানো হয়েছে ক্যামেরাটা, সে-দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল হাঁটু ভাঁজ করে। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। এদিকের দরজাটা ফুট তিনেকের মধ্যে। ওটার নীচ দিয়ে মৃদু আলো আসছে।

দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে থাকা অবস্থাতেই নিতম্বে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা। জানে এখন ও ক্যামেরার ফোকাসের বাইরে। দু'হাত কাজে লাগিয়ে খানিকটা এগিয়ে সাবধানে ধরল দরজার নব, আলতো করে মোচড় দিল। নবটা ঘুরে গেল পুরোপুরি। তার মানে দরজাটা লক করা নয়।

বাঁ দিকে তাকিয়ে কাঁচের দেয়ালে ক্যামেরার প্রতিবিম্ব দেখল রানা। মৃদু গুঞ্জন তুলে ঘুরতে শুরু করেছে পিভট মোটর। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে ডানদিকে।

সোহানার দিকে তাকাল রানা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোহানা। কী করবে জানতে চাচ্ছে।

হাতের ইশারায় কথা হয়ে গেল দু'জনের মধ্যে। রানা জানতে চাইল ও যেভাবে ক্যামেরাকে ফাঁকি দিতে পেরেছে, সোহানা তা পারবে কি না। জবাবে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলল সোহানা—ওর উপর ভরসা রাখতে বলছে রানাকে। তারপর রানা যেভাবে গেছে, ঠিক সেভাবে এগিয়ে, ক্যামেরাকে ফাঁকি দিয়ে, পনেরো সেকেণ্ড পর হাজির হলো ও রানার পাশে।

দরকার ছিল না, তারপরও সাবধানতার খাতিরে চার সেকেণ্ড অপেক্ষা করল রানা। নব ধরে আরেকবার মোচড় দিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা। একটুও দ্বিধা না করে সোহানাকে নিয়ে ঢুকে

গেল ভিতরে।

দু'জনে একসঙ্গে ঘুরে তাকাল রুমটার দিকে। যেন উজ্জ্বল কোনো সাদা আভায় ওদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কড়া স্কটিশ টানে কে যেন বলে উঠল, 'হচ্ছেটা কী? কে আপনারা? এখানে ঢুকলেন কীভাবে?'

এগারো

'জবাব দিচ্ছেন না কেন?' খেঁকিয়ে উঠল স্কটিশ কণ্ঠ। 'কেন এসেছেন এখানে?'

জবাব না দিয়ে নাইন মিলিমিটার ল্যুগারটা বের করল রানা। তাক করল স্কটিশ কণ্ঠের মালিকের দিকে।

সঙ্গে সঙ্গে আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে দু'হাত উপরে তুলে ফেলল লোকটা। 'ঈশ্বরের দোহাই লাগে!' এখন মিনতি ঝরছে তার গলায়। 'গুলি করবেন না!'

উজ্জ্বল সাদা আভার সঙ্গে মানিয়ে গেল রানা-সোহানার চোখ। মুখোমুখি-দাঁড়ানো লোকটার দিকে পিস্তল তাক করে রেখে এদিক-ওদিক তাকাল রানা।

একটু আগে যে-চোরাকুঠুরি থেকে ঘুরে এসেছে ওরা, তার তুলনায় এটা আয়তনে প্রায় দ্বিগুণ। কাঁচদেয়ালের এপাশে বেশ লম্বা একটা মেলামাইনের ডেস্ক। সেটার উপরে দুটো কম্পিউটার-টাওয়ার আর চব্বিশ ইঞ্চির এলসিডি ডিসপ্লে। বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল এটা কন্ট্রোলরুম, আসলে ল্যাবরেটরি ক্লিনরুম। চারদিকের

দেয়ালেই ধবধবে সাদা রঙ-করা। এত সাদা যে, অভ্যাস না থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

সাদা অ্যান্টিস্ট্যাটিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রাবার টাইলস ব্যবহার করা হয়েছে মেঝেতে। ঘরের প্রায় মাঝখানে বারো ফুট বাই ছ'ফুটের একটা টেবিল। ওটা ঘিরে কয়েকটা টুল। একদিকের দেয়ালে বিশাল একটা শেল্ফ। ওই শেল্ফ আর ঘরের মাঝখানের টেবিলে, রানা অনুমান করল, সিকি মিলিয়ন ডলারের রেস্টোরেশন জিনিস রাখা আছে। অটোক্লেভ, গ্লাস-ফ্রন্টেড রেফ্রিজারেশন ইউনিট, দুটো স্টেরিয়ো-মাইক্রোস্কোপ, একটা পোলারাইযড্ ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপ, একটা হ্যাণ্ডহেল্ড এক্স-রে ফ্লুরোসেন্স—কী নেই?

টেবিলটার উপরটায় ফরমাইকা দেয়া; সেখানে সিদোরভের কিছু "অস্ত্রের নমুনা"-ও দেখা যাচ্ছে। যেমন একটা বর্শার ভাঙা হাতল, দু'মাথাওয়ালা একটা কুড়ালের ফলা এবং মরচে-ধরা বেঁকে-যাওয়া একটা তলোয়ার। টেবিলের উপরে, ছাদ থেকে ঝুলছে আর্টিকুলেটেড স্টেইনলেস স্টীলের ত্রিভুজাকৃতির হ্যালোজেন ল্যাম্প।

ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা বেঁটে। টাক মাথা, তবে চাঁদির নীচের দিকে কানের উপরে লেপ্টে আছে কমলা রঙের কয়েকগাছি চুল। পরনে হাঁটু-পর্যন্ত-লম্বা সাদা ল্যাব কোট আর দোমড়ানো ট্রাউজার। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা, বেশি পাওয়ারের পুরু গ্লাসের কারণে চোখ দুটো রসগোল্লার মতো বড় দেখাচ্ছে। মৃত্যুভয়ে ভীত লোকটা দু'হাত উপরে তুলেই দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে একটু একটু কাঁপছেও। সবমিলিয়ে হাস্যকর লাগছে দেখতে।

ওকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করল রানা, এমনকী সোহানাও। ওর উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আবারও এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে

দু'জনে। জিনিসটা সোহানার নজরেই পড়ল প্রথমে।

দুটো এল.সি.ডি. মনিটরের একটাতে দেখা যাচ্ছে স্ক্যান-করা একটা ছবি। তাতে বিশেষ কতগুলো প্রতীক।

'ইউরেকা!' বিড়বিড় করে বলল সোহানা। তারপর ঘুরে তাকাল টেকো লোকটার দিকে। 'আপনি...'

ও দ্বিতীয় শব্দটা উচ্চারণ করার আগেই চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল লোকটা। একদিকের দেয়ালে মাশরুমের মতো দেখতে লাল রঙের একটা বাটন আছে, বোঝা গেল ল্যাবরেটরির ভিতরে কোনো বিপদ হলে ওটা পুশ করতে হয়; বাটনটার দিকে প্রাণপণে দৌড়ে যাচ্ছে লোকটা।

'থামো!' হুঙ্কার দিয়ে উঠল রানা।

লাভ হলো না।

যে-লোক কোনো ক্ষতি করেনি তাকে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করতে পারে না রানা। তা ছাড়া গুলি করলে অসুবিধাও আছে। বদ্ধ জায়গার বুলেটের বিকট আওয়াজ শুনতে পেলে হাজির হয়ে যাবে সিদোরভের গার্ডরা।

লাফিয়ে আগে বাড়ল সোহানা। বর্শার ভাঙা হাতলটা ছোঁ মেরে তুলে নিল টেবিল থেকে। তারপর ওটা বুমেরাং-এর মতো ছুঁড়ে মারল ছুটন্ত লোকটাকে নিশানা করে, সর্বশক্তিতে। বাতাসে কয়েকবার পাক খেল হাতলটা, শেষে লোকটার ডান হাঁটুর পিছনদিকে আঘাত করল প্রচণ্ড জোরে। ছুটতে ছুটতেই হুমড়ি খেল লোকটা, "মাশরুম" ধরার জন্য একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু ধরতে পারল না, তাল হারিয়ে মাথাটা সজোরে ঠুকে গেল দেয়ালের সঙ্গে। ভোঁতা একটা আওয়াজ শোনা গেল, দেয়ালের সঙ্গে কিছুক্ষণ লেপ্টে থাকল লোকটার শরীর, তারপর কাটাগাছের মতো ধপাস করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। জ্ঞান হারিয়েছে।

পিস্তলটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে আগে বাড়ল রানা। উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা লোকটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। ঠেলে চিৎ করল ওকে। কপালের যেখানে ব্যথা পেয়েছে লোকটা সে-জায়গা ফুলে উঠেছে ইতিমধ্যে, লাল হয়ে গেছে। দরকার ছিল না, তারপরও লোকটার পাল্‌স্‌ চেক করল রানা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে সোহানাকে বলল, 'ওয়েল ডান। আধ ঘণ্টার আগে জ্ঞান ফিরবে না। আর আগামী কয়েকটা দিন মাথার অসহ্য ব্যথায় কোঁ কোঁ করবে।'

মনিটরটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সোহানা, একদৃষ্টিতে দেখছে ছবিটা। ঘাড় না ঘুরিয়েই বলল, 'আমার ধারণা রাম কে-তে আমরা যে-বোতলটা পেয়েছিলাম, ওটা থেকে এসেছে এই প্রতীকওয়ালা ছবি।'

পায়ে পায়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল রানা। স্ক্রিনের ছবিটা দেখল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। আরেকটা কথা। এটা যদি রাম-কে'র বোতলের ছবি না হয়, বুঝতে হবে সিদোরভের কাছে আরও বোতল আছে।'

'খুঁজে দেখবো নাকি এখানে?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সোহানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে হিউমিডিটি-কন্ট্রোল কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল রানা। সোহানা গেল রেফ্রিজারেটরের দিকে। ভালোমতো দেখল দু'জনে। কিন্তু কিছু পেল না। শেষে ফিরে এল ঘরের মাঝখানের টেবিলটার কাছে। চারটা ড্রয়ার আছে এটাতে। একটা একটা করে সবগুলো ড্রয়ার টান দিল রানা। কিন্তু না, কোনো বোতল নেই ভিতরে। এমনকী বোতলের গায়ে বিশেষ যে-লেবেল ছিল তা-ও নেই।

এল.সি.ডি. মনিটরের সামনে আবার গিয়ে দাঁড়াল সোহানা। আবারও ভালোমতো দেখল স্ক্রিনের ছবিটা। তারপর বলল, 'এটা

মনে হয় কোনো ডিজিটাল ইমেজ। ছবির বাঁ দিকের প্রান্তটা খেয়াল করেছ, রানা? মনে হচ্ছে না ওখানে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি রঙ আছে?'

দেখল রানা, কিন্তু সোহানার প্রশ্নের জবাব দিল না। বরং বলল, 'ছবিটার প্রিন্ট নেয়া যায় কি না...' কথা শেষ না করে হঠাৎ থেমে গেল। ঝট্ করে ঘাড় ঘুরাল একদিকে। 'শুনতে পেয়েছ?' আঙুল তুলে দেখাল একদিকে।

রানা যেদিকে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকাল সোহানা। রুমের এককোণে, একটা কেবিনেটের আড়ালে খানিকটা লুকিয়ে আছে একটা ভিডিও ক্যামেরা। বোঝা যায় এতক্ষণ ঘুরছিল, এবার স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে রানা-সোহানার দিকে। মৃদু আওয়াজ শুনলে বোঝা যায় লেন্স যুম করা হচ্ছে ওদের দু'জনের উপর।

'আসছে সিদোরভ বাহিনী,' বলল সোহানা।

'জলদি করো!' পকেট থেকে পিস্তলটা বের করল রানা। 'কী-বোর্ডটা চেক করে দেখো ইমেজটার কোনো প্রিন্টআউট নিতে পারো কি না।'

কী-বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল সোহানা। রানা ছুট লাগাল ক্যামেরাটার দিকে। ধরা পড়ে গেছে, তাই রাখঢাকের কিছু নেই: ক্যামেরার নীচে দাঁড়িয়ে একটানে ছিঁড়ে ফেলল ফিড-ওয়্যার। কল্পনার চোখে দেখল, যে বা যারা অন্য কোথাও বসে আছে টিভির সামনে, স্ক্রিনে ঝিরঝিরানি ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছে না তারা।

দৌড়ে দরজার কাছে হাজির হলো রানা। হ্যালোজেন ল্যাম্পের সুইচটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। নিভিয়ে দিল বাতিটা, পিস্তলের বাঁট দিয়ে বাড়ি মেরে ভেঙে দিল সুইচ। এলসিডি মনিটরের আলোয় দেখা যাচ্ছে সোহানাকে। দ্রুত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে গেল রানা।

'হয়ে গেছে!' রানা পাশে দাঁড়ানোমাত্র বলে উঠল সোহানা, কী-বোর্ডের এন্টার বাটনে চাপ দিল। জ্বলে উঠল লেযার প্রিন্টারের সবুজ বাতি। মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। প্রিন্ট শুরু হয়েছে।

ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর সজোরে দরজাটা লাগানো হলো। একটু পরে আবার সেটা খুলে গেল। ছুটন্ত পদশব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

'মাথা নামাও!' হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। ল্যাবরেটরি রুমের কোথায় কী আছে শেষবারের মতো দেখে নিয়ে গেঁথে রাখল মনের পর্দায়। হাত বাড়িয়ে বন্ধ করে দিল মনিটর দুটোর সুইচ। ঘরের ভিতরে এখন ঘুটঘুটে অন্ধকার।

প্রিন্ট আউট শেষ হলো। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিল সোহানা। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। পা বাড়িয়ে একটা টুল টেনে নিয়ে এল বিনা-শব্দে। টেবিলের নীচে বেশ বড় ফাঁকা জায়গা, সেখানে ঢুকে গেল সোহানাকে নিয়ে। হাতের ডানপাশে রাখল টুলটাকে। যদি গোলাগুলি হয় তা হলে মাথাটা আড়াল পাবে।

ল্যাবরেটরি রুমের দরজার নব ধরে মোচড় দিচ্ছে কেউ। সাবধানে করতে চাচ্ছে সে কাজটা, কিন্তু অতি উত্তেজনার কারণে পারছে না। মোচড়ানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। টেবিলের নীচ থেকে মাথা বের করল রানা। টুলের আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। ডান হাতে নাইন মিলিমিটার ল্যুগার।

সজোরে লাথি মারা হলো দরজায়। ছিটকে খুলে গেল সেটা। লাফিয়ে ঘরে ঢুকল একটা ছায়ামূর্তি, বোকার মতো খেয়াল করেনি বাইরে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো, ল্যাবরেটরির ভিতরে যারা আছে তারা স্পষ্ট দেখতে পাবে ওকে।

নিশানাটা তাই খুব সহজ হয়ে গেল রানার জন্য। লোকটার দিকে পিস্তল তাক করেই টান দিল ট্রিগারে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার

করে উঠল লোকটা, পিছাতে গিয়ে সজোরে ধাক্কা খেল দেয়ালের সঙ্গে, হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। একের পর এক বিকট সব গাল দিচ্ছে। হাত থেকে আপনাআপনি ছুটে গেছে ওর অস্ত্র—একটা হেকলার অ্যাণ্ড কচ এমপি ফাইভ সাবমেশিনগান। মেঝের সঙ্গে টক্কর খেয়ে দু'বার পাক খেল অস্ত্রটা। তারপর স্থির হলো মাঝখানের টেবিলটার থেকে কিছুটা দূরে।

মেঝেতে পড়ে-থাকা লোকটা গাল দিতে দিতে সরে যাচ্ছে দরজার দিকে, প্রাণভয়ে বের হয়ে যেতে চাচ্ছে ল্যাবরেটরি থেকে। আসলে কল্পনাও করেনি কেউ গুলি করতে পারে ওকে। খুলে হাঁ হয়ে থাকা দরজার ওপাশ থেকে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে আরও কয়েকজন। সম্ভবত জানতে চাচ্ছে ভিতরের অবস্থা কী। "শত্রুপক্ষের" লোকসংখ্যা জানা আছে ওদের, কিন্তু তারা কোথায় কীভাবে পজিশন নিয়েছে না জেনে ভিতরে এসে গুলি খেতে রাজি নয় কেউই।

সুযোগটা নিল রানা। নাইন মিলিমিটারটা ধরিয়ে দিল সোহানার হাতে। ফিসফিস করে বলল, 'সাবমেশিনগানটা দখল করতে চাই। পজিশন চেঞ্জ করতে হবে আমাকে। আমি গড়ান দিয়ে বের হওয়ামাত্র খোলা দরজার দিকে দু'বার গুলি করবে। কাঁচের দেয়ালের ওপাশ থেকে স্ফুলিঙ্গ দেখতে পাবে ওরা। কাজেই গুলি করেই পজিশন চেঞ্জ করতে হবে তোমাকে। টেবিলের আরেকপ্রান্তে চলে যেয়ো।' আর দেরি না করে, গড়াতে শুরু করল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের নীচ থেকে মাথা বের করল সোহানা। শরীরটাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তখন দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে আহত লোকটা। ওর চাঁদি ঘেঁষে দুটো বুলেট পাঠিয়ে দিল সোহানা। সঙ্গে সঙ্গে সরে এল পেছনে।

আবারও অশ্রাব্য খিস্তি। বাইরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, এবার

বোধহয় তাদেরকে গাল দেয়া হচ্ছে। কারণ তারা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে অথচ সাহায্য করছে না।

সাহায্য করার উপায়ও নেই আসলে। সাধ করে কে আসবে খোলা দরজার কাছে সহজ টার্গেটে পরিণত হওয়ার জন্য?

গড়াতে গড়াতে রানা চলে এসেছে মাঝখানের টেবিলের কাছে। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল সাবমেশিনগানটা। দ্রুত চেক করল। পুরোপুরি লোডেড। আরও দু'বার গড়ান দিয়ে চলে গেল টেবিলের আরেকপ্রান্তে। একটু আগে ড্রয়ারগুলো খুলে চেক করেছিল এখানেই।

শত্রুপক্ষ থেকে এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ শুরু হলো এমন সময়। টেবিলের এককোনা দিয়ে মাথা বের করে দেখছে রানা। সাবমেশিনগান আছে ওদের কমপক্ষে আরও একজনের কাছে। ম্যাগাজিনের পুরোটাই খালি করে দিচ্ছে সে ল্যাবরেটরিরুমের ভিতরে। কাঁচের দেয়ালের ওপাশ থেকে গুলি করছে, ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে কাচ। বুলেটের ধাক্কায় মনিটর দুটো ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কাঁচ ভাঙার আওয়াজ পাওয়া গেল আবারও। গুলির আঘাতে টুকরো হচ্ছে অটোক্লেভ, ফুটো হচ্ছে গ্লাস-ফ্রন্টেড রেফ্রিজারেশন ইউনিট। স্টেরিয়ো-মাইক্রোস্কোপ দুটো আর ফ্লুরোসেন্স মাইক্রোস্কোপটাও রেহাই পেল না। সাধের ল্যাবরেটরির কী হাল হচ্ছে জানতে পারলে সিদোরভের চেহারা কেমন হবে কল্পনা করার চেষ্টা করল রানা।

লোকগুলো ভাবতে পারেনি আগ্নেয়াস্ত্র আছে রানা-সোহানার কাছে। নইলে এতক্ষণে হুড়মুড় করে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ত সবাই। সময় নিচ্ছে ওরা, রিইনফোর্সড হচ্ছে আসলে। অথবা হয়তো আরও ভালো কোনো কৌশল বের করতে চাইছে।

একটা হাত দেখা গেল দরজার আড়ালে। ল্যাবরেটরি রুমের ভিতরে কিছু একটা ছুঁড়ে মারতে উদ্যত হয়েছে। বোঝা গেল

কোনো টার্গেট নেই লোকটার। জিনিসটা উড়ে এসে বাড়ি খেল রানা যে-টেবিলের আড়ালে আছে সেটার সঙ্গে, ভোঁতা আওয়াজ তুলে আছড়ে পড়ল রাবার-বিছানো মেঝেতে।

"বাই সাইকেল কিক" বলে ফুটবল খেলায় একটা শট আছে। জিনিসটা মেঝেতে পড়ামাত্র সেটার গায়ে সে-রকম একটা লাথি মারল রানা। আরেকদফা উড়াল দিল জিনিসটা, সজোরে বাড়ি খেল দরজার পাল্লায়, সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো। চোখ ধাঁধানো সাদা আলোয় আর কানে তালা-লাগানো আওয়াজে ভরে গেল পুরো ল্যাবরেটরি।

'রানা ঠিক আছো?' চিৎকার করে জানতে চাইল সোহানা।

'আছি। তুমি?'

'ওকে। ওটা কী?'

'ফ্ল্যাশ-ব্যাং গ্রেনেড। স্পেশাল ফোর্স আর সোয়াট টিম সাধারণত ব্যবহার করে এটা। কেউ কেউ সাউণ্ড গ্রেনেডও বলে। ফাটলে প্রচুর আলো আর শব্দ হয়, কিন্তু তেমন কোনো ক্ষতি হয় না কারণ গ্রেনেডের ভিতরে স্প্লিণ্টার থাকে না।'

'কিন্তু আসল গ্রেনেডই তো মারতে পারত...'

'আমার অনুমান এতক্ষণে খবর চলে গেছে সিদোরভের কাছে। সাধের ল্যাবরেটরির কোনো ক্ষতি চাচ্ছে না সে হয়তো। মনে হয় ওর চ্যালাদেরকে বলেছে যাতে ভয় দেখিয়ে আটক করা হয় আমাদেরকে। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে, ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।'

দরজায় উদয় হলো এক বিশালদেহী, হাতে সাবমেশিনগান। দ্রুত এদিক-ওদিক তাকিয়ে শত্রুপক্ষের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করছে। ওকে সুযোগটা দিল না সোহানা। যে-হাতে সাবমেশিনগান ধরে আছে লোকটা, সেটা নিশানা করে গুলি করল। বুলেট গিয়ে লাগল কাঁধ আর কনুইয়ের মাঝামাঝি

জায়গায়। চিৎকার করে উঠল লোকটা, সাবমেশিনগান হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেল দরজার আড়ালে।

'সোহানা!' চাপা গলায় দ্রুত ডাক দিল রানা। 'কভার দাও আমাকে। একটু পর পর গুলি করতে থাকো দরজার দিকে। ওই সাবটাও দখল করতে চাই আমি। বেরিয়ে পড়তে চাই এখান থেকে।'

কথামতো কাজ করল সোহানা। মাথা যতটা সম্ভব নিচু রেখে ক্রল করে এগোচ্ছে দরজার দিকে, একটু পর পর একটা করে গুলি করছে। ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে দরজার পাল্লা, ওপাশের দেয়াল। রানার পজিশনটা দেখে নিল একপলক। যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে দরজার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা। আরেকটু হলেই হাতের নাগালে পেয়ে যাবে দ্বিতীয় সাবমেশিনগান।

আরও একবার গুলি করল সোহানা, তবে এবার দরজার দিকে না। আওয়াজ শুনে টের পেয়েছিল ভাঙা কাঁচের দেয়ালের আড়ালে পজিশন নিচ্ছিল কেউ, রানাকে এগোতে দেখে ওর দিকে তাক করছিল হাতের আগ্নেয়াস্ত্র; মুহূর্তের মধ্যে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল সোহানা, পাক খেয়ে ঘুরল প্রায় নব্বই ডিগ্রি, চাপ দিল নাইন মিলিমিটারের ট্রিগারে। বুকের বাঁ দিকে বুলেটের ক্ষত নিয়ে উধাও হলো লোকটা। চিৎকার করার অবকাশটুকু পেল না।

দেরি করার মানে হয় না। দু'হাতে দুটো সাবমেশিনগান নিয়ে ডাইভ দিল রানা দরজার দিকে। খোলা দরজা দিয়ে প্রথমে দুই সাবমেশিনগান, তারপর রানার মাথা, শেষে কোমর পর্যন্ত। শরীরটা মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগেই টান দিল ও ডানহাতের অস্ত্রটার ট্রিগারে।

ওরা মোট এসেছিল সাতজন। গুলি খেয়ে আহত হয়েছে দু'জন, একজন মারা পড়েছে। বাকি চারজন এবার ছত্রখান হয়ে গেল রানার সাবমেশিনগানের গুলিতে। রানাই আগে গুলি করতে

শুরু করেছে, তাই ট্রিগার টানার সুযোগই পেল না চারজনের কেউ, একেকজন শরীরের একেক জায়গায় বুলেটের ক্ষত নিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে গেল।

উঠে দাঁড়াল রানা, একটা সেকেণ্ডও নষ্ট করা যাবে না। বাঁ হাতের সাবমেশিনগানটা ঝুলাল কাঁধে। করিডোরের পরিস্থিতিটা দেখে নিল একপলক। ঝাঁঝরা হয়ে গেছে দু'জন। হাতের ম্যাগনাম পাশে ফেলে দিয়ে ডান পা দু'হাতে ধরে কাতরাচ্ছে একজন, কারণ একাধিক ক্ষত তৈরি হয়েছে সেখানে। এই লোকের থেকে কিছুটা বাঁ দিকে পড়ে আছে আরেকজন। পেট চেপে ধরেছে একহাতে, তারপরও গলগল করে বেরোতে-থাকা রক্ত থামাতে পারছে না। রানাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে কাঁপা কাঁপা হাতে তুলল সে হাতের রিভলভার। কিন্তু ওকে গুলি করার সুযোগ দিল না রানা। বুলেটশূন্য সাবমেশিনগানটা সজোরে ছুঁড়ে মারল লোকটার চেহারা লক্ষ করে। জায়গামতো গিয়ে লাগল ওটা। আর্তচিৎকার দিয়ে আছড়ে পড়ল লোকটা মেঝেতে। নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

'সোহানা, এসো,' বলেই দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করল রানা। হাঁটছে আর শত্রুপক্ষের যার কাছে যে-অস্ত্র পাচ্ছে তাই তুলে নিচ্ছে নিচু হয়ে।

যে লোকের চেহারায় সাবমেশিনগান ছুঁড়ে মেরেছে রানা তার কোমরে খরখর করছে একটা রেডিয়ো। কী মনে করে ওটা খুলে নিল রানা, পাশে এসে-দাঁড়ানো সোহানাকে দিল। ওপ্রান্তে রাশান ভাষায় দ্রুত কী যেন বলছে কেউ। সম্ভবত কিছু জানতে চাইছে। জবাব দিল না সোহানা, দরকারও নেই।

ওর কাঁধে একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ ঝুলতে দেখা যাচ্ছে। ল্যাবরেটরি থেকে চলে আসার আগে নিয়ে এসেছে। ব্যাগের ভিতরে কী আছে, অথবা কাজটা কেন করেছে সোহানা, সেসব

নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না রানা।

এদিকের দরজার কাছে পৌঁছে দরজাটা সাবধানে একটুখানি খুলল ও, সঙ্গে সঙ্গে সেঁটে গেল একদিকের দেয়ালের সঙ্গে। ইঙ্গিতে সোহানাকে বলল বিপরীতদিকের দেয়ালের গায়ে লেগে থাকতে। এই দরজা দিয়ে বের হওয়ার আগে পরিস্থিতি যাচাই করা দরকার।

দরজার ওপাশটা নীরব। সম্ভবত নির্জনও, কারণ কাউকে দেখা যাচ্ছে না আপাতত। আরও শত্রুর মোকাবেলা করার আগে নিজেদের কাছে কী কী অস্ত্র আছে যাচাই করতে চায় রানা।

প্রথমে একটা রেডিয়ো। এটা অস্ত্র না হলেও কাজে দিচ্ছে। শত্রুপক্ষ কী করতে চায় না চায় জানা যাচ্ছে। ওটা আছে সোহানার কাছে। ইঙ্গিতে ভলিউম কমিয়ে রাখতে বলল রানা। সোহানার কাছে আছে নাইন মিলিমিটারটা। প্রথম ম্যাগাজিন শেষ, এক্সট্রা দুটোর একটা দিয়ে রিলোড করেছে সোহানা। কুড়িয়ে-পাওয়া অস্ত্রগুলোর থেকে সোহানাকে একটা ম্যাগনাম দিল রানা, ইঙ্গিতে চেক করে নিতে বলল। নিজের প্যান্টের এক পকেটে রাখল আরেকটা ম্যাগনাম, আরেক পকেটে একটা রিভলভার। দু'হাতে দুটো সাবমেশিনগান, একটা রিলোড করা হয়েছে।

'এবার?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সোহানা।

দাঁত বের করে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'এবার আর কোনো জটিলতা নেই। সোজা ভোঁ দৌড়। যে-পথে এসেছি সেই পথে পালাতে হবে আমাদেরকে। যে বা যারাই বাধা হয়ে দাঁড়াবে, আত্মরক্ষার তাগিদে শেষ করে দিতে হবে তাকে বা তাদেরকে। পরিষ্কার?'

'ইয়েস, জেনারেল,' বলে হাসল সোহানা।

হাসিটা কেন যেন খুব মিষ্টি মনে হলো রানার কাছে।

'আমি আগে থাকবো,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল রানা, 'তুমি ঠিক

আমার পেছনে। যদি আমি ডানে কভার দিই, বাঁ দিক সামলাবে তুমি। ওকে?'

'ইয়েস, জেনারেল।'

'বেশ। চলো তা হলে। একধাক্কায় দরজা খুলে লাফিয়ে বের হবো আমি বাইরে। এক সেকেণ্ডও দেরি করা চলবে না তোমার। রেডি?'

'এক...দুই...'

বারো

'...তিন!'

সোহানা শব্দটা বলেছে কি বলেনি, দরজা খুলে লাফিয়ে বাইরে বের হয়ে এল রানা। সাবমেশিনগানটা দ্রুত ঘোরাল এদিক-ওদিক।

সাদা দেয়ালের করিডোর পার হয়ে যে-বৃত্তাকার ঘরে হাজির হয়েছিল প্রথমে, এখন সেখানে আছে ওরা। চারদিকে ছায়া ছায়া অন্ধকার। মাটির পাত্রের মতো বাল্বহোল্ডারগুলোতে বাল্ব জ্বলছে না, নিভিয়ে দেয়া হয়েছে। কোথাও কোনো নড়াচড়া নেই। কারও উপস্থিতি টের পাওয়া যাচ্ছে না। একদিকের দেয়ালে এগ্যস্ট ফ্যান চলছে, আগে খেয়াল করেনি ওরা, ওখান দিয়ে চুঁইয়ে ঢুকছে চাঁদের আলো।

'আরও লোক চলে আসার আগেই কনযারভেটরিতে হাজির হতে চাই আমি,' দ্রুত কথাগুলো বলল রানা সোহানাকে।

'দৌড়াও!'

সিকিউরিটি গার্ডকে অজ্ঞান করে যে-করিডোর ধরে ঢুকেছিল ওরা, একদৌড়ে হাজির হলো সেখানে। দরজা খুলে বের হতে যাবে, এমন সময় উজ্জ্বল একটা আলো দেখা গেল কনযারভেটরির এককোন থেকে। পরমুহূর্তে কী যেন উড়ে এসে বাড়ি খেল দরজার সঙ্গে। প্রচণ্ড শব্দে ফাটল সেটা। সার্চলাইটের মতো উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল চারদিক।

'আরেকটা সাউণ্ড গ্রেনেড,' সোহানাকে দরজার আড়ালে টেনে নিয়ে কথাটা বলল রানা। 'ওদের দ্বিতীয় দলটা কনযারভেটরিতে হাজির হয়ে গেছে। আমাদেরকে দেখে ফেলেছে।'

'এবার?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'পিছানোর উপায় নেই। কারণ কোন্ পথে বের হতে হবে জানি না। বের হওয়ার আদৌ কোনো পথ আছে কি না তা-ও জানি না। এগোতে হবে আমাদেরকে। একমাত্র আড়াল বলতে এই স্টীলের ভারী দরজা। ঝুঁকি নিতে হবে। আমি তোমাকে কভার দিচ্ছি। গুলি করতে শুরু করামাত্র দরজা দিয়ে বের হয়ে প্রাণপণে ছুটতে শুরু করবে। কনযারভেটরি বাদ দিয়ে অন্য যেদিকে পারো যেয়ো। যাও!'

দরজাটা ফাঁক করল রানা, ওখান দিয়ে বের হতে পারবে সোহানা। ও ছুট লাগানোমাত্র সাবমেশিনগান উঁচু করল। কনযারভেটরির ছাদের দিকে তাক করে গুলি করছে। প্রথম সাবের ম্যাগাজিন খালি করে দিল গ্লাসের উপর। চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ল কাঁচ শত্রুপক্ষের গায়ে। এবার দ্বিতীয় সাবটা নিল রানা। যে-ফ্রেমের উপর ভর দিয়ে ছিল কাঁচের ছাদ সেটার জয়েন্টে গুলি করছে। এবার ম্যাগাজিন খালি হওয়ার আগেই ভারী একটা আওয়াজ শোনা গেল। একদিকের ফ্রেম ভেঙে পড়েছে তালগাছগুলোর উপর, তারপর গাছগুলো নিয়ে মাটিতে। এলাহি

কারবার শুরু হয়ে গেছে ওখানে, রাশান ভাষায় চেঁচাচ্ছে কারা যেন, একটু পর বোঝা গেল আসলে আর্তনাদ করছে। দু'-চারজন আহত হয়েছে নিঃসন্দেহে।

গুলি করতে করতে দরজা দিয়ে বাইরে এসেছে রানা। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল সোহানাকে। আরেকদিকের খাটো দেয়ালের উপর চড়ে বসেছে ও, অপেক্ষা করছে রানার জন্য। একটা ম্যাগনাম বের করে এলোপাতাড়ি গুলি করছে কনযারভেটরির দিকে, আসলে কভার দিচ্ছে রানাকে।

সুযোগটা নিল রানা। গুলি করতে করতেই ছুট লাগাল দেয়ালের দিকে। কনযারভেটরির ভিতরে যারা অক্ষত অবস্থায় আছে তারা বুলেটের মাধ্যমে জবাব দিতে শুরু করেছে, রানার কোটের হাতায় দু'বার টান লাগল। সোহানার কাছাকাছি পৌঁছে দুটো সাবমেশিনগানই ওর দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, একমুহূর্ত পর লাফিয়ে চড়ল দেয়ালে। তারপর দু'জনে একসঙ্গে লাফিয়ে নামল ওপাশে।

কোমর সমান উঁচু ঘাসের জঙ্গল এখানে। মাঝেমধ্যে বুনো ঝোপও আছে। বোঝা যাচ্ছে এটা প্রাসাদের পেছনের দিক এবং সবচেয়ে অবহেলিত জায়গা। দৌড়াতে দৌড়াতেই সোহানার কাছ থেকে একটা সাবমেশিনগান নিল রানা। কোটের ভিতরের পকেট থেকে বের করল একটা ম্যাগাজিন, রিলোড করল। দেয়ালের ওপাশ থেকে এখনও শোনা যাচ্ছে কাঁচ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। ফ্রেমের বাকি অংশটাও ধসে পড়ল একটু পর। রাশান আর ইংরেজিতে গলা ফাটিয়ে কথা বলছে কারা যেন। লনটা যেদিকে আছে সেখান থেকে গানের শব্দ আসছে না আর। বরং অস্পষ্ট চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সিদোরভের অতিথিরা।

একটা ঘন ঝোপের আড়ালে বসে পড়ল রানা, হাত বাড়িয়ে

টেনে আনল সোহানাকে। হাঁপাচ্ছে দু'জনই। খালি হয়ে গেছে সোহানার ম্যাগনাম, ওটা রিলোড করে নিল ও।

হাতের ডানদিকে, পঞ্চাশ গজ দূরে শেষ হয়েছে সিদোরভের রাজত্ব। খাড়া একটা পাহাড়ি দেয়াল দেখা যাচ্ছে ওখানে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ গজ সামনে, ওদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে একসারি পাইন গাছ, সঙ্গে অযত্নে বড়-হওয়া ঝোপজঙ্গল।

হাতঘড়ি দেখল রানা। চারটে বাজে। ভোর হতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক বাকি।

'পার্কিংলটে অনেকগুলো গাড়ি আছে,' বলল সোহানা। 'অতিথিরা এখনও বিভ্রান্ত অবস্থায়। এই সুযোগে চলো কোনো একটা গাড়ি চুরি করে কেটে পড়ি।' পা থেকে জুতোজোড়া খুলল, একটা পাথরের সঙ্গে বাড়ি মেরে আলগা করে দিল হাইহিল দুটো। তারপর আবার পরে নিল। 'সেভ্যাস্টাপোলের কোনো জনবহুল এলাকায় হাজির হতে পারলেই হবে। বেশি লোকের সামনে কিছু করতে পারবে না সিদোরভ।'

প্রস্তাবটা ভেবে দেখল রানা। যে-পথে এসেছে সে-পথে পালাতে পারে ওরা, কিন্তু কাজটা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। টাইখোনের গার্ডরা সতর্ক হয়ে গেছে। হয়তো ইতিমধ্যে খবর চলে গেছে পেট্রোলবোটের ক্রুদের কাছেও, সতর্ক হয়েছে ওরাও। "চোরাকারবারের টানেল" ধরে যদি সাগরে হাজির হতে পারেও রানা-সোহানা, ওদিক দিয়ে পালানোর কোনো পরিকল্পনা নেই রানার মাথায়, অন্তত এ-মুহূর্তে না। কারণ যে-বোটে করে এসেছে ওরা তা ডুবিয়ে দিতে হয়েছে।

'ঠিক আছে, সোহানা,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা, 'গাড়িই চুরি করবো আমরা। কিন্তু কমপক্ষে দুটো বিষয় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে আমাদের জন্য।'

'কী?'

'এক, প্রহরীকুকুর আছে কি না সিদোরভের।'

'জানি না। থাকলেও কোনো লক্ষণ দেখিনি এখন পর্যন্ত।'

'দুই, ওর গানম্যানদের সংখ্যা কত।'

'তা-ও জানি না। বেশি হওয়াটাই স্বাভবিক। তবে হয়তো আজ রাতের জন্য সবাইকে রাখেনি এখানে। কিন্তু খবর দিয়ে আনতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না ওর।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চলো তা হলে। আসলে কী ঘটেছে, ওরা বুঝে ওঠার আগেই আরেকটা সুযোগ নেয়া যাক।'

উঠে দাঁড়াল রানা, একছুটে হাজির হলো পাইন গাছগুলোর কাছে। একটা গাছের আড়ালে বসে পড়ল। অপেক্ষা করছে সোহানার জন্য। একইসঙ্গে দেখে নিচ্ছে এদিকওদিক।

এক শ' গজ দূরে, পুবে, নাচানাচি করছে তিনটে ফ্ল্যাশলাইটের আলো। সিদোরভের তিন গার্ড। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে উঁচু গলায়, এত দূর থেকেও শোনা যায়। আসলে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে লোকগুলো, কখনও কল্পনাও করতে পারেনি এ-রকম কোনো ঘটনা ঘটতে পারে ওদের "সুরক্ষিত" এলাকায়। আলো ফেলে ফেলে বিভিন্ন ঝোপ আর গাছ দেখছে ওরা, কেউ লুকিয়ে আছে কি না নিশ্চিত হতে চায়। রানা এখন যেখানে আছে, আস্তে আস্তে সেদিকেই আসছে।

সোহানা এসে হাজির হলো রানার কাছে, বসে পড়ল। হাঁপাচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কুকুরের ডাক শুনেছ?'

মাথা নাড়ল সোহানা।

'সামনে একটা গেইমট্রেইল দেখতে পেয়েছি,' নিচু গলায় দ্রুত বলল রানা, 'বিভিন্ন দিকে গেছে ওটা। একটা পথ গেছে আস্তাবলের দিকে। সামনের কিছুটা জায়গায় ঝোপ ঘন না, তাই ক্রল করে এগোতে হবে আমাদেরকে। আস্তাবলের দিকে যেতে চাই আমি, ঘুরপথে হলেও। ওখান থেকে পার্কিংলটে যাবো।'

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। ক্রল করে এগোতে লাগল। কোনো কোনো পাইন গাছের কাঁটাওয়ালা শাখা বেঁকে নেমে এসেছে মাটির কাছাকাছি। বড় বড় বাঁকানো কাঁটাগুলো রানার শার্টের পিঠ খামচে ধরছে মাঝেমধ্যে। দু'বার কাপড় ছেঁড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। রানার কপালে-গালে খোঁচা লাগছে থেকে থেকে, পরোয়া করছে না ও।

সরু একটা গেইমট্রেইলে হাজির হলো দু'জনে কিছুক্ষণ পর। ট্রেইলটা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়েছে। সামনে, পনেরো-বিশ ফুট দূরে, পাইনের সারি আর খাটো ঝোপজঙ্গল আরও ঘন হয়েছে, খেয়াল করল রানা। ব্যাপারটা একদিক দিয়ে খারাপ, কারণ ওদের এগোনোর গতি মন্থর হবে। আবার একদিক দিয়ে ভালো—কভার পাওয়া যাবে। ঘাড় ঘোরাল রানা, সোহানা কোথায় আছে দেখে নিয়ে ঢুকে গেল ঝোপজঙ্গলের ভিতরে। একটু পর ঢুকল সোহানাও।

ততক্ষণে আরও কাছে এসে পড়েছে তিন গার্ড। ক্রল করতে করতে ওদের দিকে তাকাল রানা। বড়জোর চল্লিশ ফুট দূরে আছে লোকগুলো। কিন্তু এখানে ঝোপ এত ঘন যে, ফ্ল্যাশলাইটের আলো ভিতরে ঢুকতে পারছে না। রানা দেখল তিনজনই সশস্ত্র, দু'জনের হাতে খাটো লাঠি আছে। এগোনোর সময় লাঠি দিয়ে ঝোপ পেটাচ্ছে। কখনও কখনও বাড়ি দিচ্ছে পাইনের ঝুলন্ত ডালে।

দম নেয়ার জন্য একজায়গায় একটু থামল রানা। তখন ওর কাছে এসে হাজির হলো সোহানা। ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'আস্তাবলটা আর কত দূরে?'

'সোজা এগোতে পারলে সিকি মাইল,' ফিসফিস করেই বলল রানা। 'কিন্তু তা পারছি না আমরা। যেহেতু ঘুরপথে এগোতে হচ্ছে, ধরে নাও আরও আধ মাইল বাকি।'

'চলো এগোই। পেছনের তিন গার্ড দিক বদল করেছে। আমাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।'

পরের বিশ মিনিট ক্রল করে এগোল ওরা কোনো কথা না বলে। ঘন ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে কিছুদূর যায়, থামে, দম নেয়, ঝোপ পাতলা হলে সেদিকটা এড়ায় রানা। লিড দিচ্ছে ও, খেয়াল রেখেছে গেইমট্রেইলের যে-ট্র্যাক আস্তাবলের দিকে গেছে তা যেন হারিয়ে না ফেলে।

এক শ' গজ দূরে আবারও আলোর নাচন। নতুন দু'জন গার্ডকে দেখা যাচ্ছে এবার। এই লোকগুলোর থেকে ষাট-সত্তর গজ দূরে আরেকটা আলোর বৃত্ত। তারমানে, ভাবল রানা, সিদোরভ হয়তো নিশ্চিত হয়েছে, যে বা যারাই হামলা করে থাকুক ওর ল্যাবরেটরিতে, টাইখোনের পেছনের দিকে, জঙ্গলের দিকেই পালিয়েছে।

রানাকে চমকে দিয়ে মাত্র পাঁচ ফুট দূরে জ্বলে উঠল ফ্ল্যাশলাইট। দম বন্ধ করে ফেলল ও, টের পেল পেছনে সোহানার নড়াচড়াও বন্ধ হয়ে গেছে। পাহারাদার লোকটা ভূতের মতো কখন এত কাছে এসে পড়েছে টের পায়নি দু'জনের কেউই।

নড়ছে আলোটা, একজায়গায় স্থির থাকছে না। আশপাশের প্রতিটা পাইন গাছ দেখছে লোকটা। নিশ্চিত হলো কোনো গাছের আড়ালে লুকিয়ে নেই কেউ। এবার ঝোপগুলো দেখতে শুরু করল। আলোর আভায় লোকটার চেহারা দেখতে পাচ্ছে রানা, বুঝতে পারছে বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

রানার উপর না, আলো পড়ল সোহানার উপর, তা-ও সরাসরি মুখে। এত বিপদের মধ্যেও মজা লাগল রানার। পাহারাদারের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে সোহানা, লোকটাও ওকে দেখছে পলকহীন চোখে, চমকে গেছে দুজনই।

মাত্র দুই সেকেণ্ড, তারপরই লোকটা বুঝতে পারল যাকে

খুঁজছে তাকে পেয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়াল সে প্যান্টের পকেটের দিকে—বাঁশি বা আগ্নেয়াস্ত্র বের করবে। কিন্তু ওকে সে সুযোগটা দিল না রানা।

দু'হাতের উপর ভর দিয়ে ছোট্ট লাফ দিল ও, সামনের ঝোপটাকে দুমড়েমুচড়ে হাজির হলো লোকটার সামনে। আরেকদফা চমকে উঠল লোকটা। এবার দু'হাত আর বাঁ পায়ের উপর ভর রেখে সাইড কিক্ মারল রানা। ওর জুতোর মাথা গিয়ে আঘাত করল লোকটার বাঁ পায়ের গোড়ালিতে। লোকে অল্প ব্যথায় চেঁচায়, কিন্তু প্রচণ্ড আঘাতে নার্ভাস সিস্টেম কিছু সময়ের জন্য অকেজো হয়ে যায় বলে আওয়াজ করতে পারে না; কথাটা জানা থাকায় আবারও সুযোগ নিল রানা। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ও, যাতে ব্যালান্স না হারায় সেজন্য দু'হাত প্রসারিত করে দিয়েছে দু'দিকে, শরীরের ভর বাঁ পায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে ফ্রি করে নিয়েছে ডান পা-টাকে। হাত দিয়ে বল ধরার পর সেটাকে যেভাবে লাথি মেরে মাঝমাঠে পাঠায় গোলকিপার, ঠিক সে-কায়দায় লোকটার থুঁতনিতে আবারও কিক মারল রানা। ভোঁতা আওয়াজ পাওয়া গেল—হাড় ভাঙার নাকি দাঁতের সঙ্গে দাঁতের বাড়ি লাগার বোঝা গেল না। কল্পনার চোখে রানা দেখল, পানি চলে এসেছে সামনে-দাঁড়ানো লোকটার চোখে।

ডান পা মাটিতে নামাল রানা, বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে তিন শ' ষাট ডিগ্রি চক্কর খেল, ডান জুতোর গোড়ালি দিয়ে নিখুঁত একটা সাইডকিক মারল পাহারাদারের নাক আর কপালের জয়েন্টে। বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মাথা পেছনের দিকে হেলে পড়ল লোকটার, টলছে সে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আছড়ে পড়বে মাটিতে।

ডান পা মাটিতে নামিয়ে এনে বাঁ পায়ের উপর আরেকবার ভর দিল রানা, এবার বিরাশি সিক্কার একটা আপারকাট হাঁকাল গার্ডের বাঁ চোয়ালে। দাঁড়ানো অবস্থাতেই জ্ঞান হারাল লোকটা,

পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওকে সে সুযোগ দিল না রানা, খামচে ধরে ফেলল জামা। তারপর শুইয়ে দিল। একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে নিভিয়ে দিল মাটিতে পড়ে-থাকা ফ্ল্যাশলাইটটা, চলে এল ঝোপের আড়ালে, ক্রল করে সরে গেল দূরে।

কিছুক্ষণ পর ওর পাশে এসে হাজির হলো সোহানা। ফিসফিস করে বলল, 'একটা মানুষের রিফ্লেক্স অ্যাকশন যে কত ফাস্ট হতে পারে, তোমাকে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।'

'ভয় পেলে রিফ্লেক্স বেড়ে যায়,' জবাব দিল রানা। দম নিচ্ছে। সামনে গেইমট্রেইল সরু হয়েছে, ঝোপজঙ্গলও ঘনত্ব হারিয়েছে। অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে আস্তাবলের দক্ষিণদিকের দেয়াল। সোহানাকে ইঙ্গিতে বসে থাকতে বলে উঠে দাঁড়াল রানা, মাথা নিচু করে দৌড়ে চলে এল খাটো একটা পাইনগাছের আড়ালে। উঁকি দিয়ে আস্তাবলের দিকে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর দ্রুত ফিরে এল সোহানার কাছে।

'পার্টি লনটা আমাদের ডান দিকে,' বলল ফিসফিস করে। 'অতিথিদের কেউ কেউ চলে গেছে, কেউ কেউ যাচ্ছে। এখনও বিশ-পঁচিশটা গাড়ি আছে পার্কিংলটে।'

'আস্তাবলের কী অবস্থা?'

'একজন মাত্র গার্ড দেখলাম। আস্তাবলের ঢোকার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।'

'সশস্ত্র?'

'হ্যাঁ। দু'হাত কোমরের কাছে রাখতে পারছে না সে, একটু দূরে রেখেছে। তারমানে কোটের নীচে ডাবল শোল্ডার হোলস্টার পরেছে।'

'তোমার প্ল্যান কী?'

'এখান থেকে আস্তাবলটা ষাট-সত্তর গজ দূরে, প্রায় সমান দূরে রয়েছে পার্কিংলটটাও। ফ্লাডলাইটের জন্য সরাসরি

পার্কিংলটে যেতে পারছি না আমরা, এখান থেকে বের হলে গার্ডের নজরে পড়ে যেতে পারি। তুমি এখানে থাকো, আমি কিছু পাথর কুড়িয়ে আনছি। আমি আস্তাবলের দিকে রওনা দেয়ামাত্র পাথরগুলো ছুঁড়তে শুরু করবে পার্কিংলটের দিকে। কোন্ গাড়িতে পড়ল দেখার দরকার নেই, একটার পর একটা মারতে থাকবে। মনোযোগ অন্যদিকে সরে যাবে গার্ডের, সেই সুযোগে হাজির হবো আস্তাবলের কাছাকাছি। ওকে যখন কাবু করার জন্যে আমি ধস্তাধস্তি শুরু করব, পার্কিংলটের দিকে ছুট লাগাবে তুমি। কোন্ গাড়িটা নেবে বাছাই করবে। ভালো হয় যদি কোনো স্পোর্টস কার সিলেক্ট করো। গতি বেশি।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা, রানার মতলব বুঝতে পেরেছে।

চট করে সরে গেল রানা। ঝোপজঙ্গলের আড়াল থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এল গলফবলের মতো সাইজের ছ'টা পাথর। ওগুলো সোহানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল, ঝোপজঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ার আগে মাথা ঝাঁকাল সোহানার উদ্দেশ্যে।

লনের এপাশে একসারিতে কতগুলো সাইরাস গাছ আছে, মাথা নিচু করে দৌড়ে গিয়ে গাছগুলোর আড়ালে থামল সোহানা, পাথরগুলো একহাতে চেপে ধরেছে বুকের সঙ্গে। পায়ের কাছে পাথরগুলো নামিয়ে রেখে একটা তুলে নিল। গার্ড কোন্দিকে তাকিয়ে আছে দেখল। বুকপিঠ-খোলা অর্ধস্বচ্ছ ইভনিং গাউন পরিহিতা মহিলারা দ্রুত পায়ে হেঁটে যাচ্ছে যার যার গাড়ির দিকে। থলথল করছে কারও বুক, কারও নিতম্ব। গার্ডের নজর সেঁটে আছে ওই মহিলাদের ওপর। মুচকি হাসল সোহানা।

চট করে উঠে দাঁড়াল ও, কোনো নিশানা না করে হাতের পাথরটা ছুঁড়ে মারল সর্বশক্তিতে। একটা অর্ধচন্দ্র তৈরি করে পার্কিংলটের দিকে গেল ওটা। বসে পড়ল সোহানা, অপেক্ষা

করছে।

কিছুই হয়নি। একটার পর একটা গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে, দ্রুত গলায় কথা বলছে অতিথিরা, সিদোরভের গার্ডরা চেঁচাচ্ছে কখনও কখনও। এসব ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই।

আরেকটা পাথর তুলে নিয়ে একইভাবে ছুঁড়ে মারল সোহানা। আবারও মিস্ করল। কিছুই হলো না। তৃতীয় ও চতুর্থ পাথরেও কাজ হলো না।

পঞ্চম পাথরটা হাতে নিল ও, বিড়বিড় করে দোয়াদরুদ জাতীয় কিছু পড়ল, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে পাথরটা ছুঁড়ে মেরেই বসে পড়ল।

দু'সেকেণ্ড কাটল।

তারপর শোনা গেল কাঁচ ভাঙার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল কারা যেন। পরমুহূর্তেই প্যাঁ পোঁ করে বাজতে শুরু করল গাড়ির অ্যালার্ম সিস্টেম।

চমকে গেছে আস্তাবলের দরজায় দাঁড়ানো গার্ড, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না পার্কিংলটের দিকে আসবে কি আসবে না। বোঝা গেল ওকে শুধু আস্তাবল পাহারা দেয়ার জন্য বলা হয়েছে যাতে ওখানে কেউ ঢুকতে না পারে।

সোহানা দেখল, আস্তাবলের এককোনায় পৌঁছে গেছে রানা। চিতাবাঘের মতো চুপিসারে এগোচ্ছে গার্ডের দিকে।

আর অপেক্ষা করার দরকার নেই। উঠে দাঁড়াল সোহানা, সাইরাস গাছগুলোর আড়াল থেকে বের হলো। একছুটে গিয়ে দাঁড়াল লনে, তারপর একবার এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে খিচে দৌড় দিল পার্কিংলটের দিকে। পাথর ছোঁড়ার সময়ই ঠিক করেছে কোন গাড়িটা ছিনতাই করবে।

লনে সিদোরভের কয়েকজন অতিথি দাঁড়িয়ে আছে, ইভনিং গাউন-পরা সোহানাকে ছুটে আসতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল

ওরা। বুঝতে পারছে না মেয়েটা অতিথিদের কেউ কি না। যদি অতিথি না হবে তা হলে এখানে এল কী করে? আবার, কোনো অতিথির জামায় বা মুখে তো মাটির দাগ থাকার কথা না!

ওদের দিকে তাকালও না সোহানা, একছুটে হাজির হলো ২০১০ মডেলের কালো রঙের একটা উইযম্যান রোডস্টার স্পোর্টসকারের সামনে। রানার দিকে তাকাল।

গার্ডের ঘাড়ে প্রচণ্ড রদ্দা মেরে লোকটাকে অজ্ঞান করেছে রানা, অচেতন দেহটা ঢুকিয়ে দিয়েছে আস্তাবলের ভেতরে। এখন চার-পাঁচজন ভীত অতিথির সঙ্গে মিশে গিয়ে ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে আসছে পার্কিংলটের দিকে। রানার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে লোকগুলো। ওর কপাল আর গালের চামড়া ছড়ে গেছে, কোট-শার্ট জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। প্যান্টে, শার্টের বুকের কাছে মাটির দাগ।

ড্রাইভিংসীটের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সোহানা, পাশের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এদিকওদিক দেখতে দেখতে রানা বলল, 'দরজা খোলা?'

'না।'

গাড়ির ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখে নিল রানা। 'সরো তা হলে,' চট করে সোহানার পাশে চলে এল, লনটা এখন ওর পেছনে। কাঁধ থেকে একটা সাবমেশিনগান খসিয়ে ওটার বাঁট দিয়ে জোরে বাড়ি মারল ড্রাইভিংসীটের জানালায়।

সঙ্গে সঙ্গে আবারও প্যাঁ পোঁ শব্দ।

'চোর! চোর!' লনে দাঁড়িয়ে থাকা ষণ্ডামার্কা এক পুরুষ অতিথি চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছে!' ছুটে এল রানার দিকে।

'সোহানা, জলদি ওঠো!' কে চেঁচাচ্ছে দেখে নিয়ে জরুরি কণ্ঠে বলল রানা, সাবমেশিনগানটা ধরিয়ে দিল সোহানার হাতে।

উঠে পড়ল সোহানা।

ততক্ষণে ঝড়ের গতিতে রানার পেছনে হাজির হয়ে গেছে ষণ্ডা, লম্বায় রানার চেয়ে ইঞ্চি পাঁচেক বেশি। খুব হালকাভাবে নিল সে রানাকে, পেছন থেকে ডানহাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা, বাঁ হাত দিয়ে ডান কব্জি চেপে ধরে আস্তে আস্তে চাপ বাড়াচ্ছে—দম বন্ধ করে মারতে চায়।

শ্বাস নিতে আসলেই কষ্ট হচ্ছে রানার, তারপরও ষণ্ডার জন্য মায়া হলো ওর। পরিস্থিতির শিকার না হলে এ-রকম করত না ও।

দু'হাত তুলল রানা। ডান হাত দিয়ে ধরল ষণ্ডার ডান কনুই, বাঁ হাত দিয়ে ডান কব্জি। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টান মারল। আলগা হয়ে গেল ষণ্ডার প্যাঁচ, ভারসাম্য কিছুটা হারিয়ে ফেলেছে। শ্বাসনালীর উপর থেকে চাপ কমে যাওয়ামাত্র ডান জুতোর গোড়ালি দিয়ে পর পর তিনটে লাথি মারল রানা পেছনের দিকে—ষণ্ডার ডান হাঁটু, পায়ের নলি আর আঙুলের উপর। তৃতীয় লাথিটা খাওয়ার পর "বাবা রে" বলে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড় দু'হাতে ধরে ওকে নিচু করে ফেলল রানা। ডান হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড গুঁতো দিল নাকের তরুণাস্থিতে, জানে একটু পরই গলগল করে রক্ত বের হতে শুরু করবে নাক দিয়ে। ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল লোকটাকে, সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে চড়ে বসল উইযম্যানের ছাদে। পিছলে নামল আরেকপাশে। ততক্ষণে ওদিকের দরজা খুলে দিয়েছে সোহানা, রানা উঠে বসামাত্র অটো-স্টার্ট লেখা বাটনে চাপ দিল। কম্পন জাগল উইযম্যানের ইঞ্জিনে, জোরালো ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করতে শুরু করেছে।

লনে বেরিয়ে এসেছে সিদোরভের একাধিক গার্ড, প্রত্যেকের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। পার্কিংলটের গণ্ডগোল শুনে এবং রানা-সোহানাকে জোর করে উইযম্যানে উঠতে দেখে যা বোঝার বুঝে

নিয়েছে। 'সোহানা ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়ামাত্র গুলি করল একজন. তাড়াহুড়ো করায় স্পোর্টসকারের কাছ দিয়েও গেল না বুলেট। ততক্ষণে এক্সিলারেটররে চেপে বসেছে সোহানার পা।

বিস্তৃত লনটাকে হাতের বাঁয়ে রেখে ছুটল ওরা। আরও একবার গুলির শব্দ হলো, কিন্তু এবারও মিস্ করল সিদোরভের লোকেরা। দু'বার গিয়ার বদলে গাড়ির স্পিড পঞ্চাশে নিয়ে গেল সোহানা।

অতিথিদের গাড়ি সার বেঁধে বের হচ্ছে লোহার বিশাল খোলা গেট দিয়ে। ডানে-বাঁয়ে কেটে, একবার লনে উঠে তো পরেরবার ড্রাইভওয়ের আলগা নুড়িপাথর ছিটকে দিয়ে পাঁচটা গাড়িকে ওভারটেক করল সোহানা। আরেকটু হলেই বেরিয়ে যাবে।

লোহার গেটে চারজন গার্ড দেখা গেল, ওরা বুঝে গেছে কী করতে হবে। ম্যাগনাম বেরিয়ে এসেছে দু'জনের হাতে, বাকি দু'জন দৌড় দিয়েছে পুলিশবক্সের মতো দেখতে কন্ট্রোলরুমের দিকে। ম্যাগনামধারীদের একজন বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে, ধেয়ে-আসা উইযম্যানকে নিশানা করছে। ওকে সুযোগটা দিতে চাইল না রানা।

আস্তাবলের গার্ডকে কাবু করে লোকটার শোল্ডার-হোলস্টার থেকে দুটো সেমি-অটোমেটিক পিস্তল হাতিয়ে নিয়েছে ও, একটা বের করল। পর পর তিনবার গুলি করল। হাঁটু গেড়ে বসে-থাকা লোকটার সামনে ছিটকে উঠল নুড়িপাথর, চোখ বাঁচাতে বাঁ হাত তুলল সে কপালের কাছে। সে-সুযোগে স্টিয়ারিং ডানে ঘোরাল সোহানা, গতি কমায়নি একটুও।

কন্ট্রোলরুমের কাছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেল, ম্যাগনামের ট্রিগার টেনেছে আরেক গার্ড। একটা ফুটো তৈরি হলো উইযম্যানের উইণ্ডস্ক্রিনে, খসে পড়ল রিয়ার-ভিউ-মিরর। ডানদিকে কাত হয়ে গিয়েছিল রানা, ওই অবস্থাতেই আরও তিনবার গুলি

করল, উইণ্ডস্ক্রিনের যা খুশি হোক। ঝাঁকি খেল দ্বিতীয় গার্ড, দেখে মনে হলো কেউ যেন পেছন থেকে টান দিয়েছে ওর জামা ধরে।

খালি হয়ে গেছে ম্যাগাজিন, তাই হাত থেকে সেমি-অটোমেটিকটা ছেড়ে দিল রানা। পায়ের কাছে পড়ল ওটা। সোহানাকে যে সাবমেশিনগানটা দিয়েছিল ওটা নিল এবার।

প্রথম গার্ডটা সামলে নিয়েছে ইতিমধ্যে, একের পর এক গুলি করছে। চুরমার হলো গাড়ির টেইললাইট আর বাঁ দিকের মিরর, ট্রাঙ্কের গায়ে স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল দু'বার। পরোয়া করল না সোহানা, বার বার মোচড় দিচ্ছে স্টিয়ারিং-এ, ডান-বাম করতে করতে এগোচ্ছে উইযম্যান।

কণ্ট্রোলরুমে যে-দু'জন ঢুকেছে তাদের নিয়ত কী, জানে রানা। তাই সাবমেশিনগানটা খালি করে দিল কণ্ট্রোলরুমের উপর। কাজ হলো—গেট আটকানোর সুইচ চাপতে গিয়েও পারল না গার্ড দু'জন জানে বাঁচার তাগিদে।

লোহার গেটের একদিকের পাল্লার সঙ্গে ঘষা খেল দশ লক্ষ ডলার দামের স্পোর্টসকারের বাঁ দিকের বনেট, বুঁজে গেল ওদিকের হেডলাইট, বাঁ দিকের দরজার চলটা উঠে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল অ্যালুমিনিয়ামের সাদা বডি। স্টিয়ারিং সোজা করল সোহানা, খোলা দরজা দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে এল উইযম্যান, পেছন থেকে গুলির আওয়াজ আসছে এখনও। যথেষ্ট দূরে চলে এসেছে ওরা ইতিমধ্যে, এত রেঞ্জ কভার করতে পারে না ম্যাগনাম বা সেমি-অটোমেটিক।

গিয়ার বদল করল সোহানা, এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়াল। স্পিডোমিটারের কাঁটা আশির ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। নতুন আরেকটা দিনের আভাস জানিয়ে আলোর ক্ষীণ একটা রেখা ফুটে উঠছে আকাশে।

'কোন্দিকে যাবো?' জানতে চাইল সোহানা।

ড্যাশবোর্ডে একটা টাচস্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, একনজর দেখলেই বোঝা যায় সেটার সঙ্গে ইন্টারনেটের কানেকশন আছে। সুইচ টিপে ওটা চালু করল রানা। স্ক্রিনের নীচের দিকে দেখা গেল একটা অনস্ক্রিন কীবোর্ড, উপরে গুগল ক্রোমের ডিফল্ট অ্যাড্রেস-বার। গুগল ম্যাপে গেল রানা, সেভ্যাস্টাপোল লিখে ম্যাগনিফাইং-গ্লাসের আইকনে আঙুল ছোঁয়াল। কয়েক মুহূর্ত পরই পুরো শহরের একটা ম্যাপ হাজির হলো চোখের সামনে।

কোথায় আছে বুঝতে কিছুটা সময় ব্যয় হলো রানার। তারপর ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে বলল, 'এখন আমরা যেখানে আছি, আরেকটু আগে বাড়লে অ্যাডমিরাল নাখিমভের মনুমেণ্ট আসবে। ওটা ধরে এগোলে নাখিমভ অ্যাভিনিউ। শেষমাথায় একটা চৌরাস্তা দেখতে পাচ্ছি, সঙ্গে ম্যাগডোনাল্ড্স্-এর দোকান। ওটা ছাড়িয়ে তিন ব্লক এগোবে, তারপর ডানে যাবে। বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেল সেভ্যাস্টাপোল নামে একটা হোটেল আছে, ওখানে যাত্রাবিরতি করবো আমরা।'

'বেস্ট ওয়েস্টার্ন হোটেল বেছে নেয়ার কারণ?'

'ওটার পাশে একটা লেক দেখতে পাচ্ছি।'

'তো?'

'ঠেলে এই গাড়িটাকে ফেলে দেবো লেকে। চাই না পুলিশ কোনো ঝামেলা করুক।'

'সিদোরভ' কি পুলিশের সাহায্য নেবে?'

'নিতে পারে। আবার ওর নিজস্ব গুণ্ডাবাহিনীও পাঠাতে পারে। এ-মুহূর্তে কোনো চান্স নিতে চাচ্ছি না আমি।'

'আমরা কি হোটেলে উঠবো?'

'না। রেস্টুরেণ্টে অপেক্ষা করবো।'

'কেন?'

'অপির সঙ্গে যোগাযোগ করবো। একটা ভাড়া' করা

লিমাজিনের ব্যবস্থা করতে বলবো ওকে। কাছেই যোভা নামের একটা শহর দেখতে পাচ্ছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাজির হতে চাই সেখানে।'

লিমাজিনে করে উপকূলরেখা ধরে প্রায় এক শ' মাইল পাড়ি দিল ওরা। হাজির হলো যোভায়। মদ, মেয়েমানুষ, জুয়া আর বিলাসিতার জন্য খ্যাতি আছে শহরটার। বছরের বারো মাসই এখানে লোক গিজগিজ করে।

অপি হোটেল বুক করিয়ে রেখেছে আগেই, লিমাজিন থেকে নেমে সোজা হোটেলরুমে উঠে পড়ল ওরা। অপি বলেছে, আগের হোটেল থেকে ডিএইচএল-এর এক্সপ্রেস সার্ভিসের সহায়তায় রানা-সোহানার পাসপোর্ট, ক্রেডিট কার্ড আর লাগেজ পাঠানোর ব্যবস্থা করছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

জরুরি জিনিসগুলো হাতে পাওয়ামাত্র হোটেল ছাড়ল ওরা। তবে তার আগে ভালোমতো সাফসুতরো হয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরেছে, হোটেলের রেস্টুরেন্টে খাবার খেয়েছে। রুমভাড়া ইত্যাদি চুকিয়ে দিয়ে একটা প্রাইভেট চার্টারে করে পাড়ি দিল দু'জনে ইস্তাম্বুলের দিকে।

আসলে রানা চাইছে ওদেরকে যাতে কোনোভাবেই ট্রেস করতে না পারে সিদোরভের লোকেরা। তাই যেখানে থাকার কোনো মানে হয় না সেখানে সময় ব্যয় করছে ইচ্ছাকৃতভাবে।

ইস্তাম্বুলে নেমে যোগাযোগ করল ও মিসেস দেলফিনার সঙ্গে, বলল দেখা করতে চায়। রানা ভাবছে, আপাতত এমন কোনো জায়গায় থাকা দরকার যে-জায়গার কথা কল্পনাও করতে পারবে না সিদোরভের লোকেরা। মাফিয়াসর্দারের ল্যাবরেটরি থেকে নিয়ে-আসা প্রিন্টআউটটাও পাঠাতে হবে অপির কাছে।

খুশি মনেই রানা-সোহানার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন

মিসেস দেলফিনা।

ট্রেনে চেপে তুরস্ক থেকে ইটালিতে হাজির হলো ওরা। স্টেশনে ওদেরকে রিসিভ করতে এল টেনি জনসন—মিসেস দেলফিনার শোফার কাম বডিগার্ড।

তেরো

মনাকো

জিয়োভানেটা দেলফিনা'র লালচে-বাদামি রঙের চোখ দুটো চশমার গ্লাসের আড়াল থেকে তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। তাঁর খেয়ালও নেই, সামনে টি-টেবিলের উপর রাখা চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত মনোযোগ দিয়ে রানার কথা শুনছেন তিনি। এলবা দ্বীপে যা যা ঘটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছে রানা। তবে অ্যান্টোনিয়ো ভিনসেঞ্জোর সাহায্যের কথা বলল, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কথাটা চেপে গেল বিলকুল।

'অবিশ্বাস্য!' সব শুনে বললেন দেলফিনা, কণ্ঠে নিখাদ বিস্ময়। 'তোমাদের কাহিনি তো হলিউডের সিনেমাকেও হার মানায়!'

সকাল আটটা বাজে। ওরা তিনজন বসে আছে বেলা ভিস্তার সেই টানা বারান্দায় যেখানে আগেরবার কথা হয়েছিল দেলফিনার সঙ্গে। দূরে ভূমধ্যসাগরের মৃদু গর্জন। মনিব যেভাবে হাত বুলিয়ে দেয় পোষা কুকুরের মাথায়, চনমনে রোদ যেন সেভাবেই আদর করছে সাগরের ছোট ছোট ফেনিল ঢেউকে। দিনটা এককথায়

অপূর্ব।

'তোমার কাহিনি আমার ভালো লাগল, রানা,' বললেন দেলফিনা। 'তবে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে কোন্ বিষয়টা, জানো?'

'কোন্টা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভিনসেঞ্জোর দোষ সম্পূর্ণ গোপন করে গেছ তুমি।'

ভ্রূ কুঁচকে গেল রানার। 'তার মানে...'

মিষ্টি করে হাসলেন দেলফিনা। 'হ্যাঁ, তোমরা আসার অনেক আগেই ভিনসেঞ্জো যোগাযোগ করেছে আমার সঙ্গে। গল্পটা মোটামুটি জানিয়েছে আমাকে। শুধু তা-ই না, তোমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তা-ও স্বীকার করেছে। এবং ক্ষমা চেয়েছে আমার কাছে। আমি কী বলেছি জানো? বলেছি, রানা-সোহানা যদি তোমাকে ক্ষমা করে তা হলে আমিও ক্ষমা করে দেবো।'

'ক্ষমা করার প্রশ্নই আসে না,' বলে উঠল সোহানা। 'কারণ ভিনসেঞ্জোর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই আমাদের। ভুল করেছেন তিনি, শুধরেও নিয়েছেন সময়মতো। শেষে গুইসেপ লুসিয়ানোকে আটকে রাখার মতো দুঃসাহস দেখিয়েছেন।'

আরও একবার নিঃশব্দে হাসলেন দেলফিনা। 'লুসিয়ানোকে ঘোল খাইয়েছে ভিনসেঞ্জো।'

'কীভাবে?' জানতে চাইল সোহানা।

'ইটালিয়ান সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে। শয়তানটার বিরুদ্ধে অ্যাটেম্প্টেড মার্ডারের মামলা ঠুকে দিয়েছে। সাক্ষী হিসেবে যোগাড় করেছে নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে। এবার লুসিয়ানো টের পাবে কত ধানে কত চাল। কাজের কথায় আসি এবার,' চায়ের কাপ টেনে নিলেন দেলফিনা, চুমুক দিয়ে বুঝলেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে চা। 'লোরনের ডায়েরিটা কোনো কাজে লাগল?'

'অনেক কাজে লাগছে এবং লাগবে,' জবাব দিল সোহানা। 'ওটা আসলে একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য। ওটাতে যে-কোড ব্যবহার করেছেন তিনি, তা শুধু জটিলই নয়, আমার মনে হয় পর্যায়ক্রমিকও। তবে সে-কোড বোঝার ক্ষমতা যদি কারও থেকে থাকে, সে হচ্ছে আমাদের অপি।'

'তোমাদের এবারকার অ্যাডভেঞ্চারে অনেক কাজে লাগছে মেয়েটা। আমিও আশা করি কোডটা ব্রেক করুক সে।'

এমন সময় বারান্দায় হাজির হলো জনসন। পরিপাটি লোক সে, আচরণে আভিজাত্য আর বিনয় আছে। বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চেয়ে বলল, 'স্টাডিরুমে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।' রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার সহকর্মী কথা বলতে চাচ্ছেন আপনার সঙ্গে।'

সিদোরভের ল্যাবরেটরি রুম থেকে পাওয়া প্রিন্ট-আউটটা ইতিমধ্যে অপির কাছে ফ্যাক্স করেছে রানা। দেলফিনাকে আপাতত বিদায় জানিয়ে তাঁর স্টাডিরুমে ঢুকল ও সোহানাকে নিয়ে। দরজা পর্যন্ত এল জনসন, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল।

বাগানের দিকে মুখ করে-থাকা একটা মেহগনি কাঠের ডেস্কের উপর রাখা আছে দেলফিনার ল্যাপটপ। ওটা চালু করেছে জনসন, ইন্টারনেট সংযোগও। দুটো ক্লাব চেয়ার এনে রেখেছে ল্যাপটপের সামনে। বসল রানা-সোহানা।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে অপিকে। একটা মগে টি-ব্যাগ ডুবিয়ে চা খাচ্ছে। ধোঁয়া উঠছে মগ থেকে। 'গুড মর্নিং, রানা-সোহানাকে দেখতে পেয়ে হেসে বলল।

'মর্নিং, অপি,' রানা বলল।

'কোন্ খবরটা আগে শুনতে চান? ভালোটা, না খারাপটা?'

'তোমার যেটা খুশি।'

'যে-প্রিন্টআউটটা ফ্যাক্স করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন সেটা কাজে লেগেছে ইমেজটা বেশ ভালো, হাই রেজোল্যুশন। ওটা দিয়ে কোডের পরের লাইনগুলোর মানে বের করতে পেরেছি। কিন্তু খারাপ খবর হচ্ছে, মানে বের করে কী মানে বের করেছি তা-ই বুঝতে পারছি না।' টেবিলের উপর থেকে একটা ক্লিপবোর্ড টেনে নিল অপি, দেখে দেখে পড়ল, 'অ্যাঙ্গুয়িশ্ড হাউস ফেলোস ইন অ্যাম্বার ট্র্যাপ্ড/ট্যাসিলো অ্যাণ্ড পিপেয়ার গিবাস বাইয়া কিপ সেফ দ্য প্লেস অভ হাজ/দ্য জিনিয়াস অভ আইওনিয়া, হিজ স্ট্রাইড আ ব্যাটল অভ রাইভালস/আ ট্রায়ো অভ কইন্স, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল পয়েণ্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'পুরোটা ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিয়েছি আপনাকে, মাসুদ ভাই। গতবারের ধাঁধাটার চেয়ে এবারেরটা বেশি জটিল মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'আমার কাছেও,' স্বীকার করল সোহানা। ইতিমধ্যেই আনমনা হয়ে পড়েছে, ভাবতে শুরু করেছে নতুন ধাঁধাটা নিয়ে।

রানা বলল, 'অপি, শেষ লাইনে একটা শব্দ বললে, কইন্স। ওটা কি আসলে কয়েনস হবে?'

'না, মাসুদ ভাই। বানানটা হচ্ছে, কিউ ইউ ও আই এন এস।'

'তুমি শিয়োর?'

'শিয়োর। তিনবার চেক করেছি। কেন?'

'আমি যতদূর জানি, কইন্ হলো একটা আর্কিটেকচারাল টার্ম। এর দুটো মানে আছে। এক, কোনো খিলানের ঠেকা দেয়া বড় পাথর বা খুঁটি দুই, বাইরের কোনার দিকের বড় পাথর।'

'কিন্তু সেটা কোন্ খিলান?' জানতে চাইল সোহানা।

ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রানা। 'সেটা জানতে পারলে তো কাজ হয়েই গিয়েছিল।'

দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ পাওয়া গেল. ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা-সোহানা। অপির চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেছে। বলল, 'মাসুদ ভাই, শব্দটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছি আমি। আরও মানে পেয়েছি। যেমন প্রিন্টিং এবং নেভাল ওয়ারফেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ আছে শব্দটার। কোনো হ্যাণ্ডসেট টাইপকে জায়গামতো ধরে রাখার জন্য যে-ডিভাইস ব্যবহার করা হয় তাকে কইন বলে। আবার, কোনো কামানের নল ওঠানামা করানোর জন্য যে-ব্লক ব্যবহার করা হয় তার নামও কইন।'

'ব্লক বলতে তুমি কি কীলক বোঝাতে চাইছ?' সরু চোখে স্ক্রিনের দিকে তাকাল সোহানা।

'হতে পারে। আমি শিওর না।'

রানা বলল, 'ওটা যদি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা হলে তার মানে যে-কোনো কিছুই হতে পারে।'

'অর্থাৎ আগের লাইনগুলোর সমাধান করতে হবে আগে,' বলে স্ক্রিনের দিকে তাকাল সোহানা। 'ঠিক আছে, অপি, ধন্যবাদ। আমরা আমাদের মতো কাজ শুরু করি এবার।'

'একটু দাঁড়ান, আরও কিছু কথা আছে আমার।'

উৎসুক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল রানা-সোহানা।

'লোরনের ডায়েরিটা নিয়েও কাজ করেছি আমি। আমার মনে হয় ছোট দুটো রহস্যের সমাধান করতে পেরেছি। এক, জানতে পেরেছি কেন তিনি আর নেপোলিয়ন মিলে বড় বড় চিহ্নযুক্ত ম্যাপ তৈরি না করে জটিল একটা ধাঁধা বানাতে গেলেন।'

'কেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'লোরন বলেছেন, ওয়াটার লু'র যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর থেকে প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগছিলেন নেপোলিয়ন। তখন একদিন লোরনের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় বলেন, নিজের নিয়তি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এবার যদি নির্বাসন দেয়া হয় তা হলে

আর কোনোদিন মুক্তি পাবেন না। নির্বাসনকালীন সময়েই নাকি তাঁর মৃত্যু হবে।'

'ইতিহাস তা-ই বলে,' মন্তব্য করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল অপি। 'নেপোলিয়ন যখন থাকবেন না তখন তাঁর সহায়সম্পত্তির কী হবে তা নিয়ে ভাবতে শুরু করেন তিনি। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মেরি লুইসের ঘরে একটা ছেলে ছিল তাঁর—নেপোলিয়ন ফ্রান্সিস জোসেফ চার্লস ওরফে দ্বিতীয় নেপোলিয়ন। ওয়াটার লু'র যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর ছেলের কাছে সিংহাসন ছেড়ে দেন নেপোলিয়ন। ছেলেটা দু'সপ্তাহের মতো দেশ চালায়, তারপর মিত্রবাহিনী ঢুকে পড়ে প্যারিসে এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত করে।' থামল সে, একটা ডায়েরি টেনে নিয়ে সেটার কয়েকটা পাতা উল্টিয়ে দেখে নিল। তারপর বলতে লাগল, 'ঘটনা শুনে মন ভেঙে যায় নেপোলিয়নের। শুধু তা-ই না, ছেলের ওপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। উপলব্ধি করেন, ছেলেটা যদি একজন "বোনাপার্টের" মতো সাহস দেখাত তা হলে এমনটা ঘটত না। অথচ হাস্যকর হলেও সত্য, ছেলেটার বয়স তখন মাত্র চার বছর।'

রানা-সোহানা কোনো মন্তব্য করল না ওই ব্যাপারে।

'তাই লোরনকে নিজের বিশেষ একটা সম্পত্তির ব্যাপারে বিশেষ একধরনের ম্যাপ তৈরি করার নির্দেশ দিলেন নেপোলিয়ন,' বলছে অপি, 'যেটা আসলে একটা ধাঁধা। অথবা বলা যায় কতগুলো ধাঁধার সমষ্টি। নেপোলিয়নের ভাষাতেই বলি, "এই ম্যাপ আমার শত্রুদের বিভ্রান্ত করে দেবে। নতুন সম্রাটের সাহস আর প্রজ্ঞা বাড়াবে। সে যদি এই ধাঁধার সমাধান করতে পারে তা হলে বোনাপার্ট নামটার প্রতি সুবিচার করা হবে।"'

'দ্বিতীয় নেপোলিয়ন সুবিচারটা করতে পারেনি, তা-ই না?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'না, পারেনি,' মাথা নাড়ল অপি। 'সিংহাসনচ্যুত করার কয়েকদিনের মধ্যেই একরকম ধরেবেঁধে অস্ট্রিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয় তাকে। সান্ত্বনা হিসেবে ভূষিত করা হয় সম্মানসূচক ডিউক উপাধিতে। কিন্তু আসলে সে ছিল রাজবন্দি। ছেলেটার যক্ষ্মা ছিল, ওই অসুখে ভুগতে ভুগতে আঠারো শ' বত্রিশ সালে মারা যায়। যতদূর জানতে পেরেছি, ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টাই করেনি সে কখনও। এমনকী নেপোলিয়নের-বানানো ধাঁধাটার সমাধানেও আগ্রহ ছিল না তার। এ-বিষয়ে লোরনের ডায়েরিতে মন্তব্য নেই কোনও।'

'আর দ্বিতীয় রহস্য?' জানতে চাইল রানা।

'ধাঁধার ক্লু হিসেবে ওয়াইনের বোতল কেন বেছে নিলেন নেপোলিয়ন আর লোরন।'

নড়েচড়ে বসল সোহানা। 'কেন?'

'নেপোলিয়ন ভেবে দেখেন মদ ফুরিয়ে যাবে কিন্তু বোতল থেকে যাবে আরও কয়েক শ' বছর, অন্তত যারা কদর বোঝে তাদের কাছে। যেখানে লুকিয়ে রাখার কথা ছিল বোতলগুলোকে সেখান থেকে যদি কখনও আবিষ্কৃত হয়ও, কোনো-না-কোনো যাদুঘরে ঠাঁই হবে ওগুলোর। কিন্তু বোতলগুলোয় যে গোপনকথা ছিল তা গোপনই থাকবে, যতদিন না তাঁর কোনো বংশধর সব জানতে পেরে খোঁজাখুঁজি শুরু করবে।'

'তার মানে ছেলের তথাকথিত "প্রজ্ঞার" উপর আসলে ভরসা ছিল না সম্রাট নেপোলিয়নের,' সোহানার মন্তব্য।

'সম্ভবত। নেপোলিয়ন আর লোরন মিলে যে-পরিকল্পনা করেছিলেন, এত বছর পর তার কিছুটা আঁচ করতে পারছি আমরা।'

'আমরা শব্দটার মধ্যে সিদোরভও আছে,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

'আচ্ছা অপি, কী লুকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন নেপোলিয়ন আর লোরন তার কোনো আভাস নেই লোরনের ডায়েরিতে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

মাথা নাড়ল অপি। 'না, নেই। আর থাকলেও আমি বুঝতে পারিনি।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'তোমার কী ধারণা? কী লুকিয়ে রাখার জন্য এমনকী ছেলের সঙ্গেও হেঁয়ালি করেছেন নেপোলিয়ন? টাকা?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'না, আমার মনে হয় টাকা না। অন্য কিছু।'

'কী?'

'এমন কিছু যা বেচলে অনেক টাকা পাওয়া যেতে পারে। একটা কথা ভেবে দেখো। নেপোলিয়নের রক্তে মিশে ছিল যুদ্ধ আর দখলদারিত্ব। সিংহাসন হারিয়েছিলেন তিনি। ওটা ফিরে পাওয়ার চিন্তা তাঁর মাথায় সবসময়ের জন্য ঘুরপাক খাওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জানতেন ওই কাজ তাঁর দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ সেইন্ট হেলেনায় তিনি আজীবনের জন্য বন্দি। তাই চেয়েছিলেন তাঁর বংশধরদের কেউ বসুক ফ্রান্সের সিংহাসনে, আবার ছড়ি ঘোরাক পুরো ইউরোপের মাথার উপর। কাজটা করতে হলে বিশাল এক সেনাবাহিনীর দরকার হবে। কে না জানে যত বড় বাহিনী তত বেশি খরচ? আজ যে টাকা বাজারে চলছে, বিশ-ত্রিশ বছর পর তা অচল মুদ্রায় পরিণত হতে পারে। তাই নেপোলিয়নের মতো পোড় খাওয়া লোক টাকা লুকিয়ে রাখার প্ল্যান করবে না।'

নেট চ্যাটিং থেকে সাইন অফ করল রানা। চুপ করে বসে আছে। সোহানাও কিছু বলছে না। স্টাডিরুমের ভিতরে অখণ্ড নীরবতা।

চেয়ারে হেলান দিল রানা, দু'হাতের আঙুলগুলো খাঁজে খাঁজে ঢুকিয়ে তালুর উপর ছেড়ে দিল মাথার ভার। আড়চোখে তাকাল সোহানার দিকে। চিন্তার রাজ্যে হারিয়ে গেছে ও। ওকে বিরক্ত না করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। কী ভেবে তুলে নিল স্যাটেলাইট ফোনটা। আর ঠিক তখনই বেজে উঠল ওটা। স্ক্রিনের দিকে তাকাল রানা। সোহেল। রিসিভ বাটনে চাপ দেয়ার আগে আবারও সোহানার দিকে তাকাল রানা। চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেছে ওর, রানার দিকেই তাকিয়ে আছে।

ফোনটা রিসিভ করে স্পীকার মোডে দিল রানা। 'কী খবর?'

'ভালো। তোদের কী অবস্থা?'

'চলছে। মনে হচ্ছে কিছু জানানোর জন্য ফোন করেছিস।'

'ঠিক। সিদোরভের ইতিহাস জানিস তোরা। এ-ও জানিস, ইরানি ইন্টেলিজেন্সের এক কর্নেলের ছত্রছায়ায় থাকার কারণে রাশান বাহিনীকে নাকানিচুবানি খাওয়াতে পেরেছিল সে। ওই কর্নেলের নাম জানতে পেরেছি।'

নড়েচড়ে বসল রানা। 'কী?'

'তৌফিক হাশেমী। তবে শুধু হাশেমী বা কর্নেল নামে বেশি পরিচিত।'

'জানতে পারলি কীভাবে?'

'লোক পাঠিয়েছিলাম ওর কাছে। মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থে ইরানি ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে কিছু কাজ করেছে বিসিআই। আমাদের কয়েকজন এজেন্ট ওদের বিশেষ পরিচিত।' একটু থেমে আবার বলতে লাগল সোহেল, 'রাশা টুকরো টুকরো হওয়ার এত বছর পর অর্গানাইজেশনে সক্রিয় কোনো ভূমিকা নেই হাশেমীর অবসর নিয়েছে। তবে উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছে।'

রানা বুঝতে পারছে শুধু কর্নেলের নাম জানানোর জন্য ফোন করেনি সোহেল। বলল, 'তারপর?'

'আমাদের লোকের কাছে প্রথমে গাঁইগুঁই করছিল হাশেমী। মুখ খুলতে চাচ্ছিল না। বেশি কিছু বলেওনি। তবে স্বীকার করেছে সিদোরভের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার। তবে সেটা ঠিক কখন তা নাকি সঠিকভাবে মনে করতে পারছে না'। ন্যাকামো! যা-হোক, কথাপ্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে লোকটা। জনৈক প্রাচীন পারস্য রাজার কাহিনি নাকি গভীর ছাপ ফেলেছিল সিদোরভের মনে। এতই বেশি যে, একসময় নিজেকে ওই রাজার বংশধর ভাবতে শুরু করে সে। ওই রাজার নামও জানতে পেরেছি...'

'প্রথম যারক্সিয়,' সোহেলের কথা শেষ করে দিল রানা।

'জানিস দেখছি। সিদোরভ আসলেই যারক্সিয়েের বংশধর কি না, হাশেমীকে জিজ্ঞেস করেছিল আমাদের এজেণ্ট। জবাবে সরাসরি কিছু বলেনি গভীর-জলের-মাছটা। শুধু বলেছে, হতে পারে, সে-সম্ভাবনা নাকি উড়িয়ে দেয়া যায় না। আমাদের এজেণ্ট আসলে টোপ গেলাতে পারেনি ওকে।

'তারপর?'

'কাজ হবে না বুঝে ফিরে আসে আমাদের এজেণ্ট। সিদোরভের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে শুরু করে। তখন আজব এক খবর বেরিয়ে আসে। লোকটা নিজের চোদ্দগুষ্ঠির ইতিহাস জানতে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করেছে। শেষপর্যন্ত নাকি নিশ্চিত হয়েছে প্রথম যারক্সিয়যই ওর পূর্বপুরুষ। কিন্তু আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে ব্যাপারটা নিয়ে। যাদের পেছনে এত টাকা খরচ করেছে সে, তারা আসলে ভয়ের চোটে সত্যি কথাটা জানাতে চায়নি ওকে। তাই সে যা জানতে পারলে খুশি হবে তা-ই বলে দিয়েছে।'

'ব্যাপারটা সিদোরভের বংশমর্যাদার সঙ্গে জড়িত,' বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল রানা মার্সেই-এ বলা মেলিখানের কিছু কথা,

'অনেকদিন আগে একটা কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। এখন সেটা শেষ করার চেষ্টা করছেন।'

'কী বললি?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'কিছু না। কাজের কথায় আসি। আসলে কী খুঁজছে সিদোরভ? অনেক বছর আগে রাজা যারক্সিয হারিয়ে ফেলেছিলেন এমন কিছু?'

'জানি না, দোস্ত। প্রশ্নটার জবাব খুঁজে বের করতে হবে তোদেরকেই। কী খুঁজছে সে তা জানতে পারলে ধরে নে তোদের অর্ধেক কাজ শেষ আরেকটা কথা। নিজেকে মনেপ্রাণে যারক্সিয়ের বংশধর বলে বিশ্বাস করে লোকটা' কাজেই যা খুঁজছে, ধরেই নিয়েছে তার উপর ওর যৌক্তিক অধিকার আছে। এ-অধিকার কিছুতেই ছাড়তে চাইবে না লোকটা। প্রয়োজনে তোদেরকে খুন করতে অথবা করাতে দ্বিধা করবে না। আগেও সে-চেষ্টা করেছে, ভবিষ্যতেও করবে।'

'সতর্ক করার জন্য ধন্যবাদ। আত্মরক্ষা করতে জানি আমরা। ওসব নিয়ে ভাবছি না। আমার মাথায় এখন একটা প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে।'

'কী?'

'রাজা যারক্সিয আর তাঁর অ্যাকিমেনিড সাম্রাজ্যের সঙ্গে নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের সম্পর্কটা কী?'

ফোনটা বাজছে। চোখ খুলল রানা। ঘর অন্ধকার। অভ্যাসবশত হাত চলে গেল বালিশের নীচে। প্রিয় ওয়ালথারটা নেই, আনা হয়নি। বিপদ হয়নি বুঝতে পেরে হাতটা বের করে আনল রানা। উঠে বসে হাতঘড়ি দেখল। রাত তিনটা। এ-সময়ে কারও ফোন করার কথা না। কে হতে পারে? ভাবতে ভাবতে অলস ভঙ্গিতে ফোনটা নিল বেডসাইড টেবিলের উপর থেকে। আশ্চর্য! কলার

আইডি'র জায়গায় ইংরেজিতে বড়হাতের অক্ষরে দেখা যাচ্ছে: ব্লকড্।

সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল রানা। রিসিভ বাটনে চাপ দেয়ার আগে দ্রুত ঘাড় ঘোরাল এদিকে-ওদিকে। তারপর কলটা রিসিভ করে বলল, 'হ্যালো?'

'ভাবলাম এবার তোমার সঙ্গে সরাসরিই কথা বলি। আমাদের মাঝখানে কাউকে না রাখাই ভালো, না কি?'

কে ফোন করেছে বুঝতে এক সেকেণ্ডও লাগল না রানার। ঘুম চলে গেছে চোখ থেকে, পিঠ সোজা হয়ে গেছে আপনাআপনি। বলল, 'এটা ঠিক নয়, সিদোরভ।'

'কোন্‌টা?' সিদোরভের গলা পরিহাস-তরল।

'অসময়ে ফোন দিয়ে মানুষকে ঘুম থেকে জাগানোটা।'

'আমার লোকেরা তোমার যেমন বর্ণনা দিয়েছে, আমাদেরকে যেভাবে নাকানিচুবানি খাওয়াচ্ছ, তাতে মনে হয় না হার্টের সমস্যা আছে তোমার। বেশি রাতে ফোন দিয়ে ফেলেছি? যেখানে আছো, ক'টা বাজে সেখানে?'

সহজ ফাঁদ, এড়িয়ে গিয়ে রানা বলল, 'রাতে ফোন দিয়েছ তা কিন্তু বলিনি। আমার নম্বর পেলে কীভাবে?'

হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। 'আগে লোকে বলত, টাকা দিলে বাঘের চোখ পাওয়া যায়। এখন যে-জমানা এসেছে, টাকা পেলে মা ছেলেকে চিনতে চায় না। তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছ?'

'তুমি দেখছি জমানা-বিশেষজ্ঞ!'

কথার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে সোহানার। উঠে বসে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। আবছা অন্ধকারেও দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা যাচ্ছে ওর চেহারায়।

'তুমিও অনেক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, মিস্টার রানা। আমার

পার্টিতে তোমার বান্ধবীকে নিয়ে এসেছিলে, না?'

'হ্যাঁ, সোর্ডরুমে যখন লেকচার মারছিলে তখন তোমার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোমার বাচনভঙ্গি সুন্দর। আর খুব গুছিয়ে কথা বলতে পারো। ভেবো না তেল মারছি।'

'আমিও একটা কথা বলি, ভেবো না তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলছি। তোমার সাহস আছে। তোমার জায়গায় অন্য কেউ হলে...'

'এতক্ষণে লাশ হয়ে যেত। কাজের কথায় এসো, সিদোরভ। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'শেষবারের মতো সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, রানা। শেষবারের মতো বন্ধুত্বের হাত বাড়াচ্ছি। এসো একসঙ্গে কাজ করি। তোমরা অ্যান্টিকশিকারী, কথা দিচ্ছি আমি যা খুঁজছি তা পেয়ে যাওয়ার পর নেপোলিয়নের বোতলগুলো দিয়ে দেবো তোমাদেরকে। ইচ্ছামতো দাম হাঁকতে পারবে। আর যদি লণ্ডন বা ফ্রান্সের কোনো নিলামঘরে তুলতে পারো, রাতারাতি মিলিয়নিয়ার হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সবগুলো বোতল দিয়ে দেয়া হবে তোমাদেরকে। তোমাদের গায়ে ফুলের টোকাটাও দেবে না কেউ। তোমাদের গায়ে হাত না দেবার আরেকটা কারণ: এখন আমি জানি তোমরা আসলে কে। তোমাদের খুন করে বাকি জীবন বিসিআই-এর সবকটা ভীমরুলের তাড়া খেয়ে দুনিয়াময় পালিয়ে বেড়াতে চাই না।'

'তুমি আসলে কী খুঁজছ, সিদোরভ?' জানে প্রশ্নটার জবাব পাবে না, তারপরও জিজ্ঞেস করল রানা।

কিছু বলল না সিদোরভ।

'তোমার সেই পাতাল-যাদুঘরে বোধহয় জায়গা হবে না জিনিসটার?' আবারও বলল রানা। 'ঘরটার একটা নাম দিয়েছি আমি, বলেছি? ব্যক্তিগত পারস্য-প্রমোদকক্ষ।'

'বেশি জানাটা কিন্তু ভালো না, মিস্টার রানা,' সিদোরভের গলা ভারী হয়েছে। 'এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আলফ্রেড হিচককের "দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ" ছবিটা দেখোনি?'

'দেখেছি। ওই ছবিতে কিন্তু যে-লোকটা বেশি জানত তার সমস্যা হয়নি শেষপর্যন্ত। বরং ভিলেনরাই ফেঁসে গিয়েছিল। যা-হোক, তোমার প্রস্তাবের জবাবে বিনয়ের সঙ্গে বলছি, তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তোমাকে সাহায্যও করতে পারবো না। কারণ যা খুঁজছ তা পাওয়ার পর আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে না তুমি। রাজ-গোক্ষুরকে বিশ্বাস করা যায়, সিদোরভ, কিন্তু তোমাকে না। শেষ একটা কথা বলি: যারক্সিয়- প্রেম মাথাটা একেবারে খারাপ করে দিয়েছে তোমার। ধর্ম যদি মানো, সবাই আমরা আদমের বংশধর; আর যদি না মানো— বনমানুষের। তোমার ওই যারক্সিযও। রাখি এবার। দয়া করে আর ফোন কোরো না।' লাইন কেটে দিল রানা।

শুয়ে পড়ল সোহানা। কম্বলটা টেনে নিল গলা পর্যন্ত। মুচকি হেসে বলল, 'ব্যক্তিগত পারস্য-প্রমোদকক্ষ? ভাল নাম দিয়েছ তো!'

'সুযোগ পেয়ে এক হাত নিলাম আর কী,' শুয়ে পড়ল রানাও।

চোদ্দ

সকালে নাস্তা করেই দেলফিনার স্টাডিরুমে গিয়ে ঢুকল রানা-সোহানা। আশা করছে ভদ্রমহিলার ল্যাপটপ আর ইন্টারনেট

কানেকশনটা যথেষ্ট কাজে লাগবে এখন।

অনেক সাহায্য করছেন দেলফিনা। জনসনকে আদেশ দিয়েছেন যখন যা লাগে রানা-সোহানার, যত তাড়াতাড়ি পারে যেন জোগাড় করে দেয়। তাই বাড়তি একটা ল্যাপটপ পেয়ে গেছে ওরা। পেয়েছে কাগজ-কলম, ড্রাই-ইরেজ মার্কার এবং একটা ছ'ফুট বাই চার ফুটের ড্রাই-ইরেজ বোর্ড। বোর্ডটাতে বড় বড় করে ধাঁধাটা লিখেছে রানা:

অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্ হাউস ফেলোস ইন অ্যাম্বার ট্র্যাপ্‌ড্

ট্যাসিলো অ্যাণ্ড পিপেয়ার গিবাস বাইয়া কিপ সেফ দ্য প্লেস অভ হাজ

দ্য জিনিয়াস অভ আইওনিয়া, হিজ স্ট্রাইড আ ব্যাটল অভ রাইভালস

আ ট্রায়ো অভ কইন্‌স্, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল পয়েন্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা

বোর্ডটার দিকে একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। একসময় খেয়াল করল, পুরো ধাঁধায় ষোলোটা শব্দ আছে যেগুলো একাধিক অর্থ বহন করে: অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্, হাউস, ফেলোস, ট্র্যাপ্‌ড্, গিবাস, কিপ, সেফ, প্লেস, হাজ, জিনিয়াস, স্ট্রাইড, ব্যাটল, রাইভালস, ট্রায়ো, পয়েন্ট, ওয়ে।

প্রতিটা শব্দের অর্থ ধরে ধরে বের হলো আরও ডজন ডজন শব্দ। প্রতিটা শব্দের পাশে দাগ টেনে টেনে ছোট করে প্রতিটা মানে লিখল রানা। তারপর সোহানাকে বলল, 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছ? ইতিহাস বা ঐতিহাসিক জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ আছে এ-রকম একাধিক শব্দ আছে ধাঁধাটায়।'

'যেমন?' জানতে চাইল সোহানা।

'অ্যাম্বার। টাসিলো। বাইয়া। হাজ। জিনিয়াস। আয়োনিয়া। কইন্‌স্‌।'

'এক কাজ করো না। এ-শব্দগুলোও লিখে ফেলো বোর্ডে। আরেকটা আলাদা কলাম ব্যবহার করো এগুলোর জন্যে।'

ভালো বলেছে সোহানা, ভেবে দেখল রানা। বোর্ডে আলাদা একটা কলামে লিখল শব্দগুলো। তারপর এসে বসে পড়ল ল্যাপটপের সামনে। গুগলে সার্চ শুরু করল নতুন কলামের প্রতিটা শব্দ।

রেজাল্ট পেতে সময় লাগল না। অ্যাম্বার, টাসিলো, বাইয়া, হাজ, আইওনিয়া—এ-পাঁচটা শব্দের সঙ্গে যোগাযোগ আছে সুপরিচিত জায়গা, ব্যক্তি বা বস্তুর।

অ্যাম্বার হলো জীবাশ্ম রঞ্জন যা রত্নখচিত অলঙ্কারে ব্যবহৃত হয়। বাভারিয়ান রাজাদের বংশপরম্পরার লম্বা সারিকে একশব্দে বলা হয় টাসিলো। আর হাজ মানে হজ্ব—ইসলামী শরীয়তের পঞ্চম স্তম্ভ। ইউরোপের কোনো কোনো দেশে এককালে স্বশাসিত ছোট ছোট প্রশাসনিক রাজ্য ছিল; মলদোভা নদীর তীরবর্তী রুমানিয়ার এ-রকম একটা রাজ্যের নাম বাইয়া, প্রাচীন রোমান ভাষায় যার মানে "আমার"। আর, গ্রীস ও এশিয়া মাইনরের মধ্যবর্তী উত্তর ঈজিয়ান সাগরের একটা দ্বীপের নাম আইওনিয়া।

"ঐতিহাসিক" পাঁচটা শব্দ এবং সেগুলোর অর্থ নোটবুকে টুকে নিল সোহানা। তারপর চুপ করে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল শব্দগুলোর দিকে। বিশেষ কোনো কিছু চোখে পড়ে কি না দেখছে। কিন্তু সে-রকম কিছু বের করতে পারল না।

সারাটা দিন ওই ধাঁধা নিয়েই থাকল রানা-সোহানা। স্টাডিরুমেই লাঞ্চ দিয়ে গেছে জনসন, খেয়ে নিয়েছে ওরা লাগোয়া বাথরুম আছে তাই বাইরে যাওয়ার দরকার নেই।

লাঞ্চের পর একটা ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিল রানা

খানিকটা সময় জিরিয়ে নিতে চায়। সোহানাকেও বলল বিশ্রাম নিতে, কিন্তু সোহানা জানিয়ে দিল: দরকার নেই।

স্টাডিরুমের সঙ্গে একটা ব্যালকনি আছে, বড় একটা থাই দরজা পার হয়ে সেখানে যেতে হয়। দরজাটার দিকে মুখ করে ঘুমিয়ে পড়েছিল রানা। যখন চোখ খুলল ও ততক্ষণে দুপুর গড়িয়ে গেছে। ব্যালকনিটার দিকে তাকিয়ে বুঝল, বাইরে জোর বাতাস বইছে। গাছের ডালগুলো দুলছে ক্রমাগত, ছটফট করছে পাতাগুলো। আলো জ্বালেনি সোহানা, ঘরে তাই অন্ধকার।

ঘাড় ঘুরাল রানা। এখনও কাজ করছে সোহানা। কাজ করছে মানে কী যেন লিখছে নোটবুকে। লেখার ভঙ্গিটা খুকিদের মতো। খাতাটা টেনে নিয়েছে খুব কাছে, বাঁ হাতের উপর ছেড়ে দিয়েছে মাথার ভার। ঘাড়টা কাত হয়ে আছে একদিকে।

উঠল রানা, নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সোহানার পাশে। ওকে দেখেই বলে উঠল সোহানা, 'আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয়, পুরো ধাঁধার মানে একবারে বের করার চেয়ে একটা একটা করে লাইন নিয়ে কাজ করা উচিত আমাদের। তা হলে সব একসঙ্গে মিলে গিয়ে জট পাকাবে না। তুমি কী বলো?'

মিষ্টি করে হাসল রানা। 'আমি বলি, এবার ওঠো। কেউ সময় বেঁধে দেয়নি আমাদেরকে। এত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। চলো বাইরে যাই, মিসেস দেলফিনার বাগানে একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি। মগজটা চাঙা হবে। তারপর কফি খাবো দু'জনে পাশাপাশি বসে। ধাঁধার ব্যাপারটা ভুলে যাও আপাতত।'

'ট্যাসিলো অ্যাণ্ড পিপেয়ার গিবাস বাইয়া কিপ সেফ দ্য প্লেস অভ হাজ,' আনমনে বলল সোহানা, হাতেধরা পেন্সিল দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি দিচ্ছে চাঁদিতে। 'পিপেয়ার মানে ফরাসি ভাষায় গ্র্যাণ্ডফাদার।'

কফি. খেয়ে আবার স্টাডিরুমে বসেছে দু'জনে। ব্যালকনিসংলগ্ন থাই দরজা খুলে দিয়েছে রানা, মৃদুমন্দ বাতাস ঢুকছে ঘরে। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়েছে। উজ্জ্বল আলো জ্বলছে ভিতরে।

'ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রানা, বোর্ডটার দিকে তাকাল। 'টাসিলোর অন্য কোনো মানে যদি বোঝানো হয়ে থাকে এবং সেটা যদি না বুঝে থাকি আমরা, তা হলে ধরে নেয়া যায় বাভারিয়া সম্বন্ধে কিছু একটা বলা হচ্ছে ধাঁধার প্রথম দু'লাইনে।'

'সেটা কী?'

'হতে পারে বাভারিয়ার ইতিহাস বা ল্যাণ্ডমার্ক। অথবা দেশটার কৃষ্টি-সংস্কৃতি।'

'তা হলে গিবাস বাইয়ার ব্যাপারে কী বলবে?'

'আপাতত ধরে নিচ্ছি বাইয়া শব্দটার সঙ্গে রুমানিয়ার কোনো যোগাযোগ নেই। কারণ ঘুমিয়ে পড়ার আগে টানা দু'ঘণ্টা দেশটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করেছি নেটে। কোনো লাভ হয়নি।'

'তা হলে?'

'বাইয়া শব্দটা আপাতত বাদ। গিবাস নিয়ে আলোচনা করা যাক।'

'শব্দটার মানে বের করতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'পূর্ণ আর অর্ধেক চাঁদের মাঝামাঝি পর্যায়ের চাঁদকে বলা হয় গিবাস।'

'ধাঁধার গিবাস বলতে কি ও-রকম চাঁদকেই বুঝিয়েছেন নেপোলিয়ন? কুঁজোপিঠের মানুষকেও কিন্তু গিবাস বলা হয়,' ল্যাপটপে টাইপ করতে শুরু করেছে সোহানা। আগেও একবার খুঁজেছে গুগলে, এখন আবার খুঁজছে। টানা কয়েক মিনিটের সার্চের পর বলল, 'কিছু একটা পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়। বাইয়া শব্দটা একটা ফ্রেযের অংশ।'

'কীসের ফ্রেয?'

'মেন অভ বাভারিয়া।'

'তার মানে বাভারিয়ার কোনো কুঁজোপিঠের লোকের কথা বলা হয়েছে?'

'না মনে হয়। দাঁড়াও, আবারও খুঁজে দেখি।' কীবোর্ডে আঙুল চালাল সোহানা. যা জানতে পারল তা পড়ল সময় নিয়ে। তারপর বলল, 'টাসিলো নামে একজন রাজা পাওয়া গেছে। রাজা তৃতীয় টাসিলো। তিনি সাত শ' আটচল্লিশ সাল থেকে শুরু করে সাত শ' সাতাশি সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কোথায় অনুমান করো তো?' রানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল।

'বাভারিয়া?'

'হুঁ। রাজা পেপিন দ্য শর্ট সিংহাসনে বসিয়েছিলেন তৃতীয় টাসিলোকে। পেপিনের নামের সঙ্গে আরও দুটো নাম পাচ্ছি। তাঁর ছেলে শার্লেম্যাগনে এবং তাঁর নাতি পেপিন দ্য হাঞ্চব্যাক।' রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'কুঁজোপিঠের মানুষকে হাঞ্চব্যাক বলে।'

চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'টাসিলোর সঙ্গে একটা যোগাযোগ পাওয়া গেল পেপিন দ্য হাঞ্চব্যাকের। কিন্তু কীপ সেফ দ্য প্লেস অভ হাজ? হজ্বের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক কী? কেউই তো মুসলমান না।'

'সেটা আমিও বুঝতে পারছি না। বাভারিয়ার সঙ্গে মক্কার কোনো যোগসূত্রও পাচ্ছি না।'

'বাভারিয়ার কোনো ইসলামী আর্টিফ্যাক্টের কথা বুঝিয়েছেন নেপোলিয়ন?' বলে ল্যাপটপের কীবোর্ডে কয়েকটা শব্দ টাইপ করল রানা। সার্চ করল সময় নিয়ে। কিন্তু কিছু পাওয়া গেল না। 'না, কিছু নেই। অন্য কোনো লাইন নিয়ে কথা বলো।'

'ঠিক আছে। একদম প্রথম লাইনটা ধরি। অ্যাঙ্গুয়িশ্ড্ হাউস

ফেলোস ইন অ্যাম্বার ট্র্যাপ্‌ড্‌। আমরা ইতিমধ্যে অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্‌, হাউস, ফেলোস, অ্যাম্বার আর ট্র্যাপ্‌ড্‌ শব্দগুলোর ব্যুৎপত্তি আর সমার্থক কিছু শব্দ পেয়ে গেছি। প্রশ্ন হচ্ছে, ওগুলোকে একসঙ্গে করবে কীভাবে?'

'জানি না,' বলে আবারও চেয়ারে হেলান দিল রানা, ডান হাতের তর্জনী দিয়ে নাকের উপরের দিক চুলকাচ্ছে। 'কেন যেন আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা...প্রথম লাইনের কিছু একটা খুব পরিচিত লাগছে। আমি নিশ্চিত আসলেই আমার পরিচিত কিছু একটা আছে প্রথম লাইনে। ধরি ধরি করেও ধরতে পারছি না ব্যাপারটা। বার বার চোখ পড়ছে লাইনটার ওপর, বার বার আমার চোখ এড়িয়ে যাচ্ছে বিষয়টা।'

এরপর আর কথা হলো না। টানা প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চুপ করে বসে থাকল ওরা। যার যার ভাবনায় ডুবে আছে। যার যার মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে প্রথম লাইনটাকে। কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে বার বার, কারণ নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে না।

শেষপর্যন্ত হাতঘড়ির দিকে তাকাল সোহানা। আঁতকে উঠল কিছুটা। 'ক'টা বাজে দেখেছ? রাত এগারোটা। আমরা কাজে ব্যস্ত দেখে জনসনও কিছু বলেনি। ডিনারের সময় পেরিয়ে গেছে কত আগে! চলো কিছু খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি। আমি আর পারছি না। ঘুম পাচ্ছে, খিদেও লেগেছে।'

প্রতিবাদ না করে উঠে দাঁড়াল রানা। 'বিরক্তি ধরে গেছে আমার।'

উঠে দাঁড়াল সোহানাও। 'কেন?'

'বার বার তাকাচ্ছি প্রথম লাইনটার দিকে। মনে হচ্ছে কিছু একটা আছে সেখানে। কিন্তু বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় পড়লে যে-কারোরই বিরক্তি লাগত।'

সে-বিষয়ে মন্তব্য না করে সোহানা বলল, 'চলো খেতে যাই।'

পাঁচ ঘণ্টা পর।

মিসেস দেলফিনার গেস্টরুমের ডাবল বেডে পাশাপাশি শুয়ে আছে রানা-সোহানা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানার। ঘাড় ঘুরিয়ে সোহানাকে দেখে নিল। তারপর দেখল হাতঘড়িটা। উঠে বসল। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'পেয়ে গেছি, সোহানা।'

কথাটা শুনে ঘুম ভেঙে গেল সোহানারও। উঠে বসল সে-ও। তাকাল রানার দিকে। 'কী বললে? কী হয়েছে?'

'কিছু হয়নি। বললাম, বার বার আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছিল যা, তা বুঝতে পেরেছি।'

দেরি করার মানে হয় না, বুঝতে পারছে সোহানা, তাই রানার মতো নাইটড্রেস পরেই বের হলো গেস্টরুম থেকে। তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে গেল স্টাডিরুমের দিকে। ভিতরে ঢুকে আলো জ্বালল, বসে পড়ল ল্যাপটপের সামনে।

যার যার ল্যাপটপ চালু করল ওরা।

কিছু বলার আগে টানা প্রায় বিশ মিনিট ল্যাপটপে কাজ করল রানা। ওর পাশেই বসে আছে সোহানা, একদৃষ্টিতে দেখছে ওকে। কী বুঝতে পেরেছে রানা জানতে চাচ্ছে না। বুঝতে পারছে নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলবে না রানা।

শেষপর্যন্ত সোহানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রানা।

ভ্রূ নাচাল সোহানা। 'কী?'

'কয়েক বছর আগে দ্য ডেইজ অভ দ্য আপরাইট নামে একটা বই পড়েছিলাম। ওই বইয়ে হিউগনৌদের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন লেখক।'

'হিউগনৌ? মানে ষোলো আর সতেরো শতকের ফরাসি প্রটেস্ট্যান্ট?'

'হুঁ। বাইবেল পড়ার জন্য এরা গোপনে একে অন্যের বাসায় একত্রিত হতো। এজন্য ওদেরকে বলা হতো হাউস ফেলোস।'

একদৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। কিছুক্ষণ পর বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট!'

'মানতে পারলাম না,' মাথা নাড়ছে রানা। 'ব্রিলিয়ান্ট হতাম যদি প্রথমেই ধরে ফেলতে পারতাম হাউস ফেলোসদের ব্যাপারটা। বুঝতে অনেক সময় লেগে গেল।'

'তা-ও ভালো। বেটার লেট দ্যান নেভার। হিউগনৌদের ব্যাপারটা কী?'

'হিউগনৌ না, বলো অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্ হিউগনৌ,' সোহানার ভুলটা ধরিয়ে দিল রানা।

উঠে দাঁড়াল সোহানা, এগিয়ে গেল বোর্ডটার দিকে। হাউস ফেলোস শব্দ দুটোর পাশে বড় বড় করে লিখল হিউগনৌ। এরপর "অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড" শব্দটার সঙ্গে যতগুলো সমার্থক শব্দ আছে সবগুলোর চারপাশে গোল দাগ দিল। বারোটা শব্দ আলাদা হলো। শব্দগুলোর দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'না, অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্ শব্দটার সঙ্গে হিউগনৌদের মেলাতে পারছি না।'

'বাদ দাও। এসো অ্যাম্বার নিয়ে আলাপ বলি। বলা হচ্ছে, ইন অ্যাম্বার ট্র্যাপ্‌ড্। আচ্ছা, অ্যাম্বার বা রঞ্জকের ভিতরে কীভাবে ট্র্যাপ্‌ড্, মানে আটকা পড়তে পারে কেউ?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর সোহানা বলল, 'কেউ না হয়ে যদি কিছু একটা হয় তা হলে কেমন হয়? মানে, আমি মানুষ বাদে অন্য যে-কোনো কিছু, বিশেষ করে কোনো পতঙ্গের কথা বোঝাতে চাচ্ছি।'

'রঞ্জকের ভিতরে আটকা পড়লে কী হতে পারে কোনো পতঙ্গের?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোহানা। 'মারা পড়বে?'

'কিন্তু তার আগে? নিশ্চল হয়ে যাবে পতঙ্গটা, চলাফেরার শক্তি হারিয়ে ফেলবে।'

'বরফের মতো জমে যাবে।'

একদৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল রানা। 'দারুণ একটা কথা বলেছ, সোহানা।'

'কীসের দারুণ?'

'বরফের মতো জমে যাবে। অনেকটা স্ন্যাপশটের মতো। কিন্তু তখনকার দিনে তো স্ন্যাপশট ছিল না। ছিল হাতেআঁকা পেইণ্টিংস।'

তুড়ি বাজাল সোহানা, প্রায় উড়ে এসে বসে পড়ল ল্যাপটপের সামনে। গুগলের সার্চবারে টাইপ করছে: পেইণ্টিংস...হিউগনো...

তারপর এণ্টার কী-তে চাপ দিল। পাশ থেকে উঁকি দিয়ে স্ক্রিনটা দেখছে রানা। কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল, 'কী পেলে?'

'ম্যাসাকার।'

'ম্যাসাকার?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে রানার। 'খুঁজতে গেলে হিউগনোদের সঙ্গে পেইন্টিংসের সম্পর্ক, সেখানে গণহত্যা এল কী করে?'

হাসল সোহানা। 'ফ্রন্সোয়া ডুবয়েস নামের এক চিত্রশিল্পীর খোঁজ পাওয়া গেছে। লোকটার একটা চিত্রকর্মের নাম: দ্য সেইন্ট বার্থোলোমিউ'স ডে ম্যাসাকার।'

'বিষয়?'

'পনোরো শ' বাহাত্তর সালের ফ্রান্স।' ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে পড়ছে সোহানা, 'অগাস্ট থেকে শুরু করে অক্টোবর পর্যন্ত ক্যাথলিক জনতা সারাদেশের সংখ্যালঘু হিউগনোদের উপর আক্রমণ করে। কেউ বলছে এর ফলে প্রায় দশ হাজার, আবার কারও মতে লক্ষাধিক হিউগনো মারা পড়ে।'

'কাজেই এটা যদি অ্যাঙ্গুয়িশ অর্থাৎ নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা না হয়, তা হলে আর কোন্‌টা মানসিক যন্ত্রণা আমার জানা নেই,' মন্তব্য করল রানা। 'এখন বাভারিয়ার সঙ্গে অ্যাঙ্গুয়িশ্‌ড্‌ হিউগনৌদের মেলানো যাক,' বলে পিঠ সোজা করল, আঙুলগুলো রাখল ল্যাপটপের কীবোর্ডে। এবার গুগলে সার্চ করছে ডুবয়েস, সেইন্ট বার্থোলোমিউ আর বাভারিয়া। সঙ্গে আছে ডে আর ম্যাসাকার।

ওর স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সোহানা পরামর্শ দিল, 'একসঙ্গে হজ্ব, মক্কা, পিলগ্রিমেজ, ইসলাম, পিলগ্রিম শব্দগুলোও সার্চ দিয়ে দেখো কী পাওয়া যায়।'

প্রস্তাবটা পছন্দ হলো রানার, সার্চবারে শব্দগুলো লিখল। তারপর এণ্টার কী চাপল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বলল, 'অনেকগুলো রেযাল্ট পাওয়া গেছে। কিন্তু কোনোটা থেকেই নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যাচ্ছে না।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক। সার্চ রেযাল্টগুলো ভালোমতো দেখি। যেগুলো একেবারেই কাজে লাগবে না সেগুলো বাদ দিই। যেগুলো কাজে লাগতে পারে সেগুলো রাখি। পরে আবার চেষ্টা করা যাবে।'

টানা দেড় ঘণ্টা কাজ করল ওরা। সূর্য উঠি উঠি করছে, এমন সময় সেইন্ট বার্থোলোমিউ, বাভারিয়া আর পিলগ্রিম শব্দগুলো দিয়ে ইন্টারেস্টিং একটা রেযাল্ট পেল রানা, হাই তুলতে তুলতে বলল, 'কিছু একটা পেয়েছি সম্ভবত।'

'কী?' ঝুঁকল সোহানা, তাকাল রানার ল্যাপটপের দিকে।

স্ক্রিনের উপরে, বাঁ দিকে, অনেকগুলো লাইনের মাঝে একটা লাইন নীল হয়ে আছে, কারণ মাউস কার্সর দিয়ে লাইনটা সিলেক্ট করেছে রানা:

সেইন্ট বার্থোলোমিউ'স পিলগ্রিম চার্চ, বাভারিয়া, জার্মানি।

পনেরো

বাভারিয়া

'অবিশ্বাস্য!' ফিসফিস করে বলল সোহানা।

রেলিং দিয়ে ঘেরা ওয়াচ-টাওয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে ও রানাকে নিয়ে। নীচের দিকে তাকিয়ে করেছে মন্তব্যটা। রানা কিছু বলল না, চুপ করে দেখছে দিগন্ত-বিস্তৃত প্রকৃতি। আরও কিছুক্ষণ দেখল সোহানা চারপাশ। তারপর বলল, 'আমার মনে হয় আমরা সামনে যা দেখছি তা বিশেষায়িত করার জন্য সুন্দর শব্দটা যথেষ্ট না। আরও কিছু যোগ করতে হয় শব্দটার আগে। কিন্তু সেটা মাথায় আসছে না এখন। ইস্‌স্‌, রানা, তোমাকে নিয়ে যদি সারাজীবন এ-রকম কোনো জায়গায় কাটিয়ে দিতে পারতাম!'

জবাবে ভুবনভোলানো হাসি হেসে রানা বলল, 'সারাজীবন হয়তো পারবো না, কিন্তু কিছুটা সময় তো পেরেছি।' নিজের ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে বেছে বেছে কয়েকটা ছবি তুলল।

ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে কিছুটা দূরে, নীচে একটা লেক। নাম কিং'স লেক। চকচকে পানি মনে করিয়ে দেয় পান্নার কথা। লেকের সবচেয়ে চওড়া অংশটা বেশি হলে আধ মাইল। দু'দিকেই ঘন সবুজ জঙ্গল। মাঝেমধ্যে গ্র্যানিট পাহাড়ের ঢাল। এগুলো ছাড়িয়ে আরও দূরে তাকালে চোখে পড়ে তুষারাবৃত পর্বতের চূড়া। দেখা যায় জঙ্গলের ভিতরে এখানে ওখানে দু'-চারটে বিচ্ছিন্ন গ্রাম। কখনও আবার বাঁক নিয়ে আলগা হয়ে গেছে

কয়েকটা উপত্যকা, একটা আরেকটার থেকে অনেক দূরে হওয়ায় সবগুলোকেই নিঃসঙ্গ মনে হয়। কোনো কোনো উপত্যকার ঢালে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি। সেখানে আছে বুনো বাহারি ফুলের সমাহার, এত দূর থেকেও রঙের চাদর দেখা যায়। অবসর কাটানো কিংবা প্রকৃতির অপরূপ রূপের ছবি তোলার জন্য জায়গাটা আসলেই দারুণ।

প্রকৃতিপ্রেমীদের বিনোদনের সুযোগ করে দিয়েছে গ্রামবাসীরা—লেকের বুক চিরে ঘুরে বেড়াচ্ছে একাধিক নৌকা। কোনোটাই ডিজেলচালিত না। ভটভট আওয়াজে যাতে আশপাশের নিস্তব্ধতা নষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হয়েছে। ব্যাটারিচালিত নৌকা ব্যবহার করছে ওরা। ওগুলো চলার সময় ছোট ছোট ঢেউ তৈরি করে, সে-শব্দ কখনও কখনও শোনা যায় কি যায় না।

আরও কিছুক্ষণ চারপাশ দেখার পর রানা বলল, 'একেই বলে ছবির মতো সুন্দর, না?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল সোহানা। 'এতক্ষণ ঠিক এ-কথাটাই ভাবছিলাম মনে মনে।'

বাঁক নিয়ে এগিয়ে চলার সময় একজায়গায় বেশ সঙ্কুচিত হয়েছে কিং'স লেক। সেখানে প্রশস্ততা বড়জোর দু' শ' গজ। এরপর আবার চওড়া হয়েছে, তীক্ষ্ণ একটা মোচড় কেটে চলে গেছে দক্ষিণপুব দিকে। লেকটা হঠাৎ দিক বদল করাতে জলবেষ্টিত উপদ্বীপের মতো তৈরি হয়েছে। এই উপদ্বীপের উদ্ভিদশূন্য ন্যাড়া একটা ঢালে দাঁড়িয়ে আছে সেইন্ট বার্থোলোমিউ'স পিলগ্রিম চার্চ।

গির্জার অর্ধেকটা এককালে ব্যবহৃত হতো স্কি লজ হিসেবে। ওখানকার বাইরের দিকের দেয়াল চুনকাম-করা। ধূসর টালির ছাদ ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। সবুজ আর হলুদ রঙ-করা ভারী

কাঠের দরজাগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাকি অর্ধেকে আছে পিঁয়াজের মতো দেখতে তিনটে বড় লাল গম্বুজ। দুটো গম্বুজে প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে, বাইরে থেকে দেখা যায়। তিন নম্বরটাতে কোনো জানালা নেই, সিঁড়িও নেই। জানালাওয়ালা একটা গম্বুজ বানানো হয়েছে লেকের দিকে মুখ করে। ওটার জানালাগুলোয় খড়খড়ি-দেয়া। প্রাচীন ভাবটা বজায় রাখা হয়েছে ইচ্ছা করেই। একাধিকবার সংস্কার করা হয়েছে গির্জা আর সেটার আশপাশের জায়গা, কিন্তু আধুনিকতার দোহাই দিয়ে বিকৃতি ঘটানো হয়নি কখনোই।

'আগামীকাল ক'টার সময় আমাদের নৌকা ছাড়বে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'সকাল ন'টা। আজ রাতে মনে করিয়ে দিয়ো তো, কাল আবহাওয়া কেমন থাকবে চেক করতে হবে নেটে।'

বছরের এই সময়ে জার্মানির, বিশেষ করে বাভারিয়ার আবহাওয়া পরিবর্তনশীল থাকে। দেখা গেল সকালে উজ্জ্বল রোদ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই পাল্টে যেতে পারে পরিস্থিতি। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করে, ঘন কালো রঙ ধারণ করে একসময়, তারপর হুড়মুড় করে বৃষ্টি নামে। কখনও আবার বিনা-নোটিশে আঁধার হয়ে আসে চারদিক, শেষবিকেলের দিকে শুরু হয় তুষারপাত। কাজেই যারা এসব জানে তারা বাড়তি সোয়েটার বা উইণ্ডব্রেকার সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে আসে বাভারিয়ায়।

গির্জাসংলগ্ন সবচেয়ে কাছের একটা গ্রামে, একটা মোটেলে উঠেছে রানা-সোহানা। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করার জন্য মোটেলের কাছেই বানানো হয়েছে উঁচু ওয়াচ-টাওয়ার।

'রানা,' বহু পুরনো রেলিং-এ সাবধানে হেলান দিল সোহানা, একহাতে পেঁচিয়ে ধরে আছে কাছের একটা পাথরের স্তম্ভ, 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের। আরও

তাড়াতাড়ি যাওয়া উচিত ছিল ওই চার্চে।'

আরও কয়েকটা ছবি তুলল রানা, ক্যামেরা নামিয়ে রেখে তাকাল সোহানার দিকে। 'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। কিন্তু কোনো উপায় নেই। কাল সকালের আগে কোনো নৌকা যাবে না চার্চের ওই পার্কে। মোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, আরেকটা পথ আছে ওদিকে যাওয়ার—গিরিখাতের ভিতর দিয়ে। কিন্তু পথটা দুর্গম। আর আমরা যারা চিনি না তারা সহজেই হারিয়ে যেতে পারি। কাজেই নৌকার অপেক্ষা না করে ওদিক দিয়ে গেলে আরও দেরি হতো। দক্ষ গাইড যোগাড় করতেই লেগে যেত একদিন। আপাতত ধৈর্য ধরার বিকল্প দেখছি না। তা ছাড়া সবুরে মেওয়া ফলে।'

'কিন্তু সিদোরভ সবুর করবে বলে মনে হয় না। ওর প্রাসাদে হানা দিয়েছি আমরা, ব্যাপারটা সহজভাবে নেয়নি সে, নেয়ার কথাও না। তোমাকে শেষবারের মতো "বন্ধুত্বের" প্রস্তাব দেয়ার জন্য তোমার ফোন নম্বর পর্যন্ত জোগাড় করেছে। বুঝে দেখো যা খুঁজছে সে, সেটার জন্য কতটা মরিয়া হয়ে উঠেছে। মেলিখান আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের খবর নেই কয়েকদিন থেকে। কিন্তু কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে ওদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি আশপাশে। ওরা প্রফেশনাল, এত সহজে হাল ছাড়বে না।'

'মেলিখানের ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে আমাকেও,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যে-কোনো কারণেই হোক, যা খুঁজছে সিদোরভ তা বের করতে বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। সেই সঙ্গে বুঝতে পারছে ঠিক পথে এগোচ্ছি আমরা। তাই লোক লাগিয়ে আমাদেরকে অনুসরণ করাটা ওর একটা কৌশল। হতে পারে আমাদের ফলো করতে গিয়েই এখানে হাজির হবে মেলিখান আর ওর লোকেরা। আবার হতে পারে আমাদের মতোই ধাঁধার কিছুটা অংশের সমাধান বের করেছে, তাই জানতে চাইবে কী আছে সেইন্ট

বার্থোলোমিউর গির্জায়,' কথা শেষ করে নীচের দিকে তাকাল।

পাঁচ হাজার লোকের বাস এই গ্রামে। লেক থেকে ছোট একটা নদী বের হয়ে বয়ে গেছে গ্রামের মধ্য দিয়ে। বছরের বিভিন্ন সময়ে অনেক পর্যটক বেড়াতে আসে বলে নদীর ধারেকাছে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু মোটেল আর কটেজ। সংস্কারকাজ হয়েছে গ্রামেও। এখানকার অধিবাসীদের বাড়িগুলো ছোট হলেও সুন্দর, আধুনিকতার ছোঁয়া আছে। রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পুবদিকে গ্রামের একমাত্র নদীবন্দর, অনেকটা ইংরেজি "এস" আকৃতির। ওখানে জটলা পাকিয়ে আছে বেশ কয়েকটা ক্যাফে, রেস্টুরেন্ট, মোটেল আর বোটহাউস।

দিনের শেষ ট্যুরবোটগুলো ধীরেসুস্থে এগিয়ে যাচ্ছে বোটহাউসগুলোর দিকে। লেকের চকচকে পানিতে শেষবিকেলের সূর্যের প্রতিফলন।

'চলো মোটেলে ফিরে যাই,' সোহানাকে বলল রানা, 'খিদে লেগেছে।'

ওয়াচ-টাওয়ার থেকে নামল ওরা, নুড়ি-বিছানো পথ ধরে হাঁটছে মোটেলের দিকে। দু'পাশে নাম-না-জানা বাহারি রঙের সারি সারি ফুলগাছ। কয়েক মিনিটেই হাজির হয়ে গেল ওরা মোটেলের সামনে। সাদা আর লালের কম্বিনেশনে চমৎকারভাবে রঙ করা হয়েছে মোটেলের বাইরের দিকের দেয়াল। সীমানাপ্রাচীর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে শক্ত আর কাঁটাওয়ালা ডালের একজাতের উঁচু ঝোপ। সুন্দর করে ছেঁটে রাখা হয়েছে, দেখতে খারাপ লাগে না তাই। প্রতিটা রুমের সঙ্গে ব্যালকনি, সেখানে ছোট ছোট টবে সাদা আর গোলাপি রঙের ফুল। উজ্জ্বল লাল টালির ছাদ শেষবিকেলের আলোয় আরও বর্ণিল হয়েছে যেন।

চটপট শাওয়ার সেরে নিল ওরা। তারপর মোটেলের ভারী টেরি ক্লথরোব গায়ে জড়িয়ে এসে বসল বারান্দায়। রুমসার্ভিসকে

অর্ডার করেছে রানা, কফি আর হালকা নাস্তা দিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ইচ্ছা করেই বেশি দামে লেকভিউ রুম নিয়েছে রানা। এখানকার বারান্দা থেকে লেকের অনেকখানি দেখা যায়। অনেকদূরে, পশ্চিম দিগন্তে, পর্বতের আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছে সূর্য। আকাশে লাল আভা, লেকের পানিতেও সে-রঙের ছোঁয়া লেগেছে যেন। মৃদুমন্দ সান্ধ্যবাতাস বইছে। বোঝা যাচ্ছে রাতে ঠাণ্ডা বাড়বে।

নীচের রাস্তা আর ফুটপাথে ভিড় বাড়ছে পর্যটকদের। ছোট ছোট দোকান আর বন্দরেও জড়ো হয়েছে অনেকে। কেউ কেউ কেনাকাটা করছে। কেউ আবার ছবি তোলায় ব্যস্ত।

নিজের আই-ফোনটা চালু করল রানা। মোটেলের নিজস্ব ওয়াইফাই আছে, কিছুক্ষণ চেষ্টা করে সংযুক্ত হলো নেটওয়ার্কে। ই-মেইল লিস্ট দেখে বলল, 'অপি কী যেন পাঠিয়েছে।'

'কী?' অপার্থিব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য থেকে চোখ সরাতে ইচ্ছা করছে না সোহানার।

কী, তা জানতে কিছু সময় ব্যয় করতে হলো রানাকে। বলল, 'রাজা প্রথম যারক্সিয আর অ্যাকিমেনিড রাজত্বের উপর আর্টিকেল। অ্যাব্রিজ্‌ড্ আর ডিটেইল্ড দু'রকম ভার্সনই পাঠিয়েছে।'

'আমার আই-ফোনটা নিয়ে আসি,' বলে উঠল সোহানা, 'আমার সেটে ট্রান্সফার করো আর্টিকেলগুলো। আমিও পড়ি।'

কফি চলে এসেছে। সঙ্গে মেয়োনেইযের পুরু প্রলেপ দেয়া চিকেন স্যাণ্ডউইচ। বারান্দার মুখোমুখি দুটো চেয়ারে আরাম করে বসে আছে রানা-সোহানা। টি-টেবিলে রাখা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে মাঝেমধ্যে। স্যাণ্ডউইচ খাওয়া শেষ। ওদের দৃষ্টি চুম্বকের মতো আটকে আছে যার যার আই-ফোনের স্ক্রিনে। রাজা প্রথম যারক্সিয আর অ্যাকিমেনিড রাজত্বের উপর পাঠানো অপির

আর্টিকেল পড়ছে মন দিয়ে।

অ্যাকিমেনিড রাজত্বের অষ্টম শাসক হিসেবে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন রাজা প্রথম যারক্সিয। কালবিলম্ব না করে পূর্ববর্তীদের মতো শুরু করেন যুদ্ধ। মিশরে বিদ্রোহ ঘোষণা করা হয়েছিল তাঁর বিরুদ্ধে, বিদ্রোহীদের থেঁতলে দেন তিনি। তারপর ব্যাবিলনিয়ান সম্রাটকে অবৈধ ঘোষণা করে হাত বাড়ান দেশটার দিকে। তাঁর সেনাবাহিনী তছনছ করে ফেলে পুরো দেশটাকে, কজা করে নেয় প্রধান মন্দিরে সংরক্ষিত বেল-মারডুকের সোনার-মূর্তি, আগুনে গলিয়ে ধ্বংস করে ওটাকে। একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায় ব্যাবিলনের ধর্মীয় ভিত্তি।

কয়েক বছর পর পুরো গ্রীস দখল করার নিয়তে অ্যাকিমেনিড সাম্রাজ্যের উপর অকস্মাৎ হামলা চালান অ্যাথেনিয়ানদের রাজা প্রথম দারিয়ুস। ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হন যারক্সিয, ব্যাটল অভ ম্যারাথনে সম্পূর্ণ পরাভূত করেন অ্যাথেনিয়ানদের, নামনিশানা মুছে দেন ওদের।

তখন তিনি বুঝতে পারেন বিশাল সেনাবাহিনীর গুরুত্ব কী। সুতরাং মন দেন তাঁর সেনাবাহিনীকে বড় করার কাজে। খ্রিষ্টপূর্ব চার শ' তিরাশি সালে সিদ্ধান্ত নেন পুরো গ্রীস নিয়ে নেবেন নিজের কজায়। যুদ্ধের সময় কাজে লাগতে পারে ভেবে বিশাল এক ব্রিজ নির্মাণ করান, খনন করান বড় একটা খাল।

শুরু হয় যারক্সিযের গ্রীস দখল করার যুদ্ধ। সারদিস থেকে শুরু করে মেসেডোনিয়া পর্যন্ত করায়ত্ত করেন তিনি। কিন্তু থার্মোপিলিতে পৌঁছে স্পার্টানদের রাজা লিওনিডাসের কাছে হোঁচট খেতে হয় তাঁকে। তবে শেষপর্যন্ত লিওনিডাসকে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং বিজয় অভিযান চালিয়ে যান। ক্রমশ দক্ষিণ দিকে এগোতে এগোতে এথেন্সে পৌঁছে যায় তাঁর সেনাবাহিনী। পরিত্যক্ত শহরটা বিনা-বাধায় দখল করে নেয়

তারা।

যারক্সিয়ের পতন শুরু হয় খ্রিষ্টপূর্ব চার শ' উনআশি সালের দিকে। এ-সময় একটা যুদ্ধে অনেকগুলো রণতরী নষ্ট হয় তাঁর, পরের দুটো যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতি স্বীকার করে নিতে হয় তাঁর বিখ্যাত সেনাবাহিনীকে। বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীর দায়িত্ব জনৈক জেনারেলের হাতে ছেড়ে দিয়ে পারসিপোলিস, মানে আজকের ইরানে ফিরে আসেন যারক্সিয়।

রাজনৈতিক অবস্থা তখন ভালো না। যুদ্ধে মত্ত রাজার অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন মহল থেকে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র। বাতাসে গুঞ্জন, রাজার বড় ছেলেও নাকি জড়িত এসবের সঙ্গে। টালমাটাল পরিস্থিতি সামলাতে গিয়ে লেজেগোবরে করে ফেলেন যারক্সিয এবং শেষপর্যন্ত খ্রিষ্টপূর্ব চার শ' চৌষট্টি সালে তাঁর রক্ষীবাহিনীর জনৈক ক্যাপ্টেনের হাতে নিহত হন। কথিত আছে, খুনটা নাকি তাঁর সেই পুত্রধনই করিয়েছিল।

'রাজনীতি আসলেই অত্যন্ত জঘন্য একটা বিষয়,' পড়া শেষ করে মন্তব্য করল সোহানা।

রানা বলল, 'যদি ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে না থাকে, খুব একটা ভালো লোক বলা যাবে না যারক্সিয়কে।'

'কোন্ রাজনীতিবিদ ভালো, বলতে পারো?'

'না, পারি না। চলো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। যারক্সিয়ের বায়োগ্রাফি পড়ে তেমন কিছু জানা গেল না।'

'মানে?'

'সিদোরভ কীসের পেছনে লেগেছে, যারক্সিয়ের কাহিনি পড়ে তা নিশ্চিত হওয়া গেল না। একবার ভেবেছিলাম বেল-মারডুকের সেই সোনার মূর্তিটা হবে, কিন্তু ওটা গলিয়ে ফেলা হয়েছে।'

'ইতিহাস এক শ' ভাগ সঠিক, জানছ কী করে? যদি বলি বেল-মারডুকের মূর্তির মতো দেখতে অন্য কোনো মূর্তি গলিয়েছে

যারক্সিয? আসলটা হয়তো লুকিয়ে রেখেছিল গোপন কোনো জায়গায়। অথবা হয়তো হারিয়ে গিয়েছিল।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হতে পারে।' দ্রুত একটা ই-মেইল টাইপ করে অপির কাছে পাঠিয়ে দিল।

কয়েক মিনিট পর পাল্টা ই-মেইল এল অপির কাছ থেকে। সংক্ষেপে শুধু লিখেছে: 'চেক করে দেখছি।'

আই-ফোনটা টি-টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সোহানার দিকে তাকাল রানা। 'যারক্সিযের ব্যাপারে আর কিছু বলবে?'

'যারক্সিযের গ্রীস-অভিযান চলার সময় উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেনি তো? ইতিহাস কী বলে? মূল্যবান কোনো কিছু খোয়া গিয়েছিল যারক্সিযের?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ইতিহাস কী বলে আপাতত জানি না। যারক্সিযের মূল্যবান কোনো কিছু হারিয়ে গিয়েছিল কি না তা-ও বলতে পারছি না। তবে সিদোরভ হয়তো ভাবছে ওই জিনিসটা উদ্ধার করতে পারলে যারক্সিয, মানে ওর পূর্বপুরুষের আত্মা শান্তি পাবে। ধরে নিয়েছে, রাজবংশের সন্তান হিসেবে কাজটা করা ওর পবিত্র দায়িত্ব।'

'আচ্ছা, মিশরীয় বিদ্রোহের সময় কিছু হয়নি তো? ওই বিদ্রোহ আর যারক্সিযের ইরানে ফিরে আসার মধ্যে কিন্তু খুব বেশি সময়ের ব্যবধান নেই।'

'হতে পারে। আসলে ইতিহাস বড় একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য। ইতিহাস যত প্রাচীন হয়, তথ্য-বিবরণী তত কম থাকে। কারণ এত আগে মানুষের লেখাপড়ার উপকরণ ছিল অপ্রতুল, আবার সংরক্ষণব্যবস্থার অভাবে তখনকার ইতিহাসবিদদের অনেক লেখাই নষ্ট হয়ে গেছে। প্রাচীন রাজাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ছাড়া অনেককিছুরই বর্ণনা পাওয়া যায় না, আর গেলেও তা কতটা নির্ভরযোগ্য সে-ব্যাপারে প্রশ্ন

থেকে যায়। তবে...'

'তবে কী?'

'যুদ্ধ-অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে কোন্ কোন্ দেশ থেকে কী কী সম্পদ লুট করেছেন যারক্সিয তার তালিকা পাওয়া যেতে পারে নামকরা কোনো-না-কোনো যাদুঘরের ভল্টে।'

চকচক করে উঠল সোহানার দু'চোখ। 'তা হলে কোত্থেকে শুরু করছি আমরা?'

হেসে ফেলল রানা। 'নামকরা যাদুঘর কি একটা-দুটো আছে পৃথিবীতে? কায়রো, লুক্সর, ইস্তাম্বুল, তেহরান...। যদি এ-মুহূর্ত থেকেও শুরু করি, শেষ করতে দশ-বারো বছর লেগে যাবে। ততদিন আমাদেরকে ছুটি দেবেন বুড়ো মিয়া?'

দপ্ করে নিভে গেল সোহানার উৎসাহ। 'তা হলে?'

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবল রানা কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'এসো আমাদের চিন্তাভাবনাগুলোকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে না দিয়ে ছোট করে নিয়ে আসি।'

'কীভাবে?'

'বিশ বছরের মতো রাজত্ব করেছেন যারক্সিয। এ-সময়ের মধ্যে তিনটে বড় যুদ্ধ-অভিযান পরিচালনা করেছেন: মিশর, ব্যাবিলন আর গ্রীস। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রীসেরটা। কারণ এটাই তাঁর পরিণতি ডেকে আনে। কাজেই গ্রেকো-পার্শিয়ান যুদ্ধের দিকেই মনোনিবেশ করি, নাকি?'

ভেবে দেখল সোহানা। তারপর বলল, 'মন্দ বলোনি।'

আলো জ্বলে উঠল রানার আই-ফোনে। টেবিল থেকে মোবাইলটা তুলে নিল ও। ই-মেইল এসেছে। অপি পাঠিয়েছে।

মেইলটা পড়ল রানা। তারপর বলল, 'বেল-মারডুকের মূর্তিটা আসলেই গলিয়ে ফেলা হয়েছিল কি না জানতে চেয়েছিলাম অপির কাছে। ও বলছে, হয়েছিল। এ-ব্যাপারে নাকি নির্ভরযোগ্য

একাধিক ডকুমেন্ট আছে। পার্শিয়ান আর ব্যাবিলনিয়ান, দুই জাতিই স্বীকার করে ঘটনাটা ঠিক। এবং আসল মূর্তিই গলানো হয়েছিল।'

'তা হলে তো ভালোই হলো। একটা সম্ভাবনা বাদ গেল। ধরে নিচ্ছি, যা ঘটার, যারক্সিয়েসের গ্রীস-অভিযানের সময়ই ঘটেছিল।'

একটা রেস্টুরেন্টের ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর পাশে মুখোমুখি বসেছে রানা-সোহানা, ডিনার করছে। মেন্যু: স্থানীয় কায়দায় বানানো রুটি আর গরুর মাংসের কাবাব। সঙ্গে ভুনা স্যামন মাছ, আলু-টমেটো-ভিনেগার দিয়ে তৈরি সালাদ এবং এক বোতল শ্যাম্পেন।

খাচ্ছে, কিন্তু একইসঙ্গে যার যার আই-ফোন নিয়ে ব্যস্ত রানা-সোহানা। নিচু গলায় কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

গত এক ঘণ্টায় অপির-পাঠানো আরও কিছু ডকুমেন্ট পড়েছে ওরা, কথা বলেছে অপির সঙ্গে। তারপর এসেছে এই রেস্টুরেন্টে।

নিজের ফোন নামিয়ে রাখল রানা। আরেক টুকরো রুটি আর বেশ কিছুটা কাবাব তুলে নিল প্লেটে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডো দিয়ে তাকাল বাইরের দিকে। অন্ধকার নেমেছে অনেক আগেই। বন্দর-এলাকায় একটা-দুটো বাতি জ্বলছে, ওগুলো বাদ দিয়ে বললে পুরো জায়গাটা ডুবে আছে গাঢ় অন্ধকারে। বোটহাউসগুলোকে কেমন ভূতুড়ে লাগছে। তবে সঙ্গের মোটেল, রেস্টুরেন্ট আর ছোট ছোট দোকানগুলো ঝলমল করছে উজ্জ্বল আলোয়। পর্যটকদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো।

'যদি শুনতে রাজি থাকো,' সোহানাকে বলল রানা, 'আমার একটা ধারণার কথা বলতে পারি।'

আই-ফোন নামিয়ে রাখল সোহানা। ভুনা স্যামন আর খানিকটা সালাদ নিল। 'বলো।'

রুটি-কাবাব চিবাতে চিবাতে রানা বলল, 'যারক্সিয়েসের জন্য

থ্রেস আর মেসেডোনিয়া ছিল ওয়ার্মিং-আপ। গ্রীস অভিযানের জন্য নিজের সব শক্তি, সব রোষ জমিয়ে রেখেছিলেন তিনি।'

কথাটা ভেবে দেখল সোহানা। 'হতে পারে।'

'বেল-মারডুকের মূর্তিটা চুরি করিয়ে এবং পরে গলিয়ে ফেলে ব্যাবিলনিয়ানদের মনোবল নষ্ট করে দেন তিনি। ফলে যুদ্ধে জয়লাভ করাটা সহজ হয় তাঁর জন্য। এটা ইতিহাসের কথা। এখন আমার কথা হচ্ছে, গ্রীকদের সঙ্গেও সে-রকম কিছু করতে চেয়েছিলেন তিনি?'

'অপির ডকুমেন্টে একজায়গায় ডেলফি'র 'মন্দিরের নাম উল্লেখ করা হয়েছে দেখলাম। সেজন্যই কি বলছ কথাটা?'

'হ্যাঁ। যদি বলি ওখান থেকেও কিছু একটা হাতিয়ে নেয়ার মতলবে ছিলেন যারক্সিয?'

কিছু না বলে আবার আই-ফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সোহানা। আরও একবার পড়তে চায় ডেলফি'র মন্দিরের ব্যাপারে কী জানিয়েছে অপি।

এথেন্স থেকে এক শ' মাইল উত্তর-পশ্চিমে, একটা পর্বতের ঢালে অবস্থিত মন্দিরটা। বানানোর পর দেবতা অ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। ওই ঢালে আসলে একটা মন্দির না, একসঙ্গে কয়েকটা আলাদা আলাদা মন্দির আছে। আরও আছে প্রাচীন একটা গুহা, ছোট একটা ঝরনা, নামকরা একটা বেদি, একটা থিয়েটার, এমনকী ছোট্ট একটা স্টেডিয়ামও। কথিত আছে, এসব জায়গায় প্রচুর ধনসম্পদ লুকিয়ে রেখেছিল গ্রীকরা। ওরা বিশ্বাস করত যেহেতু অ্যাপোলোর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত, দেবতা নিজেই রক্ষা করবেন সব সম্পদ।

ডেলফি'র মন্দিরে আসলেই ধনসম্পদ লুকানো ছিল কি না জানা যায়নি, দেবতা অ্যাপোলো সেগুলো রক্ষা করেছেন কি না সে-ব্যাপারেও নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। তবে থার্মোপিলির

লড়াইয়ে স্পার্টানদের থেঁতলে দেয়ার পর সাত হাজার সেনার একটা ব্যাটেলিয়ন পাঠিয়েছিলেন যারক্সিয়, বলে দিয়েছিলেন ডেলফি'র মন্দিরে যা যা পাওয়া যায় সব লুটে নিয়ে আসতে। তখন অদ্ভুত এক ঘটনা ঘটে।

ঠিক সময়েই হাজির হয় যারক্সিয়েরে সৈন্যরা, মেরেকেটে শেষও করে মন্দিরের পাহারায় নিয়োজিত রক্ষীদের। কিন্তু মন্দিরে ঢুকতে যাবে এমন সময় হঠাৎ শুরু হয় পাথরধস। বেশ কিছু সৈন্য মারা পড়ে সঙ্গে সঙ্গে, বাকিরা পালিয়ে বাঁচাটাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। মন্দিরের ধনসম্পদ মন্দিরেই লুকানো রয়ে যায়, যদি সে-রকম কিছু আসলেই থেকে থাকে।

এ-পর্যন্ত পড়ে মুখ তুলে তাকাল সোহানা। আই-ফোনটা নামিয়ে রেখে কাঁটাচামচ নিল, বেশি করে মশলা দিয়ে ভুনা-করা স্যামন খেতে দারুণ হয়েছে। রানাকে বলল, 'মন্দিরের অলৌকিক ব্যাপারটা পড়েছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কিন্তু ওটা নিয়ে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ একবাক্যে উড়িয়ে দিয়েছে। কেউ আরেকটু বাড়িয়ে বলেছে, সব ভণ্ডামি।'

'কিন্তু যদি ভণ্ডামি না হয়? ধরো, যারক্সিয়েরে সৈন্যরা পালায়নি, তা হলে?'

ছিপি খুলে বোতল থেকে নিজের আর সোহানার গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালল রানা। একটা চুমুক দিয়ে বলল, 'তা হলে বলবো চলে যাওয়ার আগে মন্দির থেকে কিছু-না-কিছু নিয়ে গেছে যারক্সিয়েরে সৈন্যরা।'

'সেই কিছু-না-কিছুটা কী?'

'ওমফ্যালোস?' রানার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

সোহানা জানে ওমফ্যালোস কী। ওটা একটা পাথর, ভিতরটা বিশেষ কায়দায় ফাঁপা বানানো হয়েছে। দেখতে অনেকটা

আনারসের মতো। গ্রীক মিথ অনুযায়ী, পাথরটাকে ন্যাকড়া দিয়ে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিলেন দেবতা জিউস-এর মা রিয়া, জিউস-এর বাবাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য, কারণ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে নবজাতককে খুন করতে উদ্যত হয়েছিলেন পিতা।

অনেক সম্মানের সঙ্গে পাথরটাকে স্থাপন করা হয়েছিল অ্যাপোলোর মন্দিরে। গ্রীকরা বিশ্বাস করত, ওই পাথরের মাধ্যমে দেবতাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা যায়।

'আমার মনে হয় না একটা পাথরের জন্য সাত হাজার সৈন্য পাঠাতে যাবেন যারক্সিয,' কিছুক্ষণ ভেবে বলল সোহানা। 'তারচেয়ে বরং মন্দিরে-লুকানো ধনসম্পদ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

শ্যাম্পেনের গ্লাসে আরেকবার চুমুক দিল রানা। 'দ্য ট্রেজারি অভ আর্গোস? নাকি দ্য সিফ্নিয়ান ট্রেজারি? দুটোরই ধর্মীয় গুরুত্ব যেমন আছে তেমন আছে সাংস্কৃতিক গুরুত্ব। তারপরও কেন যেন মিলছে না। সামান্য কিছু সোনা-রূপার পেছনে যারক্সিযের মতো লোক লাগবে না। তা ছাড়া মেলিখান বলেছে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে সিদোরভের বংশমর্যাদা জড়িত...'

'আরও একটা কথা বলেছে মেলিখান,' রানাকে শেষ করতে দিল না সোহানা, 'অনেকদিন আগে শুরু-হওয়া একটা কাজ শেষ করতে চাচ্ছে সিদোরভ। শুনলে হাসি পায়, মনে হয় কেউ যেন গোপন কোনো মিশনে পাঠিয়েছে শয়তানটাকে।'

'আচ্ছা আজ রাতের মতো থাক। চলো খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি গিয়ে। কাল সকালে অনেক কাজ। একদিনের জন্য অনেক মাথা ঘামিয়েছি, আর ইচ্ছে করছে না।'

ত্রিশ মাইল উত্তরে তখন জেট বিমানের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে মেলিখান ও তার তিন সঙ্গী। রানওয়েতে পা রেখেছে কি রাখেনি,

মেলিখানের মোবাইল আওয়াজ করে বুঝিয়ে দিল ভয়েস-মেইল এসেছে। থমকে দাঁড়াল সে, ভ্রূ কুঁচকে তাকাল স্ক্রিনের দিকে। ওর তিন সঙ্গীও দাঁড়িয়ে গেছে।

'কী?' জানতে চাইল একজন।

জবাব না দিয়ে বাঁকা হাসি হাসল মেলিখান। দ্রুত পা চালিয়ে চলে এল রানওয়ের বাইরে। এক সারি চেয়ার পাতা আছে একদিকে, সেদিকে এগিয়ে গেল। একটা চেয়ারে বসে পড়ে ব্রিফকেস খুলে বের করল নিজের ল্যাপটপ। চালু করল ওটা। দ্রুত আঙুল চালাল কীবোর্ডে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর চাপা গলায় বলে উঠল, 'পেয়ে গেছি!'

'কী পেয়েছেন?' জিজ্ঞেস না করে পারল না ওর এক চামচা। 'রানা-সোহানাকে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জবাবটা দিল মেলিখান, দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান, এই বার ঘুঘু তোমার বধিব পরান।' ল্যাপটপটা বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাল তিন সঙ্গীর দিকে। 'আমাদের থেকে খুব বেশি দূরে নেই ওরা। দক্ষিণদিকে আছে, বাভারিয়ায়। চলো জলদি!'

ষোলো

'সম্মানিত যাত্রীরা, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার যন্ত্রসঙ্গীত-প্রতিভা উপভোগ করতে পারবেন আপনারা,' নির্ভুল কিন্তু কড়া জার্মান টানের ইংরেজিতে বলে উঠলেন প্রমোদতরীর ক্যাপ্টেন।

'দয়া করে ডানদিকে দেখুন। একটা দেয়াল দেখতে পাচ্ছেন? ওটার নাম ইকোওয়্যাণ্ড। ইংরেজিতে যার মানে ইকো ওয়াল।'

নৌকার বাকি বিশ জন যাত্রীর মতোই ডানদিকে তাকাল রানা-সোহানা। আঠারো ফুটের একটা ইলেকট্রিক নৌকায় উঠেছে ওরা। দু'রকমের নৌকা ভাড়া দেয়া হয় বোটহাউসগুলো থেকে। পঁয়ষট্টি ফুটের, যেটাতে পঁচাশিজন যাত্রী উঠতে পারে। আর দ্বিতীয়টা আঠারো ফুটের, যেটার যাত্রী ধারণক্ষমতা পঁচিশ।

সিকি মাইল দূরে, সকালের পাতলা কুয়াশার চাদর ভেদ করে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে আছে পানির উপর। গুল্মলতা আর আগাছায় বোঝাই হয়ে আছে সেটা। পকেট থেকে পলিশ-করা চকচকে একটা হারমোনিকা বের করলেন ক্যাপ্টেন, মুখে দিয়ে ফুঁ দেয়ামাত্র বেজে উঠল হৃদয়স্পর্শী করুণ সুর। শুনলে যে-কেউ ভাববে বাদক তার প্রিয়তমার বিচ্ছেদবেদনায় কাতর। কিছুক্ষণ বাজিয়েই থেমে গেলেন ক্যাপ্টেন, নৌকাটা ততক্ষণে ইকো ওয়ালের আরও কাছে এসেছে। আশ্চর্যের বিষয়, দু'-তিন সেকেণ্ড পরই শোনা গেল ঠিক একই সুর পাহাড়ি দেয়ালটাতে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসছে।

হেসে উঠল নৌকার যাত্রীরা, খুশিতে হাততালি দিচ্ছে কেউ কেউ।

জবাবে বিনয়ের সঙ্গে হাসলেন ক্যাপ্টেন। যাত্রীদের অভিনন্দনের জবাব দিতে এক পা ভাঁজ করে কিছুটা ঝুঁকে ক্যাপ খুললেন। ভরাট, গম্ভীর, আন্তরিক গলায় বললেন, 'আমাদের পরবর্তী গন্তব্য সেইন্ট বার্থোলোমিউ'র পিলগ্রিম'স চার্চ এবং সংলগ্ন পার্ক। ওখানে কিছু সময়ের জন্য যাত্রাবিরতি করবো আমরা।'

নৌকা এগিয়ে চলেছে। যাত্রীরা চুপ করে আছে, কারণ লেকের নিস্তব্ধতা উপভোগ করতে চাচ্ছে। অবশ্য জরুরি কিছু

বলার থাকলে নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে নিচ্ছে। ইলেকট্রিক মোটরের মৃদু আওয়াজ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই বলা যায়। মাঝেমধ্যে বড় কোনো মাছ ঘাঁই মারছে পানিতে, হঠাৎ টুপ শব্দ শোনা যাচ্ছে তখন। নৌকার দু'পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পানির বিপরীতমুখী দুটো স্রোত। বাতাস শান্ত কিন্তু ঠাণ্ডা। মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়লে ধোঁয়ার মতো দেখা যায়।

ভোর পাঁচটায় উঠেছে রানা, ঘণ্টাখানেক মেডিটেশন আর ব্যায়াম করার পর ডেকে তুলেছে সোহানাকে। ফ্রেশ হয়ে নাস্তা সেরে নিয়েছে দু'জনে। নিজের পরিচিত কয়েকজন আর অপিকে ই-মেইল পাঠিয়েছে সোহানা: রাজা যারক্সিযের গ্রীস অভিযানের সময় অ্যাপোলোর মন্দিরে কী কী সম্পদ ছিল? সে-সব সম্পদের বর্তমান মূল্য কত হতে পারে? ওই মন্দির থেকে যারক্সিযের সৈন্যদের কোনোকিছু লুট করার প্রমাণ আছে কি না?

ক্যামেরা তুলে কয়েকটা ছবি তুলল রানা, তারপর তাকাল সোহানার দিকে। নিজের আই-ফোন নিয়ে ব্যস্ত ও। ই-মেইল চেক করছে। প্রকৃতির দিকে মন নেই।

মুখটা সোহানার কানের কাছে নামিয়ে ফিসফিস করে বলল রানা, 'কী দেখছ?'

'অ্যাপোলোর মন্দিরের ব্যাপারে জানতে চেয়ে কয়েকজনের কাছে মেইল পাঠিয়েছিলাম। জবাবে অপি ছাড়া প্রায় সবাই কিছু-না-কিছু লিখেছে। কিন্তু সেগুলো পড়ে আরও বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি। কোনো প্রশ্নেরই সঠিক জবাব পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে মেলিখান আর ওর সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে টেনশন হচ্ছে সকাল থেকে। কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে আমাদের ধারেকাছেই আছে ওরা। ওরা আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে, আমরা পাচ্ছি না।'

অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাসল রানা। 'চিন্তা কোরো না, তোমাকে নিরাপদে রাখার দায়িত্ব আমার।'

সোহানা হাসল না। 'আমি কিন্তু সিরিয়াস।'

ক্যামেরাটা কোলের উপর নামিয়ে রাখল রানা। কিছুটা ঘুরে বসে সরাসরি তাকাল সোহানার দিকে। 'একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো। মেলিখানের সঙ্গে এ-পর্যন্ত যতবার দেখা হয়েছে আমাদের, ততবার কমন কোনো ঘটনা ঘটেছে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল সোহানা। 'মনে করতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ ভাবল রানাও। 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ইউক্রেইন আর মোনাকো বাদে বাকি জায়গাগুলোতে একটা কমন ঘটনা আছে।'

'কী?'

'ওই দু'জায়গাতে আমার স্যাটেলাইট ফোন ব্যবহার করেছি। বাকি জায়গাগুলোতে তুমি তোমার আই-ফোন ব্যবহার করেছিলে।'

'কেন...এখানেও তো করেছি...' হঠাৎ বুঝতে পারল সোহানা কী বোঝাতে চেয়েছে রানা। 'মাই গড, রানা...কথাটা তো ভেবে দেখিনি! গত রাতে আমার মোবাইলটা চালু করলাম, ই-মেইল চেক করলাম।'

'না, সোহানা, ভুল হচ্ছে তোমার। স্যালযবার্গে নেমেও কাজটা করেছ তুমি।'

স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সোহানা। 'এত কিছু মনে রাখো কী করে? হ্যাঁ, তুমি বলায় মনে পড়ল, এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করেই কাজটা করেছি। তুমি বলতে চাচ্ছ, যে-ক'জায়গায় আমার আই-ফোন চালু করেছি, সেখানেই দেখা গেছে মেলিখানকে। তারমানে আমার ফোনটা কোনোভাবে বাগ করা হয়েছে?'

'টেকনিকালি কাজটা অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কাজটা যদি করেও থাকে ওরা, কখন করল? মোবাইলটা তোমার

হাতছাড়া হয়েছিল কখনও? মনে পড়ে?'

জবাব দেয়ার আগে আবারও ভাবতে হলো সোহানাকে। 'না, হাতছাড়া হয়নি, কিন্তু আউট-অভ-সাইট যাকে বলে সে-রকম হয়েছিল একবার।'

'কোথায়?'

'সাবমেরিনটাকে যখন তুলতে গেলাম আমরা তখন হোটেলে রেখে গিয়েছিলাম।'

'তারমানে তখন কোনোভাবে হোটেলরুমে ঢুকে পড়েছিল নিয়াযভ অথবা ওর সেই চামচা বক্সার। কী করবে সে-ব্যাপারে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে এসেছিল। তোমার মোবাইলটা নাগালে পেয়ে অমাবস্যার চাঁদ হাতে পায় ওরা। এবার বুঝতে পারছি কী করে আমাদের পেছনে আঠার মতো সেঁটে আছে ওরা।'

'কিন্তু রানা, হোটেলের কাছে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল নিয়াযভ আর বক্সার। ধরলাম তোমার কথা ঠিক, আমার মোবাইলটাকে বাগ করেছে ওরা তখন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মেলিখান জানল কী করে? আর টেকনোলজিটা ওর হাতেই বা গেল কীভাবে?'

'ভুলে যাচ্ছ সোহানা, ওরা একই দলের লোক। তোমার মোবাইল বাগ করা হয়েছে কথাটা জানা মেলিখানের জন্য অসম্ভব কিছু না। হয়তো পরে নিয়াযভই ওকে বুঝিয়ে দিয়েছে বাগিং ডিভাইস আর মেকানিযম।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

রানা বলল, 'রাম কে আর এলবায় যখন চালু করেছিলে তোমার মোবাইল, দু'বারই কি ইণ্টারনেটে ঢুকেছিলে?'

'হ্যাঁ, দু'বারই ইণ্টারনেটে ঢুকেছিলাম আমি।'

'আই-ফোন দু'ভাবে ইণ্টারনেটে সংযুক্ত হতে পারে। বিল্ট-ইন এজের মাধ্যমে অথবা লোকাল ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের

মাধ্যমে। আমার অনুমান, তোমার মোবাইলে ট্রান্সপণ্ডার ঢুকিয়ে দিয়েছে নিয়াযভ বা বক্সার। তুমি যখনই ওটা চালু করেছ কিংবা ইন্টারনেটে ঢুকেছ, ট্রান্সপণ্ডারটা মোবাইলের জিপিএস ব্যবহার করেছে এবং তোমার অবস্থান জানিয়ে দিয়ে "পিং মেসেজ" পাঠিয়েছে মেলিখানের কাছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল সোহানা। 'তারমানে রানা, হতে পারে এই নৌকায়ই...'

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'এখন না। নৌকা থেকে নামার সময় দেখবো। ওদেরকে বুঝতে দেয়া যাবে না ওদের উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে আমাদের কাছে। তোমার মোবাইল শেষ কখন চালু করেছিলে?'

'মোটেলে। আজ সকালে। নেটে ঢুকে কয়েকটা মেইল করেছি, বলেছি আগেও। সেই থেকে চালুই আছে।'

'কিন্তু আমাদেরকে কেউ ফলো করছে বলে একবারও মনে হয়নি আমার কাছে।'

'আমারও না। কিন্তু এ-জায়গায় এখন পর্যটকদের উপচে-পড়া ভিড়। এত মানুষের মধ্যে কে আমাদেরকে ফলো করছে তা বুঝতে পারাটা কঠিন কাজ।'

'আরেকটা খারাপ খবর হচ্ছে, এলাকাটা বেশি বড় না। চাইলে মাত্র ছ'জন লোক নিয়ে আমাদের উপর নজরদারি করতে পারবে মেলিখান। কে জানে, আমাদেরকে হয়তো নৌকায় উঠতে দেখেছে ওরা। এ-নৌকায় হয়তো নেই, কিন্তু পরের কোনো নৌকায় ঠিকই আসছে আমাদের পেছন পেছন।'

'কী করবো তা হলে?'

'যা করার জন্য এসেছি তা-ই। মেলিখান আর ওর চামচাদের ভয়ে পালানোর প্রশ্নই আসে না। ওরা কোথায় লুকিয়ে থেকে

আমাদেরকে দেখছে তা-ও জানার দরকার নেই। আমরা ভান করবো যেন ঘুরতে বেড়িয়েছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি। এবার তোমার ফোনটা দাও আমাকে,' পকেট থেকে সুইস নাইফ বের করল রানা। 'কাজ আছে।'

সোহানার কাছ থেকে মোবাইলটা নিয়ে প্রথমেই কভার খুলে ফেলল ও। সুইস নাইফে অনেকগুলো ফলা আছে, বেছে বেছে সরু একটা স্ক্রুড্রাইভার বের করল। ওটা দিয়ে আই-ফোনের স্ক্রুগুলো খুলে ফেলল। কাজ করতে করতেই মুখ তুলে তাকাচ্ছে বার বার, সেইন্ট বার্থোলোমিউ'র গির্জাটা কতখানি কাছিয়ে এসেছে জানতে চায়।

ভিতরের কভারটাও খুলে ফেলল রানা। মাদারবোর্ড আর অন্যান্য সার্কিটগুলো দেখা যাচ্ছে এখন। নখের সমান গোলাপি রঙের একটা সার্কিট চিপ দেখা যাচ্ছে, মনোফিলামেণ্টের মতো একজাতীয় তার দিয়ে আই-ফোনের ব্যাটারির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত।

সুইস নাইফের চিমটাটা বের করল রানা, ওটা দিয়ে সাবধানে তুলে ধরল গোলাপিরঙা চিপটা। বলল, 'এই সেই শয়তান।'

চেপে-রাখা দম ছাড়ল সোহানা। 'এটা খুলতে গেলে আবার কোনো পিং মেসেজ পেয়ে যাবে না তো মেলিখান?'

'মনে হয় না। যেহেতু ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত, তাই এ-চিপের কাজ হচ্ছে ব্যাটারি থেকে ডিভাইসে ডিরেক্ট কারেণ্ট প্রবাহিত হওয়ামাত্র সচল হওয়া এবং নির্দিষ্ট একটা মেসেজ ট্রান্সমিট করা। তারমানে এটাকে যদি সরিয়ে ফেলি, মেলিখান মনে করবে তোমার মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছ।'

'তা হলে জলদি করো কাজটা। মোটেও চাই না কেউ চোখ রাখুক আমার উপর,' রানার দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসল সোহানা। 'বিশেষ করে যখন তোমার সঙ্গে আছি।'

হাসল রানাও, চিপটাকে ডিসেব্‌ল্‌ করে দিল। তারপর ওটা রেখে দিল শার্টের পকেটে। দ্রুত হাতে আই-ফোনটাকে রিঅ্যাসেম্বল করে ফেরত দিল সোহানার কাছে।

বিশ মিনিট পর।

কুয়াশার চাদর উধাও হয়েছে। এখন নীল আকাশে ঝকঝক করছে সূর্য। দূর থেকে সেইন্ট বার্থোলোমিউ'র গির্জাটা দেখা যায়। পেঁয়াজ আকৃতির লাল রঙের গম্বুজগুলো চোখে পড়ছে আগে। গির্জাটা ছাড়িয়ে আরও দূরে তাকালে দেখা যায় নাম-না-জানা কোনো পর্বতের চূড়া, তাতে জমে আছে তুষার। সকালের রোদ থেকে থেকে যেন চিমটি কেটে যাচ্ছে জমাট বরফের গায়ে, চোখ-ধাঁধানো ঝলকানি দেখা যাচ্ছে কখনও কখনও।

গির্জাটা আশপাশের ঘন-জঙ্গলে-ভরা এলাকার তুলনায় ন্যাড়া একটা তৃণভূমিতে তৈরি। ওটা আসলে পাহাড়ি একটা ঢাল, আয়তনে চল্লিশ একরের মতো। দুটো ফেরিঘাট দেখা যাচ্ছে; দর্শনার্থীদের আগমন আর প্রস্থানের জন্য একটা, অন্যটা গির্জার পেছনদিকে—এটাকে ঘাটের চেয়ে বোটহাউস বললেই বেশি মানায় সম্ভবত। ঘাসেছাওয়া সবুজ লন আর হাঁটার জন্য বানানো ফুটপাত আছে গির্জার পেছনে। কাঠের কয়েকটা আউটবিল্ডিং-ও আছে। গির্জার বয়সের চেয়ে ঘরগুলোর বয়স কম হলেও অযত্নের কারণে দৈন্যদশা হয়েছে ওগুলোর। কোনো কোনো ঘর বেশ বড়, কোনোটা আবার ছোট কেবিনের মতো।

ফেরিঘাটের কাছে গিয়েও আরেকটা প্রমোদতরীর কারণে ভেড়ানো গেল না নৌকা। ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চক্কর দিয়ে বেড়ালেন লেকে। ভালই হলো, ভাবল রানা, গির্জার চারপাশে নজর বুলানোর সুযোগ পাওয়া গেল।

অন্য নৌকাটার যাত্রী নামানো শেষ, সাবধানে আস্তে আস্তে

একটা পিয়ারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এখন। এক ক্রুম্যান লাফিয়ে নামল ফেরিঘাটে, দক্ষ হাতে নৌকার দড়িদড়া বেঁধে ফেলল নিরেট লোহার স্তম্ভের সঙ্গে, তারপর কাছিয়ে আসা নৌকার রেলিং ধরে অভ্যস্ত ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে গেল পাটাতনে। তার কাজ দেখে শিস বাজাল রানাদের নৌকার দু'-চারজন যাত্রী—নামকরা বাজিকরের খেলা দেখতে পেয়েছে যেন।

রানাদের প্রমোদতরী এবার এগিয়ে যাচ্ছে ফেরিঘাটের দিকে। অন্য যাত্রীরা উঠে দাঁড়িয়েছে, নামার জন্য কারও তর সইছে না সম্ভবত। সীট ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল সোহানাও, হাত ধরে টেনে ওকে বসিয়ে দিল রানা। চোখের ইশারায় নিষেধ করল। বুঝতে পারল সোহানা। মেলিখান বা ওর লোকেরা যদি থেকে থাকে নৌকায়, রানা-সোহানা না নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে।

কিন্তু সে-রকম কাউকে দেখা গেল না। রানা-সোহানা বাদে নৌকায় এখন আছেন শুধু ক্যাপ্টেন আর তাঁর ক্রুম্যানরা। রানার সঙ্গে চোখাচোখি হলো ক্যাপ্টেনের। মুচকি হাসলেন তিনি, ভ্রূ নাচিয়ে জানতে চাইলেন কোনো সমস্যা আছে কি না। জবাবে হাসল রানাও, মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল কোনো সমস্যা নেই।

ফেরিঘাটের এককোণে ছোট ছোট অস্থায়ী কিছু দোকান দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগই গিফট শপ। ফাস্টফুড আর পানীয়ের দোকানও আছে। আগের নৌকার যাত্রীদের সবাই এখনও সরে যায়নি ফেরিঘাট থেকে। কেউ কেউ জটলা পাকিয়েছে দোকানগুলোর সামনে। কেউ ছবি তুলছে। কেউ আবার কাঁধের ব্যাগ থেকে ম্যাপ বের করে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। নৌকার সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে নামছে রানা-সোহানা, বার বার এদিকে-ওদিকে তাকাচ্ছে দু'জনই। দেখলে মনে হবে না কাউকে খুঁজছে, অথচ মেলিখানের চেহারাটা দেখতে চাচ্ছে। একটু পর পর চোখের কাছে ক্যামেরা তুলছে রানা। যাকেই সন্দেহ হচ্ছে তার

চেহারাটা দেখে নিচ্ছে যুম করে ছবি তোলার বাহানায়।

আগের নৌকাটা বড়, সেখানে যাত্রীও বেশি। কোনো কোনো যাত্রী সঙ্গে ট্যুরগাইডও নিয়ে এসেছে, মনে হয় যতটা না শেখার জন্য তারচেয়ে বেশি অন্যকে দেখানোর জন্য। এ-রকম দু'-চারজন গাইড ইতিমধ্যে গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে, '...বানানো হয়েছে বারো শতকে। বার্থোলোমিউ'র মতো সাধু এ-অঞ্চলে আর আসেননি, আসবেন কি না সন্দেহ আছে। স্থানীয় কৃষক আর গোয়ালারা তাঁকে ত্রাতা হিসেবে মান্য করে...'

'...গির্জার ভিতরটা নকশা করা হয়েছে স্যালযবার্গ ক্যাথেড্রালের মতো করে। আর বাইরের কারুকাজ অনুপম, স্থানীয় এক নকশাবিদ তাঁর জীবনের সেরা কাজটা উপহার দিয়েছেন হয়তো আপনাদের কথা ভেবেই...'

'...আঠারো শ' তিন সাল পর্যন্ত গির্জাসংলগ্ন হান্টিংলজগুলো ইউরোপের নামকরা যুবরাজদের জন্য বিশেষভাবে বরাদ্দ থাকত। তাঁরা এখানে আসতেন, শিকার করতেন, বিশ্রাম নিতেন....

ফেরিঘাটে পা রাখল রানা-সোহানা। অস্থায়ী দোকানগুলোর চারপাশে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে চক্কর দিল কিছুক্ষণ। না, পরিচিত কাউকে দেখা যাচ্ছে না। লেকের দিকে তাকাল রানা। আধ মাইল দূরে আরেকটা প্রমোদতরী দেখা যাচ্ছে, ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ফেরিঘাটের দিকে। ওটার এক মাইল পেছনে আরেকটা।

'কী ভাবছ?' ওকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'ভাবছি দুটো কাজ করা যায় এখন। এখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারি পরের নৌকা দুটোর জন্য। এই দোকানগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে সহজেই দেখতে পারবো কে কে আসছে। মেলিখান বা ওর লোকদের চিনতে অসুবিধা হবে না তখন। দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে, জাহান্নামে যাক মেলিখান আর তার চামচারা—ভেবে নিয়ে মিশে যেতে পারি জনতার ভিড়ে।

নেপোলিয়নের কোডে কেন বলা হয়েছে বার্থোলোমিউ'র গির্জার কথা, বের করার চেষ্টা করতে পারি।'

'দ্বিতীয় কাজটা করাই উচিত হবে মনে হয়। ওটাই বেশি লাভজনক। তা ছাড়া আমি অপেক্ষা করার পক্ষপাতী নই।'

'চলো তা হলে।'

ফাস্টফুডের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল, জায়গা পরিবর্তন করে গিফটশপগুলোর কাছে চলে গেল ওরা। কী মনে হতে সোহানাকে নিয়ে একটা দোকানে ঢুকে পড়ল রানা।

জামাকাপড়সহ অন্যান্য গিফট আইটেম সাজিয়ে রাখা হয়েছে থরে থরে। র‍্যাক থেকে একটা হালকা হলুদ আর একটা ঘন নীল রঙের সোয়েটশার্ট বাছাই করল রানা। আরেকদিকের র‍্যাক থেকে বের করল ঢলঢলে দুটো হ্যাট। একটা শার্ট আর হ্যাট দিয়ে সোহানাকে পাঠিয়ে দিল চেঞ্জরুমে। ও বাইরে আসার পর নিজে গিয়ে ঢুকল, শার্ট পরে হ্যাট মাথায় দিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর একটা ব্যাকপ্যাক নিয়ে ক্যামেরাটা চালান করে দিল সেটার ভিতরে।

চেঞ্জরুম থেকে বাইরে আসতে সময় লাগল রানার। তাই ও বের হওয়ার সময় ভ্রূ নাচিয়ে কারণ জানতে চাইল সোহানা। জবাবে মুচকি হেসে শুধু মাথা নাড়ল রানা, কিছু বলল না।

ইতিমধ্যেই যদি ওদেরকে দেখে ফেলে থাকে মেলিখান আর ওর লোকেরা, রানা আশা করছে অতি সাধারণ এই ছদ্মবেশে কিছুটা হলেও ফাঁকি দিতে পারবে। শার্ট, হ্যাট আর ব্যাকপ্যাকের দাম চুকিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এল দু'জনে, মিশে গেল জনতার ভিড়ে।

এতক্ষণে দু'শ'র মতো লোক জমে গেছে। তাদের অনেকের গায়ে রানা-সোহানার মতো বাহারি রঙের পোশাক।

'রেডি?' সোহানার দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাবে হাসল সোহানাও। 'তোমার সঙ্গে থাকলে, সবসময়।' খোঁপা করেছে ও, কপালের উপর নেমে-আসা কিছু চুল আঙুল দিয়ে ঠেলা মেরে ঢুকিয়ে দিল হ্যাটের নীচে। 'চলুন, জেনারেল। যেখানে নিয়ে যাবেন, যাবো।'

পরের আধঘণ্টা ফেরিঘাটের চারপাশে জনতার ভিড়ে আবারও উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল রানা। দূর থেকে লেক, পাহাড় আর জঙ্গলটাকে দেখতে অসাধারণ সুন্দর লাগছে। কিন্তু ভুলেও ক্যামেরা বের করছে না রানা। মেলিখানের চোখে ধরা পড়তে চায় না।

হঠাৎ ওর একটা হাত চেপে ধরল সোহানা। 'পেয়েছি!'

'মেলিখানকে? কোথায়?' সোহানা যেদিকে তাকিয়ে আছে তার ঠিক উল্টোদিকে তাকাল রানা ইচ্ছা করে।

'যে-নৌকাটা ফেরিঘাটে ভেড়ার জন্য অপেক্ষা করছে এখন সেটাতে। সামনে থেকে চার নম্বর জানালার পাশে বসেছে শয়তানটা। মুখ বের করে তাকিয়ে আছে দোকানগুলোর দিকে।'

ধীরেসুস্থে, যেন কোনো তাড়া নেই এমন ভঙ্গিতে ঘুরল রানা। যে-নৌকাটা ভিড়তে যাচ্ছে ফেরিঘাটে সেটার দিকে তাকাল। ইচ্ছা করেই দাঁত বের করে রেখেছে, যেন সোহানার কোনো কথায় মজা পেয়েছে। কিছু বলার ভান করে ঠোঁট নাড়াল, আসলে কিছুই বলেনি। হাসিটা আরও চওড়া হলো, প্রায় সবগুলো দাঁত দেখা যাচ্ছে এখন।

ঘুরল রানা, তাড়াহুড়ো করল না। সোহানার হাত ধরে টান দিল। গিফটশপগুলোর দিকে যাচ্ছে আবার। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে, সোহানা।'

'কী?'

'চেঞ্জিংরুমে যখন ছিলে তুমি তখন একটা কাজ করেছি। মোবাইলের স্পেয়ার ব্যাটারি কিনেছি আরেক দোকান থেকে,

তারপর নিজে কাপড় চেঞ্জ করার সময় ট্রান্সপণ্ডারটাকে যুক্ত করে দিয়েছি ওটার সঙ্গে। এ-কারণে কিছুটা দেরি হয়েছে আমার। এখন তোমাকে যা করতে হবে তা হলো, যেখান থেকে শার্ট আর হ্যাট কিনেছি সে-দোকানে গিয়ে ঢুকতে হবে আবারও। সোয়েটশার্ট ঠিকমতো ফিটিং হচ্ছে না বলে আবারও ঢুকে পড়বে চেঞ্জিংরুমে। কাপড় ঠিক করার বাহানায় চিপটাকে রুমের ভিতরে, সহজে লোকের চোখ পড়বে না এমন জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আসবে। যেহেতু ব্যাটারির সঙ্গে যুক্ত সেহেতু পিং মেসেজ পাঠিয়েছে চিপ, তাই মেলিখান জানে আমরা আছি কাছাকাছি। আমি চাই কথাটা জানতে থাকুক সে, আর সে-সুযোগে নিজেদের কাজটা সেরে ফেলতে পারবো।'

'কিন্তু...বেশিক্ষণ ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না মেলিখানকে। সে ঠিকই বুঝে যাবে...'

'আমিও জানি বুঝে যাবে সে। কিন্তু যতক্ষণ না বোঝে ততক্ষণই লাভ।'

'আমি যখন চেঞ্জিংরুমে থাকবো তখন তুমি কী করবে?'

'এগোতে শুরু করবো গির্জার দিকে। অন্তত ওখানে ঢোকার আগের সময়টুকু আলাদা থাকলেই ভালো হয় আমাদের জন্য। ধরে নিচ্ছি আমাদেরকে হারিয়ে ফেলবে মেলিখান, কাপড় দেখেও চিনতে পারবে না। তখন সে কী করবে জানো? দেখতে শুরু করবে কারা কারা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

রানার সামনে এখন যে-ক'জন ট্যুরিস্ট হেঁটে যাচ্ছে তাদের প্রায় সবার সঙ্গে গাইড আছে। দু'-চারজন আছে যারা গাইড নেয়নি। নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এরা। সমান মাপের বড় বড় সিমেন্টের-ব্লক জমিতে ফেলে পেভমেন্ট বানানো হয়েছে, ওটা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছে ওরা।

চলতে চলতে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা। ফেরিঘাটের কাছে ভিড়েছে মেলিখানদের নৌকা, তিন সঙ্গীকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে সে। চারজনের কাছেই ফায়ারআর্মস আছে সম্ভবত, ভাবল রানা।

একা হতেই নেপোলিয়নের ধাঁধাটা ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে ওর মনে। আর দুটো লাইনের সমাধান বের করতে পারলেই...

দ্য জিনিয়াস অভ আইওনিয়া, হিজ স্ট্রাইড আ ব্যাটল অভ রাইভালস

আ ট্রায়ো অভ কইনস্, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল পয়েন্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা

প্রথম লাইনের কী যেন বার বার কাঁটার মতো বিঁধছে রানার মনে। বার বার মনে হচ্ছে, ঐতিহাসিক কোনো কিছুর সঙ্গে যোগাযোগ আছে লাইনটার, কিন্তু বুঝি বুঝি করেও সেটা বোঝা হয়ে উঠছে না। হাঁটছে আর কথাগুলো ভাবছে ও।

অন্যমনস্ক ছিল, তাই পিছনের মহিলার কথা বুঝতে সময় লাগল ওর।

'পার্ডন মি, প্লিয।'

কথাটা শুনেও শুনল না রানা।

'এক্সকিউয মি...'

এবার ঘুরে তাকাল রানা। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে ক্রাচে ভর দিয়ে। রানা তাকানোমাত্র হাসল, আবারও বলল, 'এক্সকিউয মি...'

পেভমেন্ট থেকে নেমে দাঁড়াল রানা, মহিলাকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিল। ঘাড় ঘুরিয়ে আরও একবার তাকাল ফেরিঘাটের দিকে। না, মেলিখান বা ওর চামচাদের দেখা যাচ্ছে না। হয়তো গিফটশপগুলোর দিকে গেছে। সোহানা কোথায়?

ওকেও দেখা যাচ্ছে না। হয়তো ট্যুরিস্টদের অন্য কোনো দলের সঙ্গে মিশে গেছে, এগিয়ে আসছে গির্জার দিকে।

ক্রাচে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে খোঁড়া মহিলা। পেছন থেকে সরু চোখে তাকে দেখছে রানা। মহিলার একটা পা অন্যটার চেয়ে খাটো। শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য স্বাভাবিকভাবেই একটা ক্রাচ আরেকটার চেয়ে খাটো করতে হয়েছে।

'স্ট্রাইড...' বিড়বিড় করছে রানা, 'মানে পদক্ষেপ। ব্যাটল অভ রাইভালস...মানে প্রতিদ্বন্দ্বীদের লড়াই...' হঠাৎ করেই বুঝতে পারল রানা কী বোঝাতে চেয়েছেন নেপোলিয়ন। পকেট থেকে আই-ফোনটা বের করল। ইন্টারনেটে ঢুকে গুগলে সার্চ দিল। প্রাচীন গ্রীস আর আইওনিয়ান লিগ লিখে খুঁজতে শুরু করল। মনের মতো রেযাল্ট পেতে দেরি হলো না।

আইওনিয়ান লিগের একটা সদস্য ছিল সামোস দ্বীপপুঞ্জ, পিথাগোরাসের জন্মস্থান। আর পিথাগোরাসকে বলা হয় ত্রিভুজের জনক, বিশেষ করে সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের।

মহিলার ক্রাচের দিকে আবারও তাকাল রানা। একটা ক্রাচ আরেকটার চেয়ে ছোট। ত্রিভুজের হিসেবে চিন্তা করলে বিষমবাহু ত্রিভুজ। কিন্তু পিথাগোরাস ছিলেন সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের জনক।

'যে-ত্রিভুজের দুটো বাহু সমান তাহাকে বলা হয় সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ,' স্কুলে থাকতে জ্যামিতিতে পড়া সংজ্ঞা আউড়াল রানা, 'এখন একটা বাহুকে যদি আরেকটার প্রতিদ্বন্দ্বী ধরা হয় তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় দ্য ব্যাটল অভ রাইভালস।'

অর্থাৎ, হেসে ভাবল ও, গির্জার ভিতরে কোনো এক জায়গায় একটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ খুঁজতে হবে। যেটার ভিতরে সেই মৌমাছির প্রতীক থাকবে সম্ভবত। তা হলে আর একটা লাইন বাকি থাকে। আ ট্রায়ো অভ কইনস্, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল

পয়েন্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা।

আনমনে হাঁটতে হাঁটতে গির্জার কাছাকাছি চলে এসেছে রানা, খেয়াল করেনি। আই-ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে রেখে এদিক-ওদিক তাকাল। প্রায় চার শ' গজ দূরে, গিফটশপগুলোর কাছে, পাগলের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে মেলিখান আর তার চামচারা। কোনো-না-কোনো উপায়ে প্রায় প্রতিটা ট্যুরিস্টের পথ আটকে চেহারা দেখছে। মুচকি হাসল রানা, দৃষ্টি সরিয়ে তাকাল আরেকদিকে। সোহানাকে দেখা গেল এবার। একদল ট্যুরিস্টের সঙ্গে মিশে গেছে, ঘাসে ছাওয়া জমিন ধরে এগিয়ে আসছে গির্জার দিকে। ইতিমধ্যে বান্ধবী বানিয়ে নিয়েছে এক শ্বেতাঙ্গিনীকে। খোশ গল্প জুড়ে দিয়েছে মেয়েটার সঙ্গে।

ঘুরতে যাচ্ছিল, এমন সময় একটা দৃশ্য দেখে থামতে হলো রানাকে। ব্যতিব্যস্ত হয়ে পকেট থেকে নিজের মোবাইল বের করছে মেলিখান, স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখল কিছুক্ষণ। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকল তিন চামচাকে। ওরা কাছে যাওয়ামাত্র সংক্ষিপ্ত নির্দেশ দিল। এরপর দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা। ধীর পায়ে ফেরিঘাটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে একটা দল। এক চামচাকে সঙ্গে নিয়ে ফাস্টফুডের দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল মেলিখান।

রানার কাছে এসে দাঁড়াল সোহানা। বলল, 'ওদেরকে দেখেছি আমিও। দুটো দলে ভাগ হয়ে গেল। যারা ফেরিঘাটের দিকে গেছে তারা ওখান থেকে নড়বে বলে মনে হয় না। আমরা কি তা হলে ফাঁদে পড়ে গেলাম?'

প্রশ্নটার জবাব দিল না রানা। সোহানাকে নিয়ে ঢুকে গেল গির্জা-ঘিরে-রাখা উঁচু কাঠের-বেড়ার ভিতরে। এককোণে সরে এসে বলল, 'একটা সুসংবাদ আছে।'

'কী?' সোহানার চোখেমুখে আগ্রহ।

সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ব্যাপারটা বলল রানা।

'তারমানে গির্জায় ঢোকার আগে,' বের হয়ে-আসা চুল ঠেলে আবার হ্যাটের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল সোহানা, 'কী খুঁজতে হবে জেনে গেলাম।'

'সেই সঙ্গে এ-ও জেনে গেছি,' আকাশ ছুঁতে-চাওয়া লাল গম্বুজের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'আমাদেরকে বেশি সময় দেবে না মেলিখান। গির্জার দিকে আসবেই সে।'

সতেরো

'কইন্,' রানার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বলল সোহানা, 'তিনটে মানে পেয়েছি শব্দটার। প্রিন্টিংমেশিনের ব্লক আটকানোর গোঁজ, কামানের নল উপরের দিকে তোলার কাজে ব্যবহৃত কীলক আর খিলানে ব্যবহৃত কর্নারস্টোন। আমার মনে হয় শেষেরটাই হবে। কারণ কাছেপিঠে কোথাও প্রিন্টিংপ্রেস বা কামান দেখতে পাচ্ছি না।'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। মেলিখান যেদিকে গেছে, ঘাড় ঘুরিয়ে বার বার সেদিকে তাকাচ্ছে। একইসঙ্গে ভাবছে নেপোলিয়নের ধাঁধাটা নিয়েও। সোহানার থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে হাঁটছে, দু'জনে এগিয়ে যাচ্ছে গির্জার দিকে। কখনও আবার ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছে কাছের ট্যুরিস্টদেরকে।

'কর্নারস্টোনের কথা যদি বলি,' আবারও বলল সোহানা, 'বার্থোলোমিউ'র গির্জায় অনেকগুলো পাওয়া যাবে। কিন্তু

আউটবিল্ডিংগুলোতে একটাও নেই সম্ভবত, না?'

রানা কোনো জবাব দিল না।

'আউটবিল্ডিংগুলোতে নেই, কারণ ওগুলো কাঠ দিয়ে বানানো,' রানা নিশ্চুপ দেখে জবাব দিয়ে দিল সোহানাই।

হাতের বাঁ দিকে কাঠ দিয়ে বানানো বেড়া। পিছনটা ভরে আছে ঝোপঝাড়ে। বেড়ার এপাশে, পেভমেণ্টের সঙ্গেই, ছাতার নীচে কয়েকটা টেবিল পাতা। রোদ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চেয়ারে বসে পড়েছে পাঁচ-ছ'জন ট্যুরিস্ট। ওদের মনোরঞ্জনের জন্য টেবিলগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে বাজনা বাজাচ্ছে একদল স্থানীয় বাদক। এদেরকে ছাড়িয়ে গির্জার সামনে দিয়ে ঘুরে পেছনের লনে চলে এল রানা-সোহানা।

'কামান,' হঠাৎ থেমে দাঁড়াল রানা, হাত তুলে দেখাচ্ছে, 'একজাতের।'

ও যেদিকে দেখাচ্ছে সেদিকে তাকাল সোহানা। ত্রিশ গজ দূরে, লনের প্রায় মাঝখানে দেখা যাচ্ছে কোমর-সমান উঁচু পাথরের একটা পেডেস্টাল। সেটার মাথায় ব্রোঞ্জের একটা সেক্সট্যাণ্ট—দিগন্তে সূর্যের উন্নতি মাপার জন্য ব্যবহৃত পূর্ব-আধুনিক নেভিগেশন যন্ত্র। একটা সেক্সট্যাণ্ট দৈর্ঘ্যে সাধারণত একটা খোলা হার্ডকভার বইয়ের সমান হয়, কিন্তু এটা চার কি পাঁচ গুণ বেশি—কমপক্ষে চার ফুট। যে বা যারা বানিয়েছে, বোধহয় টেলিস্কোপ বানাতে গিয়ে ভুলে সেক্সট্যাণ্ট বানিয়ে ফেলেছে। হাস্যকর রকমের বড় নলটা কামানের নলের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

পায়ে পায়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা-সোহানা। লনে বেশি লোক নেই, বেশিরভাগ ট্যুরিস্ট হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে পেভমেণ্টের উপর। গির্জা অথবা দূরের পর্বতের দিকেই নজর সবার।

'দেখো,' রানার হাত ধরে হালকা টান দিল সোহানা, 'পেডেস্টালের গায়ে একটা ফলক দেখা যাচ্ছে। জার্মান ভাষায় কী যেন লেখা আছে।'

ঝুঁকে পড়ে লেখাটা পড়ল রানা, তারপর বাংলায় বলল, 'আঠারো শ' ছয় সালের অগাস্টে রাইন কনফেডারেশনের সদস্য এবং বাভারিয়ার রাজা প্রথম ম্যাক্সিমিলানকে ফ্রান্সের সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের পক্ষ থেকে,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সোহানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সোহানা, কী যেন দেখল কিছুক্ষণ। তারপর আবার রানার হাত ধরে টান দিল। 'দেখো, তাড়াতাড়ি!'

বসে পড়ল রানাও। সোহানা যা দেখছে, মনোযোগ দিল সেদিকে। সেক্সট্যান্টটার নীচের দিকে একটা ভার্টিকাল ইনডেক্স আর্ম আছে। ওটা এমনভাবে বসানো হয়েছে যাতে সেক্সট্যান্টের সঙ্গে সংযুক্ত একটা বাঁকানো আর্কের উপর ঘুরতে পারে। আর্কটার গায়ে অনেকগুলো খাঁজ খোদাই-করা। প্রতিটা খাঁজ এক ডিগ্রির ষাট ভাগের এক ভাগ নির্দেশ করছে। তারমানে ইনডেক্স আর্মের নির্দেশনা অনুযায়ী আর্কে এখন যতটা গ্যাপ আছে, সেটা হলো বর্তমান রিডিং। একনজর দেখল রানা: সত্তর।

উঠে দাঁড়াল ও এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল খানিকটা। দূরের আউটবিল্ডিংগুলোর কাছে, কয়েকটা গাছের আড়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছে মেলিখান আর ওর এক সহচর। কোন্ ফাঁকে এতটা কাছে এসে পড়ল ওরা? রানা-সোহানাকে চিনতে পারেনি মনে হয়।

'সেক্সট্যান্টটা যদি কামান হয়,' মেলিখানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলছে রানা, 'আর আর্কের গায়ে খোদাই-করা খাঁজগুলো কইন, তা হলে মানতে হবে লোরনের ধাঁধার এই অংশটা রূপক।'

'মানলাম,' স্বীকার করে নিল সোহানা।

'লাইনটা মনে করো: আ ট্রায়ো অভ কইনস্, দেয়ার ফোর্থ লস্ট, শ্যাল পয়েন্ট দ্য ওয়ে টু ফ্রিজিসিঙ্গা। তারমানে চতুর্থ কইনটা হলে গ্রুপ পুরো হবে। এখন তোমার কাছে যদি পূর্ণাঙ্গ একটা গ্রুপ থাকে তা হলে বলো তো, শতকরার হিসেবে কতখানি আছে?'

'সহজ। এক শ'।'

'তারমানে সেক্সট্যান্টের প্রতিটা কইন পুরোটার চারভাগের একভাগ নির্দেশ করছে। ক'টা খাঁজ আছে গোনো তো?'

'এক শ' বিয়াল্লিশ,' কিছুক্ষণ পর বলল সোহানা।

'তারমানে এক শ' বিয়াল্লিশকে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে। পাওয়া যাবে পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ। ভাগফলকে গুণ করতে হবে তিন দিয়ে। রেযাল্ট এক শ' ছয় দশমিক পাঁচ। অর্থাৎ আমরা যদি ব্যারেলটাকে তুলে এক শ' ছয় ডিগ্রিতে নিয়ে যাই...'

কাজটা না করে আবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, ওর দেখাদেখি সোহানাও। এক শ' ছয় ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে নিয়ে গেলে ব্যারেলটা কোন্‌দিকে নির্দেশ করতে পারে বোঝার চেষ্টা করছে।

সবচেয়ে কাছের লাল রঙা গম্বুজের উপরের মিনারটা দেখা যাচ্ছে।

আরও একবার দৃষ্টি বিনিময় করতে হলো রানা-সোহানাকে।

গির্জার দিকে দশ কদমও এগোয়নি ওরা, এমন সময় লাউডস্পিকারে প্রথমে জার্মান ভাষায় পরে ইংরেজিতে ঘোষণা করা হলো: 'সম্মানিত দর্শনার্থীদেরকে জানানো যাচ্ছে, আমরা এইমাত্র খবর পেয়েছি, ঝড় আসছে। জোরালো বাতাসের আশঙ্কায় পার্ক আজকের মতো বন্ধ করে দিতে হচ্ছে আমাদেরকে। আপনাদের অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আপনারা দয়া করে ফেরিঘাটের দিকে সুশৃঙ্খলভাবে

এগিয়ে যান এবং পার্কস্টাফদের নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করুন। ধন্যবাদ।'

রানা-সোহানার আশপাশ থেকে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল। মা-বাবারা গলা ফাটিয়ে তাদের বাচ্চাদের ডাকছে। কেউ কেউ মুখ তুলে তাকিয়েছে নীল আকাশের দিকে, কোথায় মেঘ জমেছে জানতে চায়।

সোহানা বলল, 'আমি তো কোনো...'

'ওই যে, ওখানে,' হাত তুলে দেখিয়ে দিল রানা।

দিগন্তের দক্ষিণপশ্চিম কোণে, পর্বতের চূড়া ছাড়িয়ে আরও উপরে জমতে শুরু করেছে লালচে-কালো মেঘ। স্লো-মোশন ছায়াছবির মতো এগিয়ে আসছে ওটা, যত এগোচ্ছে তত নামছে, শেষপর্যন্ত পার্কের উপরে এসেই তাণ্ডবলীলা চালাবে হয়তো।

বিপদ বুঝতে পারছে দর্শনার্থীরা, সারি বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে ফেরিঘাটের দিকে। কেউ দৌড়াচ্ছে, কেউ আবার কুছ-পরোয়া-নেই ভঙ্গিতে হাঁটছে। হালকা নীল শার্ট-পরা পার্কস্টাফদের দেখলে যে-কারোরই রাখালের কথা মনে পড়ে যাবে এখন। সারা পার্কে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে তারা, যারা হেলেদুলে হাঁটছে তাদেরকে তাড়া দিচ্ছে, সন্তানদের আগলে রাখতে সাহায্য করছে মা-বাবাদেরকে।

'আমি ফিরে যেতে চাই না,' সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল রানা। 'তুমি ইচ্ছা করলে...'

'তুমি কেন যে মাঝেমধ্যে আমার সঙ্গে এ-রকম আজগুবি ব্যবহার করো বুঝি না,' মুখ ঝামটা মারল সোহানা। 'আমি কি কচি খুকি? তোমার সঙ্গে থাকছি আমি। কোথাও যাবো না।'

'কিন্তু...'

'ব্যস,' হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল সোহানা। 'এ-বিষয়ে আর কোনো কথা না। এবার বলো কোথায় লুকাবো।'

'চলো তা হলে।'

পঞ্চাশ গজ দূরে একটা পেভমেন্ট দেখা যাচ্ছে, বাঁয়ে বাঁক নিয়ে চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। ডানে, ফেরিঘাটের দিকে এগিয়েছে আরেকটা পেভমেন্ট। বাঁ দিকের পথটা বেছে নিল ওরা, দ্রুত পায়ে হাঁটছে। ওদেরকে পাশ কাটিয়ে উল্টোদিকে চলে গেল ডজনখানেক দর্শনার্থী।

একজন যেতে যেতে জার্মান ভাষায় রানাকে বলল, 'ভুল হচ্ছে, ভায়া, ফেরিঘাট এদিকে না।'

সম্মতি জানানোর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মনে করিয়ে দেয়ার জন্য ধন্যবাদ। আসলে আমার ক্যামেরাটা ফেলে এসেছি।'

মিনিটখানেকের মধ্যে জঙ্গলের কাছাকাছি পৌঁছে গেল ওরা। এখান থেকে পেভমেন্টটা আবারও বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে, আউটবিল্ডিংগুলোর দিকে গেছে। ওদিকে গেল না ওরা। পেভমেন্ট ছেড়ে নেমে পড়ল, বেড়ার এপাশে চলে এসে ঝোপগুলোর আড়ালে আড়ালে এগোচ্ছে। এক শ' ফুটের মতো এগোনোর পর থামল। একটা পাইন গাছের ঘন ডালপালার নীচে বসে পড়ল।

আকাশে আরও ঘন হয়েছে মেঘ। ওপর থেকে গুড়গুড় শব্দে ধমক মারা হলো। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে।

একজায়গায় বসে থেকে পরের বিশটা মিনিট তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রানা-সোহানা। দর্শনার্থীদের প্রথম দলটা সুশৃঙ্খলভাবে গিয়ে উঠল বড় প্রমোদতরীটাতে। ওদেরকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই রওয়ানা হয়ে গেল নৌকাটা। আরও দুটো নৌকা নবাগতদের নিয়ে ভিড়তে যাচ্ছিল ফেরিঘাটে, আবহাওয়ার খবর জানতে পেরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে ওগুলো। রানারা যে-নৌকায় এসেছিল তার ক্যাপ্টেনকে দেখা যাচ্ছে ফেরিঘাটে। নৌকায় উঠে পড়ার জন্য তাড়া দিচ্ছেন নিজের যাত্রীদেরকে।

কমতে কমতে একসময় মিলিয়ে গেল দর্শনার্থীদের

কোলাহল। এখন শোনা যাচ্ছে জোরালো বাতাসের আওয়াজ আর থেকে থেকে গাছের পাতা কেঁপে ওঠার শব্দ। ফেরিঘাটে যারা রয়ে গেছে এখনও তাদের চেঁচামেচি কানে আসছে। ত্রিশ সেকেণ্ড পর পর এভাকুয়েশনের নোটিশ পড়া হচ্ছিল লাউডস্পিকারে, সেটা বন্ধ হয়ে গেছে।

'ঠাণ্ডা লাগছে,' নিচু গলায় বলে উঠল সোহানা।

ব্যাকপ্যাক থেকে সোয়েটশার্ট আর উইণ্ডব্রেকার বের করল রানা। নিজের জন্য এক জোড়া রেখে আরেকজোড়া দিল সোহানাকে।

ওগুলো গায়ে চড়িয়ে সোহানা বলল, 'কী মনে হয় তোমার? মেলিখান আর ওর লোকেরা চলে গেছে?'

'মনে হয় না। আমাদেরকে না দেখা পর্যন্ত ফেরিঘাট ছেড়ে নড়বে না ওরা। খারাপটা ধরে নেয়াই ভালো, সোহানা।'

এক ঘণ্টা পর।

রানারা যে-নৌকায় করে এসেছিল সেটা চলে গেছে। বাতাসের বেগ আরও বেড়েছে। একটু পর পর নুয়ে পড়ছে আশপাশের গাছগুলো। এত জোরে নড়ছে ওগুলোর ডাল, দেখলে মনে হয় দুই হাতে ধরে ঝাঁকাচ্ছে কোনো দানব। ঝরাপাতা উড়ে বেড়াচ্ছে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে। তুষার পড়তে শুরু করেছে। বাতাসের ধাক্কায় উড়ে বেড়াচ্ছে পড়ন্ত তুষারকণাও। কোনো কোনো গাছের নীচে, পার্কের ঘাসের-গালিচার কোথাও কোথাও জমাট বেঁধে সাদা সাদা ছোপ তৈরি করেছে তুষার। কিন্তু সেগুলোও বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারছে না বাতাসের দাপাদাপির কারণে। থেকে থেকে সারা পার্কে তুষারঘূর্ণি বয়ে যাচ্ছে মাতাল হাওয়ার কারণে।

'চলো উঠি,' বলল রানা, 'কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।'

'কোন্ দিকে যাবে?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'আউটবিল্ডিংগুলোর ওদিকে?'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। 'ঠিক আছে, চলো ওদিকেই যাই।'

প্রথমে ঝোপগুলোর কাছে হাজির হলো দু'জনে, তারপর বেড়া ডিঙিয়ে খানিকটা হেঁটে পেভমেন্টে উঠল। দেখলে মনেই হয় না ঘণ্টা দেড়েক আগে এখান দিয়েই হেঁটে গেছে ওরা। তুষারের কারণে সাদা হয়ে গেছে পেভমেন্ট, পিচ্ছিল হয়ে গেছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। একটা লগ কেবিনের সামনে হাজির হতে সময় লাগল ওদের।

কেবিনের ছাদটা নিচু, দুই ঢালবিশিষ্ট। একাধিক জানালা আছে, কিন্তু সেগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়েছে তক্তা মেরে। কেবিনটা বেশ লম্বা, এক শ' ফুটের কাছাকাছি হবে। একদিকের দেয়ালে দরজা দেখা যাচ্ছে, তার নীচে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। ওটা দিয়ে উঠে দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল রানা। আশ্চর্য, পাল্লা খুলে গেছে! দরজাটা লক করা ছিল না।

ভিতরে ঢুকল রানা-সোহানা। মনে হচ্ছে কোনো স্টোররুমে হাজির হয়েছে। সামনে একটা ব্যালকনি আছে। অস্বচ্ছ কাঁচ দিয়ে-ঢোকা মরা-আলো বাদ দিয়ে বললে ঘরের ভিতরটা অন্ধকার।

'তারপরও ঠাণ্ডা বাতাস থেকে বাঁচার জন্য কেবিনটা খারাপ না, নাকি?' হালকা গলায় বলল রানা।

'ভালো-মন্দ আপেক্ষিক ব্যাপার,' সোয়েটশার্ট থেকে ঝাড়া দিয়ে তুষার ফেলতে ফেলতে বলল সোহানা।

ঘরের গরম একটা কোনার দিকে এগিয়ে গেল দু'জনে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে গায়ে গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

আরও আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করল ওরা।

পার্কস্টাফদের সবাই হয়তো চলে গেছে এতক্ষণে। বাইরে বাতাসের দাপাদাপি কিছুটা কমেছে। জানালা দিয়ে আসা আলোর নিষ্প্রভতা দেখলে বোঝা যায় তুষারপাত আরও ভারী হয়েছে। কাছের এক জানালায় ঠিকমতো তক্তা আটকানো হয়নি, অথবা আটকানো হলেও সরে গেছে, একটা পাইন গাছ দেখা যাচ্ছে। তুষার-জমা সরু ডাল দেখলে কেন যেন কঙ্কালের হাতের কথা মনে হয়।

হঠাৎ ঝট্ করে মাথা তুলল সোহানা।

'কী?' ফিসফিস করে জানতে চাইল রানা।

ঠোঁটে আঙুল রেখে কথা বলতে নিষেধ করল সোহানা। ইশারায় দেখিয়ে দিল কাছের জানালাটা।

ওদিকে তাকাল রানা।

তুষারের উপর কার যেন পায়ের-আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। সাবধানে এগিয়ে আসছে লোকটা। হাঁটার গতি একটানা না, এগোবে কি না সে-ব্যাপারে সন্দিহান হয়তো। একটু পরে জানালায় উঁকি দিল চেহারাটা। ছায়ামূর্তি, চেনা যায় না।

ঘরের ভিতরটা দেখার চেষ্টা করছে লোকটা। দেখল কিছুক্ষণ, আসলেই কিছু দেখতে পেল কি না কে জানে! যেমন আচমকা হাজির হয়েছিল, তেমনি হঠাৎ করেই বিদায় নিল জানালার কাছ থেকে। জুতোর শব্দ সরে যাচ্ছে দূরে।

'রানা!' ফিসফিস করে বলল সোহানা। 'দরজাটা আটকানো হয়নি।'

কথাটা খেয়াল ছিল না রানার। জুতো জোড়া খুলে ফেলল ও, এত দ্রুত যে, দেখলে মনে হবে ওর জুতোর ভিতরে বিছা ঢুকেছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে শুরু করল। দরজার দিকে যাচ্ছে, কাঠের মেঝের সঙ্গে জুতোর সংঘর্ষে যাতে আওয়াজ না

হয় সেজন্য জুতো খুলে ফেলেছে। দরজার কাছে গিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে উঁচু হলো, হাতড়ে হাতড়ে বুঝল ভিতর থেকে লক করার ব্যবস্থা আছে। দেরি না করে লক করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়ল।

বাইরে জুতোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে আবারও। লোকটা কেবিনের কোন ঘুরে এদিকে আসছে। সিঁড়ির সামনে এসে থামল, আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করেছে। কিছুক্ষণ পরই দরজার হাতল ধরে মোচড় দিল। কয়েকবার মোচড়াল। লাভ হচ্ছে না দেখে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। জুতোর মচমচানি শুনে বোঝা গেল চলে যাচ্ছে সে।

'হ্যালো?' ডাক শুনে চমকে উঠল রানা, ঝট্ করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জানালার দিকে। দ্বিতীয় একটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে, প্রথম লোকটা ঝেড়ে দৌড় দিলেও এত তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবে না সেখানে, রানা নিশ্চিত দৌড় দেয়নি প্রথম লোকটা।

'হ্যালো?' জার্মান ভাষায় আবার জিজ্ঞেস করল জানালায় দাঁড়িয়ে-থাকা লোকটা। 'পার্কস্টাফ। ভিতরে কেউ আছেন?'

এক মুহূর্ত দেরি না করে শুয়ে পড়ল রানা এবং গড়াতে শুরু করল। দরজার কাছ থেকে যত দূরে সম্ভব, অন্ধকার কোনার দিকে সরে যেতে চায়, যেখানে সোহানা আছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে মেঝের কোনো কাঠ যেন আলগা না হয়।

'ভিতরে কেউ থাকলে সাড়া দিন দয়া করে,' ঝরঝরে জার্মানে আবারও বলে উঠল জানালার ছায়ামূর্তি। 'ওয়েদার এভাক্যুয়েশন চলছে। কেউ আটকা পড়ে থাকলে তাকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছি আমরা।'

জার্মান-ফ্রেঞ্চ-ইটালিয়ান যে-ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, কণ্ঠের মালিককে ভালোমতোই চেনে রানা-সোহানা।

মেলিখান।

আঠারো

জানালাটা যেদিকের দেয়ালে, গড়াতে গড়াতে সে-দেয়ালের কাছে চলে এল রানা, শুয়ে থাকল দেয়াল ঘেঁষেই। আসার সময় টান দিয়েছে সোহানাকে, রানার কায়দায় সোহানাও চলে এসেছে জানালার নীচে। দু'জনে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। যে-অ্যাঙ্গেলে আছে মেলিখান, ঘাড় হাজারবার কাত করলেও রানা-সোহানাকে দেখতে পাবে না, অন্তত ভিতরের এই অন্ধকারে না।

'কেউ একটা ফ্ল্যাশলাইট আনো,' চিৎকার করে আদেশ দিল মেলিখান।

চার-পাঁচ মিনিট পর উজ্জ্বল ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল জানালার ওপাশে। আলো ফেলে ফেলে দেখছে মেলিখান। দু'-তিনবার রানা-সোহানার কাছ দিয়ে চলে গেল আলো, কিন্তু ওদের গায়ে পড়ল না।

'বস্, ভিতরে কেউ নেই মনে হচ্ছে,' রাশান ভাষায় বলল মেলিখানের কোনো চামচা।

'চলো এখানে আর সময় নষ্ট না করে অন্য ঘরগুলোতে গিয়ে দেখি,' মেলিখানের গলায় অসন্তুষ্টি।

জমাট তুষারের উপর দিয়ে একসঙ্গে হাঁটতে লাগল লোকগুলো, মচমচ আওয়াজ শোনা যায়। হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল রানা, সাবধানে এগোচ্ছে জানালার দিকে। কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখল বাইরে। কিছুক্ষণ পর সরে এল জানালার

কাছ থেকে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে সোহানাকে বুঝিয়ে দিল সব ঠিক আছে। তারপর আবারও বাইরে তাকাল। তুষার পড়ার গতি বেড়েছে, তুষারকণাগুলোও আগের চেয়ে বড় আর ভারী হয়েছে। অল্পতেই নিরুৎসাহিত হয়ে মেলিখানের ওভাবে চলে যাওয়াটা ব্লাফ হতে পারে, আবার না-ও পারে। লোকটা প্রফেশনাল, একজায়গায় বেশিক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করতে চায়নি হয়তো। অথবা হতে পারে কিছুদূর এগিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে কোনো ঝোপের আড়ালে।

কিন্তু উপায় নেই রানা-সোহানার—সারাদিন এখানে লুকিয়ে থাকতে পারে না ওরা। ওদেরকে বেরিয়ে গিয়ে ঢুকতে হবে গির্জায়, দেখতে হবে কী আছে সেখানে।

বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সোহানার সঙ্গে সংক্ষেপে আলাপ সেরে নিল রানা। তারপর ওকে নিয়ে বের হলো কেবিন থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে কিছুদূর হেঁটে বাঁক ঘুরল, মেলিখানরা যেদিকে গেছে সেদিকেই যাচ্ছে। প্রতি দশ কদম এগোনোর পর থামছে, কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে কারও পায়ের-আওয়াজ পাওয়া যায় কি না। সবচেয়ে ভালো হতো যদি জানা যেত কোন্‌দিকে গেছে মেলিখানরা।

কিন্তু সেটা এখন সম্ভব নয়। তুষারের উপর মেলিখানদের বুটের দাগ দেখা যাচ্ছে; সময় যত গড়াচ্ছে, ভারী তুষারপাতের কারণে সেগুলো তত হালকা হয়ে আসছে। দৃষ্টিসীমা নেমে এসেছে এক শ' ফুটের নীচে।

হাঁটে-থামে, আবার হাঁটে-থামে—এভাবে পনেরো মিনিট পর পেভমেন্টের একটা ইন্টারসেকশনে হাজির হলো রানা-সোহানা। দু'দিকের পথ দুটো আলাদা কেবিনের দিকে গেছে। সামনের পথের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে গোলাঘরের মতো বড় একটা আউটবিল্ডিং, আবছাভাবে দেখা যায়। ওটা ছাড়িয়ে আরও দূরে

গির্জার চূড়া, তুষারপাতের কারণে কেমন ভুতুড়ে ছায়ামূর্তির মতো মনে হচ্ছে।

বাঁ দিক থেকে দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল হঠাৎ। একটু পর বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

লাফিয়ে পেভমেন্ট থেকে নামল রানা-সোহানা। ঝড়ের গতিতে একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। দশ সেকেণ্ড পর দেখা গেল আবহাওয়ার চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করতে করতে এগিয়ে আসছে দুটো ছায়ামূর্তি। নিষ্প্রভ আলো আর হুডওয়ালা ওভারঅলের কারণে তাদের চেহারা দেখা যাচ্ছে না ভালোমতো। রানা-সোহানাকে ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল ওরা, তারপর একসময় পেভমেন্ট ছেড়ে নেমে পড়ল মাটিতে। কয়েকটা গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। একটু আগে দেখেছে রানা ওদিকে নিঃসঙ্গ একটা কেবিন আছে। মিনিটখানেক পর দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল আবারও, সজোরে লাগানো হলো সেটা।

এখন গাছের পাতা-নড়া আর ঝরাপাতার উড়ে-যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজ নেই।

ঝোপের আড়াল থেকে বের হলো রানা, একহাতে ধরে রেখেছে সোহানার হাত। ঝট্ করে এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে ছুটতে শুরু করল। সোহানাও দৌড়াচ্ছে। একটু আগে যে-কেবিন থেকে বের হয়েছিল লোক দুটো, একছুটে সে-কেবিনের কাছে হাজির হলো দু'জনে। দরজার হাতল ঘুরিয়ে পাল্লা ফাঁক করল রানা, ঢুকে পড়ল চট করে। দশ সেকেণ্ড পর ঢুকল সোহানা।

বিশ মিনিট পর আবার দেখা গেল হুডওয়ালা ওভারঅল-পরা লোক দুটোকে। পর্দা-ফেলা জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রানা-সোহানা, পর্দা সামান্য সরিয়ে দু'দিক থেকে উঁকি দিল দু'জনে। একটা লোককে চেনা যাচ্ছে এবার—মেলিখান। কোঁচকানো ভ্রূ

দেখলে বোঝা যায় মেজাজ খারাপ। এই শীতের মধ্যে সারা পার্কে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, একবার এই কেবিনে তো পরেরবার ওই আস্তাবলে গিয়ে ঢুকছে, কিন্তু রানা-সোহানাকে পাকড়াও করতে পারছে না। গির্জার কাছের আরেকটা কেবিনের দিকে যাচ্ছে এখন।

মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই ওদেরকে গিলে খেল পড়ন্ত তুষারের মোটা চাদর।

'এভাবে কতক্ষণ আমাদেরকে খুঁজে বেড়াবে ওরা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

জবাব না দিয়ে পকেট থেকে পার্কের ব্রোশিয়ারটা বের করল রানা। কিছুক্ষণ দেখার পর বলল, 'আরেকটা আউটবিল্ডিং আর গির্জাটা খোঁজা বাকি আছে মেলিখানের। ওখানে খুঁজেও যখন পাবে না, পিছু হটতে হবে ওকে। কাজেই ধরে নাও আরও ঘণ্টাখানেক আছে সে।'

'তারপর?'

'তারপর?' ব্রোশিয়ারটা জায়গামতো ঢুকিয়ে রাখল রানা, ব্যাকপ্যাক খুলে বের করে আনল ক্যামেরাটা। 'একটা জিনিস দেখাই তোমাকে।' সোহানাকে নিয়ে সরে এল জানালার কাছ থেকে, ক্যামেরাটা চালু করে যে-ছবিগুলো তোলা হয়েছে সেগুলো দেখতে লাগল একটা একটা করে। আলোর আভা যাতে তৈরি না হয় সেজন্য এককোণে বসে ক্যামেরাটা রেখেছে কোলের উপর। 'দেখো,' স্ক্রিনে নির্দিষ্ট একটা ছবি আসার পর সোহানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, 'ফেরিঘাটে ঘুরে বেড়ানোর সময় এটা তুলেছিলাম।'

দেখল সোহানা। বোটহাউসের ছবি। এককালে গোলাঘর ছিল, পরে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। দরজাটা অর্ধেক খোলা। সাদা একটা স্পীডবোটের নাক দেখা যাচ্ছে।

'ইমার্জেন্সির জন্য হয়তো,' রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'পিছনে আরও দুটো স্পিডবোট দেখতে পাচ্ছি। তারমানে...'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চলো।'

মেলিখানের ফুটপ্রিন্ট ধরে এগোচ্ছে রানা-সোহানা। কিছুদূর এগোনোর পর বাঁয়ে বাঁক নিল। অনতিদূরে পার্কের শেষ আউটবিল্ডিং, গির্জা থেকে কিছুটা দূরে। ঘাসের জমিনে ইতিমধ্যে তিন-চার ইঞ্চি পুরু তুষার জমে গেছে। পেভমেন্টটা না থাকলে হাঁটাই কষ্টকর হয়ে যেত। আশপাশের প্রায় সবগুলো গাছের নীচে আরও ঘন হয়ে জমেছে তুষার। দেখলে মনে হয় কেউ সাদা কম্বল বিছিয়ে দিয়ে গেছে।

গির্জার দিকে সরাসরি না এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল রানা, কথাটা জানিয়ে দিল সোহানাকে। গির্জাসংলগ্ন বিল্ডিংটার কাছে গিয়ে থামল ও, এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। দেয়ালে পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল, ওর দেখাদেখি সোহানাও। ডান তর্জনীর ইশারায় এগোনোর কথা জানিয়ে দিল রানা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগল দু'জনে, কোনো জানালা এলে বসে পড়ছে উবু হয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে সামনে যাচ্ছে। এভাবে একটা করে জানালা পার হচ্ছে আর থামছে। কান পাতছে—কারও পদশব্দ বা কণ্ঠ শোনা যায় কি না। কিন্তু বাতাসের হু হু ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। আগে পাতা উড়ছিল, কিন্তু ঝরাপাতাগুলো তুষারের নীচে চাপা পড়ায় সে-শব্দও বন্ধ হয়ে গেছে।

আউটবিল্ডিংটার একটা কোণ ঘুরে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে থামল রানা, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, যতটা না পরিশ্রমে তারচেয়ে বেশি উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সোহানা। দূরে দেখা যাচ্ছে সেক্সট্যান্ট স্ট্যাচুটা, তুষারে ঢাকা পড়ে ভুতুড়ে মূর্তির আদল পেয়েছে। পেডেস্টালে-জমা তুষার বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারছে না

একজায়গায়, বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটুপরই নতুন তুষার এসে ভরাট করে দিচ্ছে খালি-জায়গা।

হঠাৎ রানার সোয়েটশার্টের আস্তিন ধরে টান দিল সোহানা, মনোযোগ আকর্ষণ করছে। ওর দিকে তাকাল রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে চোখের ইশারায় বিল্ডিং-এর ভিতরে দেখাচ্ছে সোহানা। তারপর শব্দ না করে শুধু ঠোঁট নেড়ে বলল, 'কেউ আছে!'

কথাটা বুঝতে পারল রানা। কিছুটা ঘুরল, কান চেপে ধরল দেয়ালের সঙ্গে। হ্যাঁ, কে যেন হাঁটছে ভিতরে—কাঠের মেঝেতে বুটের আওয়াজ পাওয়া যায়। রানার বাঁ পাশে ছিল সোহানা, একটানে ওকে ডান পাশে নিয়ে এল রানা। তারপর উঁকি দিয়ে তাকাল।

দরজার হাতল ঘোরানোর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কে যেন বাইরে আসছে। কয়েক মুহূর্ত পর দেখা গেল মেলিখান আর ওর এক চামচাকে। ঝট করে মাথা সরিয়ে নিল রানা।

'চলো গির্জায় গিয়ে দেখি আরেকবার,' চামচাকে বলল মেলিখান।

কিছুক্ষণ পর দু'জনের পদশব্দ মিলিয়ে গেল বাতাসের হু হু আওয়াজের কারণে।

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা, তারপর তাকাল সোহানার দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'গির্জায় ওরা পাবে না আমাদেরকে, কাজেই আমাদের হাতে বেশি সময় নেই।'

'কী করতে চাও?' ফিসফিস করেই জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'বোটহাউসের দিকে যাচ্ছি।'

'আর আমি?'

কাছের ফায়ারউড শেডটা দেখিয়ে দিল রানা। 'সুবোধ বালিকার মতো চলে যাও ওখানে, আমি না ফেরা পর্যন্ত লুকিয়ে থাকো।'

কালো হয়ে গেল সোহানার চেহারা। 'না।'

'না মানে?'

'তোমার কথা শুনবো না।'

'দেখো সোহানা, এখন তর্ক করার সময় না। আমরা দু'জনে যদি একসঙ্গে রওনা দিই বোটহাউসের দিকে তা হলে ওদের চোখে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।'

'তা হলে তুমি থাকো, আমি যাই।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'ঠিক আছে, চলো দু'জনই যাই।'

মুচকি হাসল সোহানা।

এদিকওদিক দেখে নিয়ে ছুট লাগাল রানা। আসলে ছুটছে না, তুষারের গালিচার উপর লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। পেভমেন্ট এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে যতটা সম্ভব। গির্জার দিকে তাকাচ্ছে বার বার, ভয় হচ্ছে এই বুঝি দরজা খুলে বেরিয়ে এল মেলিখান অথবা ওর সঙ্গের লোকটা।

বোটহাউসে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না। দরজাটা খোলাই আছে। ভিতরে ঢুকে পড়ল দু'জনে। একপাশে সরে গিয়ে এদিকওদিক তাকাচ্ছে।

বোটহাউসটা বেশি বড় না। দুটো গাড়ির-গ্যারেজের সমান হবে বড়জোর। একদিকে দেখা যাচ্ছে ফেরিঘাট, প্রথম যে-ফেরিঘাটে নেমেছিল ওরা সেটার তুলনায় অনেক ছোট। কিছু আলগা কাঠ আর তক্তা দেখা যাচ্ছে স্তূপ করে রাখা হয়েছে একপাশে। তক্তা দিয়ে বানানো ক্যাটওয়াকের সঙ্গে দড়ি-দিয়ে-বাঁধা অবস্থায় আছে কয়েকটা স্পিডবোট।

ক্যাটওয়াকের উপর উঠে পড়ল রানা, খানিকটা এগিয়ে উঁকি দিল একটা স্পিডবোটের ভিতরে। কিন্তু যা দেখতে চাচ্ছিল তা দেখতে পেল না—কোনো বোটের ইগনিশনেই চাবি নেই। কথাটা নিচু গলায় সোহানাকে জানাল ও।

'আমরা যাতে পালাতে না পারি তার সব ব্যবস্থা করেছে মেলিখান,' বলল সোহানা।

'অথবা হতে পারে পার্কস্টাফরা বোটের চাবি অন্য কোথাও রাখে,' লাফিয়ে একটা বোটের ভিতরে নামল রানা। এলইডি মাইক্রোলাইট বের করল পকেট থেকে। ওটা জ্বালিয়ে খুলে ফেলল একটা বোটের ইঞ্জিন হ্যাচ। ইঞ্জিনের স্টার্টার কেবল থেকে একটা তার কেটে রাখা হয়েছে।

বাকি স্পিডবোটগুলোও চেক করল রানা। একই ব্যাপার।

'সোহানা, এক কাজ করো। দরজার কাছে যাও। আড়ালে থেকে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে থাকো বাইরে। ওদের কাউকে যদি দেখো আসছে বোটহাউসের দিকে, সতর্ক কোরো আমাকে।'

'কী করবে?'

'ছোটখাটো কিছু মেরামত,' মাইক্রোলাইটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল রানা। ঝুঁকে পড়ল ড্যাশবোর্ডের উপর।

এটার ইলেকট্রিকাল সিস্টেমটা দেখতে জটিল মনে হলেও আসলে জটিল না। কেবলগুলো পেঁচিয়ে আড়াল করা হয়েছে একটা প্লাস্টিকপ্যানেলের পেছনে। ড্যাশবোর্ডটা খুলে ফেলল রানা। ইগনিশন সিস্টেম, হেডলাইট, হর্ন আর উইণ্ডশিল্ড ওয়াইপারের সঙ্গে কোন্ তারগুলো জড়িত খুঁজে বের করল। বোটের অ্যাক্সেসরিস প্যানেল থেকে খুঁজে বের করল সাত ইঞ্চি লম্বা একটা বাড়তি কেবল, পকেট থেকে বের করল সুইসনাইফ। ওটার কাঁচি দিয়ে মাপমতো কেটে টুকরো টুকরো করল কেবলটাকে, তারপর ছুরির ফলা দিয়ে চেঁছে জায়গায় জায়গায় তুলে ফেলল রাবারের আবরণ। ইগনিশনের যেসব জায়গার তার কেটেছে মেলিখান, সেগুলো জোড়া দিল।

সন্তুষ্ট হয়ে বোট থেকে বাইরে এল রানা, ক্যাটওয়াকের উপর দাঁড়িয়ে এদিকওদিক তাকাচ্ছে। যা খুঁজছে তা পেতে সময় লাগল

না। একদিকের দেয়ালের পেগবোর্ডে ঝুলছে জিনিসটা—দু'ফুট লম্বা একটা বাঞ্জি কর্ড, দু'মাথায় একটা করে হুক আটকানো। কর্ড নিয়ে এসে আবার বোটে উঠল রানা। স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে প্যাঁচ দিয়ে ওটার একটা মাথা বাঁধল থ্রটলের সঙ্গে। টান টান করে কর্ডের আরেকদিকের হুক আটকে দিল বোটের মেঝের তক্তার সঙ্গে। পিছু ঘুরে হেঁটে হাজির হলো ড্যাশবোর্ডের কাছে, থ্রটলটাকে ঠেলে ফরওয়ার্ড পজিশনে নিয়ে এল। সবশেষে খুলে ফেলল বোটের বৌ আর স্টার্ন লাইন, ফেলে দিল পানিতে।

সোহানার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোনো খবর?'

'না। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

ক্যাটওয়াকে নামল রানা, দ্রুত পায়ে হেঁটে হাজির হলো সোহানার পাশে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল বাইরে।

তুষারের একটা রাজত্ব ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। গির্জা উধাও হয়ে গেছে, নজরে পড়ে না কোনো আউটবিল্ডিং। মনে হয়, যেন উত্তরমেরুতে হাজির হয়েছে। না আছে মানুষ, না বসতি।

এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে সোহানার কাঁধ ধরল রানা। 'এবার আমার একটা কথা শুনতেই হবে তোমাকে। বোটে গিয়ে উঠছি আমি, ইঞ্জিন চালু করে ছেড়ে দেবো ওটাকে। ইগনিশনের আওয়াজ শোনামাত্র ছুট লাগাবে তুমি। একদৌড়ে হাজির হবে ফায়ারউড শেডের কাছে, লুকিয়ে পড়বে।'

'আর তুমি?'

স্তূপ-করে-রাখা তক্তাগুলো দেখিয়ে দিল রানা আঙুলের ইশারায়। 'ওগুলোর আড়ালে লুকাবো। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল সোহানা।

যে-বোটটা "মেরামত" করেছে, দৌড়ে সেটার কাছে ফিরে এল রানা, চড়ল। রাবারের আবরণবিহীন ইগনিশন তারগুলোকে ডানহাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙুল দিয়ে মোচড় দিল। স্ফুলিঙ্গ

দেখা দিল তারে, গর্জন তুলে স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ক্যাটওয়াকে নামল রানা, বোটহাউসের দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল।

ছুটছে সোহানা। বেশিক্ষণ দেখা গেল না ওকে। তুষারের ঘন পর্দায় হারিয়ে গেল ও।

গর্জাচ্ছে ইঞ্জিন, কাঁপছে ক্যাটওয়াক, পেট্রোলপোড়া ধোঁয়া ধেয়ে আসছে রানার দিকে। দৌড় দিল ও, একছুটে হাজির হলো বাতিল তক্তাগুলোর আড়ালে। এখানে এক ফুট বাই এক ফুটের একটা জানালা আছে, কাঁচ ভাঙা। ওটা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা।

কেউ নেই।

তা হলে কি মেলিখান শুনতে পায়নি স্পীডবোটের আওয়াজ?

ঘাড় ঘুরাল রানা। বোটের তলার নীচে ঢেউ জেগেছে, এদিকওদিক দুলছে ওটা, আগে বাড়ছে আস্তে আস্তে। ক্যাটওয়াকের গায়ে যতক্ষণ লেগে থাকল ততক্ষণ গতি উঠল না। যখন কোনো বাধা থাকল না, তুষারে ঢাকা পানির উপর দিয়ে রওয়ানা হলো দ্রুত বেগে। তুষারের চাদর একসময় গিলে খেল ওটাকেও।

প্ল্যানটা মাঠে মারা গেল কি না ভাবছে রানা হতাশ হয়ে, এমন সময় তুষারের চাদর ভেদ করে দেখা গেল মেলিখান আর তার চামচাকে।

'জলদি! জলদি!' দৌড়াচ্ছে আর তাগাদা দিচ্ছে মেলিখান, 'পালাচ্ছে ওরা!'

তুষারের উপর লাফাতে লাফাতে দু'জনে এসে ঢুকল বোটহাউসে। তক্তার আড়াল থেকে ওদের কর্মকাণ্ড দেখছে রানা।

দু'জনে গিয়ে চড়ল একটা বোটে; রানা যেভাবে "কারিগরি" করেছে, ইগনিশন তারের উপর ঠিক সেভাবে কারিগরি শুরু করল

মেলিখানের চামচা। বোঝা গেল লোকটা এ-কাজে দক্ষ, কারণ মাত্র এক মিনিটেই চালু করে ফেলল সে ইঞ্জিনটাকে। মিনিট দুয়েক পর খোলা লেকের দিকে ছুটল সে মেলিখানকে নিয়ে।

রানা জানে হাতে বেশি সময় নেই। যে-কোনো সময় খুলে যেতে পারে বাঞ্জিকর্ড, তখন থ্রটলের উপর থেকে চাপ আলগা হয়ে গিয়ে খোলা লেকে থেমে দাঁড়াবে বোট। ওটা খুঁজে পাবেই মেলিখান, "কারিগরি" দেখে নিশ্চিত হবে পার্কেই আছে রানা-সোহানা। টের পাবে ধোঁকা দেয়া হয়েছে ওকে, সন্দেহ নেই তখন ফিরে আসবে পার্কে।

তারপর?

তারপর আর ভাবতে চাইল না রানা। পরেরটা পরে দেখা যাবে। হাতের কাজ সারা যাক আগে।

ফায়ারউড শেডের ভিতরে আধো আলো আধো অন্ধকারে সোহানাকে খুঁজে বের করল ও। লাকড়িগুলোর আড়ালে পা গুটিয়ে বসে আছে। ওর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানা।

'শুনেছি,' বলল সোহানা। 'প্রশ্ন হচ্ছে, হাতে কত সময় পাচ্ছি আমরা?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'পনেরো, খুব বেশি হলে বিশ মিনিট। চলো তাড়াতাড়ি।'

সোহানাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। তাড়াহুড়ো করে দু'জনে এগোল গির্জার দিকে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজার নবে হাত রাখল রানা। মোচড় দিল।

নিঃশব্দে খুলে গেল দরজাটা।

উনিশ

বাইরের তুষারপাত আর ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে তুলনা করলে গির্জার ভিতরটা গরম। আরাম পেয়ে রানা-সোহানার মনে হচ্ছে যেন স্বর্গে এসে হাজির হয়েছে।

গির্জার বাইরের দিকের নকশা জমকালো, কিন্তু ভিতরটা আশ্চর্যরকম সাদামাটা। মেঝেতে লালচে-বাদামি টাইলস বসানো। মেঝের সঙ্গে আটকানো কয়েক সারি কাঠের বেঞ্চ দেখা যাচ্ছে। হেলান দিয়ে বসার সুবিধা আছে ওগুলোতে। চুনকাম-করা দেয়ালে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর ঝুলছে মাতা মেরি আর যিশুখ্রিষ্টের আইকন। মাথার উপরে, পিছনের দিকের দেয়ালের সঙ্গে, একটা ঝুলন্ত ব্যালকনি। গোল হয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়া ছাদটা হালকা গোলাপি রঙের।

সারি সারি বেঞ্চের মাঝখানের সরু পথ ধরে এগোতে লাগল রানা-সোহানা। যাজকের বেদি ছাড়িয়ে কিছুটা দূরে ছোট একটা দরজা দেখা যাচ্ছে। ওটা খুলে ভিতরে ঢুকল দু'জনে। আধখানা চাঁদের মতো আকৃতিবিশিষ্ট একটা ঘর, এককোণে লোহার প্যাঁচানো সিঁড়ি। ওটা বেয়ে উঠতে শুরু করল।

'কোন্‌দিকে যাচ্ছি আমরা, রানা?'

'সম্ভবত গির্জার মিনারের দিকে। আমার হিসেব অনুযায়ী মিনারের দিকেই নির্দেশ করছে সেক্সট্যান্টটা।'

ত্রিশ-চল্লিশ ধাপ ওঠার পর ওরা দেখল কাঠের একটা

ট্র্যাপডোর দেখা যাচ্ছে, ঠেলা দিয়ে খোলা যায় এ-রকম দুটো আংটা সংযুক্ত দু'দিকে।

ঠেলা দিয়ে ট্র্যাপডোর খুলে ফেলল রানা, ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল একদিকে। খানিকটা কসরত করে উঠে গেল উপরে। উঠে আসতে সাহায্য করল সোহানাকে। তারপর বন্ধ করে দিল ট্র্যাপডোরটা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

এবার অষ্টভুজের মতো একটা কক্ষে হাজির হয়েছে দু'জনে। পার্কের কয়েকটা আউটবিল্ডিং-এর মতো, এ-কক্ষেরও জানালাগুলো বাইরে থেকে তক্তা মেরে বন্ধ-করা। তারপরও কিছুটা আলো আসছে, কিন্তু তা যথেষ্ট না। পকেট থেকে যার যার ফ্ল্যাশলাইট বের করে জ্বালল ওরা। এদিক-ওদিক আলো ফেলে ফেলে দেখছে।

কী যেন দেখতে পেয়ে একদিকে এগিয়ে গেল সোহানা। কিছুক্ষণ দেখার পর ডাকল রানাকে, 'দেখে যাও তো।'

সোহানার কাছে গেল রানা, দেয়ালের উপর আলো ফেলে কী দেখাতে চাচ্ছে দেখল।

একদিকের জানালার কাছে, দেয়ালের পুরু কাঠের গায়ে খোদাই করা আছে প্রতীকটা।

একটা উড়ন্ত মৌমাছি।

গির্জায় সংস্কারকাজ হয়েছে অনেকবার, কাঠের উপর বার বার রঙ করাতে অনেকখানি ঢাকা পড়ে গেছে প্রতীক। তারপরও, ওটার সঙ্গে যারা আগে থেকে পরিচিত, চিনতে ভুল হওয়ার কথা না তাদের।

'আমি যে-দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেও এ-রকম একটা মৌমাছি দেখেছি,' বলল রানা।

'হুবহু এক?'

'আমার তা-ই মনে হয়। চলো গিয়ে দেখি।'

রানা যে-দেয়ালে মৌমাছির প্রতীকটা দেখেছে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। আলো ফেলে কিছুক্ষণ দেখার পর বুঝল দুটো প্রতীকের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

'কিন্তু দুটো কেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'আ ট্রায়ো অভ কইনস...' জবাব না দিয়ে বিড়বিড় করে বলল রানা, 'তারমানে কাছেপিঠে আরও একটা মৌমাছি আছে। খোঁজো সোহানা!'

তৃতীয় "মৌমাছিটাকে" খুঁজে বের করতে ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগল না ওদের।

'তারমানে মিনারের একদিকের দেয়ালে দুটো মৌমাছি,' এক পা এক পা করে পিছিয়ে আসছে রানা, 'ঠিক উল্টোদিকের দেয়ালে তৃতীয়টা।'

'কী বোঝাতে চাচ্ছ?'

'আমার পাশে এসে দাঁড়াও, সোহানা। কল্পনার চোখ দিয়ে একটা রেখা এঁকে যে-দু'টো মৌমাছি একসঙ্গে আছে তাদেরকে সংযুক্ত করো। তৃতীয় মৌমাছিটাকে আগের দুটোর সঙ্গে যুক্ত করতে আরও দুটো রেখা আঁকতে হবে তোমাকে। কী হলো তা হলে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল সোহানা, তারপর বলল, 'সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ।'

'হুঁ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ত্রিভুজটা কী বোঝাচ্ছে? অথবা কোন্‌দিকে নির্দেশ করছে?'

'কল্পিত রেখাগুলো যদি বাড়িয়ে দিই আমরা, যে-দু'টো মৌমাছি একসঙ্গে আছে সেগুলোর একটা নির্দেশ করবে লেক, আরেকটা পর্বত। আর তৃতীয়টা...আমাদের পেছনের দ্বীপ।'

দুটো মৌমাছি যে-দেয়ালে আছে, কী ভেবে সেদিকে এগিয়ে গেল রানা, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ল। ফ্ল্যাশলাইটটা

নামিয়ে রাখল মেঝেতে। ভ্রূ কুঁচকে আছে ওর, একমনে ভাবছে। কিছুক্ষণ পর হেসে ফেলল।

'কী?' জানতে চাইল সোহানা।

'ধাঁধার শেষ লাইনটা...কয়েকবার মনে হয়েছে পরিচিত কিছু একটা আছে কোথাও-না-কোথাও। এবার বুঝতে পারছি সেটা কী।' প্যান্টের পকেট হাতড়ে পার্কের ব্রোশিয়ারটা বের করল রানা। কিছুক্ষণ পড়ার পর সোহানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ওটা। 'নাও, পড়ো। ফ্রিজিসিঙ্গা।'

রানার হাত থেকে ব্রোশিয়ারটা নিল সোহানা, রানার দেখিয়ে-দেয়া জায়গা পড়তে শুরু করল: '...১৮০৩ সাল পর্যন্ত বাভারিয়ার যুবরাজ আর প্রোভোস্টদের বিশ্রামস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো গির্জাসংলগ্ন হান্টিংলজ। এখানে শেষ থেকেছেন যুবরাজ জোসেফ কনরাড, যিনি এককালে ফ্রিজিসিঙের লর্ড বিশপ ছিলেন।'

'আমরা যখন নেটে ঘাঁটাঘাঁটি করছিলাম ফ্রিজিসিঙ্গা নিয়ে,' রানা বলল, 'খেয়াল আছে এ-রকম একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। কিন্তু বিষয়টা আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। এখন বুঝতে পারছি। অষ্টম শতকে ফ্রিজিসিঙের নাম ছিল ফ্রিজিসিঙ্গা।'

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল সোহানা। 'রানা, আমি আসলেই বুঝতে পারছি না তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছ।'

'জোসেফ কনরাড এখানে থেকেছেন। কোথায় থেকেছেন তা-ও শুনেছি ফেরিঘাটে, গাইডদের মুখ থেকে। পার্কের প্রথম যে-কেবিনটাতে ঢুকেছিলাম আমরা, সেখানে।'

'তারমানে...'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাচ্ছে রানা, সোহানাকে কথা শেষ করতে দিল না। 'চলো।'

ট্র্যাপডোর খুলে সিঁড়িতে নামল ওরা, ওটা বেয়ে নীচে নেমে এসে আবার ঢুকল গির্জায়। কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে বের হলো,

এদিক-ওদিক তাকিয়ে হাঁটা ধরল প্রথম যে-কেবিনটাতে ঢুকেছিল ওরা সেদিকে।

দ্রুত হাঁটার চেষ্টা করছে, তারপরও জমাট তুষারের কারণে কেবিনটাতে পৌঁছাতে পাঁচ মিনিট লেগে গেল। এবার স্টোররুমের দরজা দিয়ে না, লিভিংরুমের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল দু'জনে।

ঘরটা অন্ধকার। যার যার ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল ওরা। এদিক-ওদিক আলো ফেলে ফেলে দেখছে।

বিড়বিড় করে সোহানা বলল, 'ফ্রিজিসিঙ্গার লর্ড বিশপ জোসেফ কনরাড এককালে থাকতেন এখানে।'

রানা বলল, 'কেবিনের বেশিরভাগই কাঠ দিয়ে বানানো। মেঝেতেও সারি সারি তক্তা বিছানো আছে। তবে কাঠের মেঝেকে সাপোর্ট দেয়ার জন্য জমিনের উপর পাথরের ব্লক বসানো হয়েছে।'

'কোথায় খুঁজবো তা হলে? পাথরের ব্লকে? লোরন জানতেন কাঠ বেশিদিন না ও টিকতে পারে। কারণ কর্তৃপক্ষ যদি সিদ্ধান্ত নেয় কেবিনটা আর রাখবে না এই পার্কে তা হলে বাতিল হয়ে যাবে তাঁর প্ল্যান। আবার আগুন লেগে অথবা অন্য কোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতি হতে পারে কাঠের। কিন্তু পাথরের ব্লক সরানো সহজ কাজ না।'

কথাটা ভেবে দেখল রানা। 'মানলাম।'

'হাতে কতক্ষণ সময় পাচ্ছি আমরা?'

ঘড়ি দেখল রানা। 'আরও পনেরো-বিশ মিনিটের মতো।'

'যা খুঁজবো সেটা চিনবো কী করে? মৌমাছির প্রতীক থাকবে?'

'মনে হয়।'

'কিন্তু রানা...সেক্ষেত্রে পুরো কেবিনটা তন্নতন্ন করে খুঁজতে হবে আমাদেরকে। বিশ মিনিট তো পরের কথা, বিশ ঘণ্টায়ও কাজ হবে না।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল রানা। তারপর বলল, 'আমি লোরনের জায়গায় হলে কী করতাম? পাথরের ব্লকের নীচে যা লুকাতে চাচ্ছি তা লুকানোর পর ব্লকটার গায়ে মৌমাছির প্রতীক বসাতাম। তারপর ওটাকে ঢেকে রেখেছে যে-তক্তা সেটার গায়ে ব্যবহার করতাম একই প্রতীক। তারমানে কাজ যতটা কঠিন মনে হচ্ছে আসলে ততটা নয়। কেবিনের মেঝের তক্তাগুলো দেখতে হবে আমাদেরকে। আমার বিশ্বাস কোনো-না-কোনো তক্তার গায়ে মৌমাছির প্রতীক খুঁজে পাবোই। ওটা সরাতে হবে আমাদেরকে। তারপর যতদূর বুঝতে পারছি একাধিক ব্লক দেখা যাবে। নির্দিষ্ট ব্লকটার গায়ে নিশ্চয়ই প্রতীক ব্যবহার করেছেন লোরন।'

দেরি না করে ঘরের এককোনা থেকে দেখতে শুরু করল দু'জনে। নির্দিষ্ট তক্তাটা খুঁজে পেতে সময় লাগল না। তবে তক্তার গায়ে না, দেয়ালের একেবারে নীচের দিকে প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। খুব হাল্কাভাবে খোদাই করা হয়েছে মৌমাছির ছবিটা, আগে থেকে না চিনলে অথবা ভালোমতো খেয়াল না করলে চোখেই পড়বে না। আরও বড় কথা, এই তক্তাটা আলগা—মেঝের অন্য তক্তাগুলোর মতো দেয়ালের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে সংযুক্ত না।

তক্তাটা তুলে ফেলল রানা। পাথরের ব্লকগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তক্তা যতখানি চওড়া, বর্গাকার ব্লকগুলোর দৈর্ঘ্যও ঠিক ততখানি।

'ওই যে, ওটা!' নির্দিষ্ট একটা ব্লকের উপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ধরে রেখেছে সোহানা।

একছুটে ব্লকটার কাছে হাজির হলো রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা

নামিয়ে রেখে বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে। ব্লকটা দু'হাতে ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল। কোনো লাভ হলো না। জমিনের উপর শক্তভাবে গাঁথা হয়েছে ব্লকগুলো।

ব্লকটা ছেড়ে দিয়ে আবার ফ্ল্যাশলাইট তুলে নিল রানা, আলো ফেলে ফেলে এদিক-ওদিক দেখছে। মুখ হাঁ করে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে ফায়ারপ্লেসটা, অনেকদিন ধরে ব্যবহৃত না হওয়ায় মাকড়সার জাল দেখা যাচ্ছে। উঠে ওটার দিকে এগিয়ে গেল রানা। ম্যান্টেল র‍্যাকের উপর স্টীলের একটা পোকার দেখা যাচ্ছে। ওটা নিয়ে ব্লকটার কাছে ফিরে এল ও।

তীক্ষ্ণ প্রান্ত দিয়ে জোরে জোরে গুঁতো দিতে লাগল ব্লকের ভিত্তিতে। গুঁতিয়ে দু'দিকের মাটির আলগা করে ফেলল, তারপর পোকারটা নামিয়ে রেখে আবার ঝাঁকুনি দিল ব্লকটাকে। এবার আগের মতো দৃঢ়তা দেখাতে পারল না ব্লক, কাত হয়ে গেছে একপাশে। কিন্তু পুরোপুরি আলগা হয়নি।

আবারও পোকারটাকে কাজে লাগাল রানা। আরেকদিকের মাটি আলগা করে ফেলল, তারপর সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ব্লকটাকে। হাঁপাতে হাঁপাতে হাতঘড়ি দেখল। মূল্যবান দশটা মিনিট পার হয়ে গেছে। দৃষ্টি সরিয়ে একটু আগে ব্লকটা যেখানে ছিল সেদিকে তাকাল।

মুখ হাঁ করে আছে একটা চোরাকুঠুরি।

আলো ফেলে দেখলেই হতো, কিন্তু উত্তেজনা সামলাতে না পেরে চোরাকুঠুরির ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিল সোহানা। হাতড়াচ্ছে, ওর কাঁধ পর্যন্ত ঢুকে গেছে। কিছুক্ষণ পর থামল, চোখ বড় বড় করে তাকাল রানার দিকে। নিচু গলায় বলল, 'কাঠ!'

'মানে?' বুঝতে পারছে না রানা। 'মাটির নীচে আবার কাঠ?'

'না। ধরো তো আমাকে, টেনে তোলো।'

সোহানাকে টেনে তুলল রানা।

ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় দেখা গেল, সোহানার হাতে একটা আয়তাকার কাঠের বাক্স। ঈগল যেভাবে নখ দিয়ে শিকার ধরে, পাঁচ আঙুল দিয়ে বাক্সটা সেভাবে ধরে আছে সোহানা।

বাক্সটা মেঝের উপর নামিয়ে রাখল ও, অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। ওটার দিকে টানা দশ সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল দু'জনে।

'মোটেলে ফিরলে, যদি ফিরতে পারি আর কী, আমার ম্যানিকিউর করে দিতে হবে তোমাকে,' একসময় বলল সোহানা।

হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা আগে বাড়ল রানা, আলতো করে চুমু খেল সোহানার ঠোঁটে। 'শুধু ম্যানিকিউর কেন, মোটেলে ফিরতে পারলে আরও বিভিন্নভাবে সেবা করবো তোমার। কথা দিলাম।'

তুলবার সময়ই সোহানা টের পেয়েছিল বাক্সটা খালি না। ঢাকনা খুলল ও।

ভিতরে অয়েলস্কিন কাগজে মোড়ানো অবস্থায় খড়ের বিছানায় শুয়ে আছে নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের আরেকটা বোতল।

ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'তোমার কী অবস্থা জানি না, তবে আমার মনে হচ্ছে একদিনের জন্য অনেক বেশি দেখা হয়ে গেছে আমাদের। আর দেখা বোধহয় ঠিক না।'

হাসল সোহানা। 'কথাটা আমিই বলবো ভাবছিলাম। ভালই হলো তুমি বলে দিলে।'

রানার সোয়েটশার্টে হুড আছে, ওটাকে ঘাড়ের সঙ্গে বাঁধার জন্য দড়িও আছে; টান মেরে দড়িটা খুলে নিল ও। ওটা দিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধল বাক্সটাকে যাতে ঢাকনা খুলে গিয়ে বোতলটা পড়ে না যায়। বাক্সটাকে চালান করে দিল নিজের ব্যাকপ্যাকে। পাথরের ব্লকটা তুলে দাঁড় করিয়ে দিল আগের জায়গায়, ঠেলেঠুলে যতটা সম্ভব আগেরমতো করে বসিয়ে দিল। সোহানার সঙ্গে

ধরাধরি করে নামিয়ে দিল তক্তাটা। পোকারটা মেঝে থেকে তুলে আগের জায়গায় রাখতে গিয়েও রাখল না, কী ভেবে চালান করে দিল সোহানার ব্যাকপ্যাকে।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল সোহানা।

'একটা অস্ত্র,' ব্যাখ্যা দিল রানা, 'হয়তো কোনো কাজে লাগবে না, আবার লাগতেও পারে। তেমন ভয়ঙ্কর কিছু না, আবার একেবারে ফালতুও না। চলো।'

বাইরে বেরিয়ে এল দু'জনে।

বোটহাউসটা এখান থেকে বেশ দূরে। কোনো স্পিডবোট যদি ফিরে এসে থাকে ইতিমধ্যে, আওয়াজ শোনা যাবে না, শোনেওনি রানা-সোহানার কেউ।

রানার দিকে তাকাল সোহানা, দৃষ্টিতে প্রশ্ন।

'বোটহাউসের দিকে যাবো আমরা,' বলল রানা।

'কিন্তু ওরা যদি ফিরে এসে থাকে?'

'ঝুঁকি নিতে হবে আমাদেরকে, উপায় নেই। আমাদের চাতুরি ধরা পড়ে যাবে মেলিখানের কাছে, হয়তো এতক্ষণে ধরেও ফেলেছে। বুঝে নেবে পার্ক থেকে বের হতে পারিনি আমরা। সেক্ষেত্রে আবার যদি খুঁজতে শুরু করে আমাদেরকে, কোথায় লুকিয়ে থাকবো তোমাকে নিয়ে? তারচেয়ে চেষ্টা করে দেখি একটা স্পীডবোট দখল করতে পারি কি না, জোড়াতালি দিয়ে চালু করতে পারি কি না। এই পার্ক থেকে বের হতে চাচ্ছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। চোখকান খোলা রেখে এগোনো যাক।'

বোটহাউসের কাছাকাছি এসে থামল ওরা। পেভমেন্ট ছেড়ে নেমে পড়েছে রানা, একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে বোটহাউসের দিকে।

'সন্দেহজনক কিছু?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'উঁহুঁ,' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল রানা। 'দরজাটা যতটুকু

খোলা রেখে বের হয়েছিলাম, ততটুকুই খোলা আছে। নিশ্চিত করে বলতে পারছি না ক'টা বোট আছে ভিতরে।'

'ল্যাণ্ডিং? ওখানে আছে কেউ?'

আবারও মাথা নাড়ল রানা। 'দেখা যাচ্ছে না। তুষারপাত...'

হঠাৎ রানার একটা হাত খামচে ধরল সোহানা। 'শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতল রানা। কয়েক মুহূর্ত পরই শুনতে পেল মৃদু আওয়াজটা। ইঞ্জিনের গর্জন—লেকটা যেদিকে আছে সেদিক থেকে আসছে। একবার মনে হলো কাছিয়ে আসছে আস্তে আস্তে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরই দূরে সরে গেল আওয়াজ।

রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সোহানা। 'তারমানে মেলিখান কি এখনও ধরতে পারেনি চালাকিটা? এখনও লেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে আমাদেরকে?'

'হতে পারে।'

'আরেকটা কথা। ওরা মোট চারজন এসেছিল পার্কে। মেলিখান কি তিনজনকে নিয়েই বোটে চড়েছে? নাকি কাউকে রেখে গেছে পার্কে?'

'বলতে পারবো না, সোহানা। মেলিখানের জায়গায় আমি থাকলে সবাইকে নিয়ে বোটে চড়তাম না। কারণ তার দরকার নেই। চলো বোটহাউসে ঢুকি।'

হাত ধরাধরি করে বের হলো ওরা গাছের আড়াল থেকে, ছুট লাগাল বোটহাউসের দিকে। কোথাও না থেমে সোজা ঢুকে পড়ল ভিতরে।

ল্যাণ্ডিং বা ফেরিঘাটের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় তিনটা বোট ছিল। একটা ছুট লাগিয়েছে রানার কারসাজিতে, আরেকটা নিয়ে গেছে মেলিখান। তিন নম্বর বোটটাকে বড়ই নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে এখন।

একবার এদিকওদিক দেখে নিয়ে আবার দৌড়াতে শুরু করল

ওরা, ল্যাণ্ডিং-এ গিয়ে উঠল। বোটে চড়ল সোহানা, বসে পড়ল ড্রাইভিং সীটে। কাঁধ থেকে ব্যাকপ্যাক খুলে সীটের নীচে ঢুকিয়ে দিল রানা। সোহানাও ওর ব্যাকপ্যাক খুলে নামিয়ে রাখল।

ইঞ্জিন কভার খুলে আগেরবারের মতো "ইঞ্জিনিয়ারিং" করল রানা, তারপর কভারটা লাগিয়ে দিল জায়গামতো।

'ধর্মে বলেছে, শয়তানকেও ধরা পড়তে হবে একদিন না একদিন,' গলা নিষ্কম্প, রাশান টানের ইংরেজিতে যথেষ্ট ভুল আছে।

উবু হয়ে ইগনিশন তার ধরে মোচড় দিতে যাচ্ছিল রানা, থেমে গেল ওই অবস্থাতেই। টের পেল ড্রাইভিং সীটের উপর জমে গেছে সোহানা।

'মিস্টার রানা, এত কাছ থেকে তুমি বা তোমার বান্ধবী পরের কথা, একটা তরমুজও ফুটো করতে পারবো গুলি করে,' আবার বলল কণ্ঠটা। 'কাজেই বোট চালু করার মতো বোকামি কোরো না। বিশ্বাস করো, ইঞ্জিনের গর্জন শোনামাত্র তোমাদের খুলি উড়িয়ে দেবো।'

গলা শুনলে বোঝা যায় হুমকিটা মিথ্যা না। ধীরে ধীরে সোজা হলো রানা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ল্যাণ্ডিং যেখানে শুরু হয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে মেলিখানের দুই চামচা। একজনের হাতে চকচকে রিভলভার।

'ফাঁকিবাজিতে তোমার মতো ওস্তাদ লোক কমই দেখেছি,' আবার বলল লোকটা, চেহারায় বসন্তের দাগ ভরা। 'বস্ তো আমাদের দু'জনকেও নিয়ে উঠতে চাচ্ছিল বোটে। ছি ছি, কী হতো তা হলে! কত সহজে পালিয়ে যেতে তোমরা! আমিই মানা করলাম। বললাম দু'জন যাক, দু'জন পার্কে থাকি। যদি কোনো ঘাপলা হয় সামাল দিতে পারবো। মাতা মেরিকে ধন্যবাদ, বুদ্ধিটা কাজে লেগেছে। আমার বেতন বাড়িয়ে নেয়ার একটা সুযোগ

পেলাম। ধন্যবাদ তোমাদেরকেও—তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে খেয়ালও করোনি বোটহাউসের দরজা দিয়ে কে বা কারা ঢুকছে। অবশ্য খেয়াল করলেও খুব একটা লাভ হতো না।'

রানা-সোহানা কেউ কিছু বলল না।

'এই শীতের মধ্যে অনেক খেটেছি, মিস্টার রানা,' বলছে বসন্তের দাগ, 'আর না। পুরো পার্ক তন্ন তন্ন করে খুঁজতে হয়েছে তোমাদেরকে। ইঁদুর-বিড়াল খেলা শেষ। এবার নামো বোট থেকে। খুব সাবধানে, আস্তে আস্তে। খেয়াল রেখো যাতে ভয় না পাই আমি। আর হ্যাঁ, কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার ব্যাকপ্যাকে জরুরি কিছু একটা আছে। নামার সময় ওটাও নিয়ো। জরুরি জিনিসটা বসের হাতে দিতে পারলে...' কথা শেষ না করে খুশিতে নিঃশব্দে হাসল লোকটা, বেতন কত বাড়িয়ে নেবে সে-হিসেব করছে হয়তো মনে মনে।

ব্যাকপ্যাক নিল রানা, তবে নিজেরটা না, সোহানারটা।

বোটের একপ্রান্ত ডিঙিয়ে ল্যান্ডিং-এ নেমে পড়ল ও। হাত বাড়িয়ে দিল সোহানার দিকে, নামতে সাহায্য করল ওকে।

'এই তো, সুবোধ বালকবালিকা,' বসন্তের দাগের দাঁত বন্ধ হয়নি এখনও, 'ধীরে ধীরে কাছে এসো। ব্যাগটা দাও। তারপর বলছি কী করতে হবে।'

পনেরো ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা, অনুমান করল রানা। ওর সঙ্গের লোকটাকে দেখল। তালপাতার সেপাই, কিন্তু জাত খুনি। চেহারাটা ভয়ঙ্কর বানানোর জন্য চাঁদি চেঁছে রেখেছে। এই লোকের হাতে কোনো আগ্নেয়াস্ত্র নেই। কিন্তু রানা নিশ্চিত, কোমরে বা প্যান্টের পকেটে ড্যাগারজাতীয় কিছু-না-কিছু আছেই।

ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল রানা। এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে চেহারায়, দেখলে মনে হবে ভয় পেয়েছে। আদর্শ বীরপুরুষের মতো আড়াল করার চেষ্টা করছে সোহানাকে, কিন্তু

সে-প্রয়াসেও চাতুরি আছে—মনে হয় সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

নিজের "সাফল্যে" দারুণ খুশি হয়েছে বসন্তের দাগ, ভুলটা করেছে সেখানেই, খেয়াল করল রানা। ওর জায়গায় রানা হলে পার্টনারকে নিয়ে সরে যেত ল্যাণ্ডিং থেকে যাতে মুভ করার জন্য যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়। কিন্তু ওই লোক তা করছে না। এবং সে যতক্ষণ সামনে থাকবে তালপাতার সেপাইও কিছু করতে পারবে না। কারণ ল্যাণ্ডিং-এর দু'দিকে পানি।

বসন্তের দাগের সঙ্গে দূরত্ব পাঁচ ফুট বাকি থাকতে ব্যাকপ্যাকটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিল রানা। খেয়াল করল ক্ষণেকের জন্য হলেও ব্যাগটার উপর দৃষ্টি দিয়েছে লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগটাকে এমনভাবে আণ্ডারআর্ম থ্রো করল ও যাতে ভিতরে-থাকা পোকারের হাতল বা চোখা দিক গিয়ে লাগে লোকটার রিভলভার-ধরা হাতে। কিন্তু হিসেবে ভুল হলো রানার, এবং ভালো হলো—পোকারের হাতল গিয়ে লাগল রিভলভারের নলে।

ঠং করে ধাতব আওয়াজ হলো, ব্যাপার কী বুঝতে না পেরে বিস্ময়-বিহ্বলতার ছাপ পড়ল বসন্তের দাগের চোখে, সঙ্গে সঙ্গে উড়াল দিল রানা। লোকটার সোলারপ্লেক্সাসে জোড়া-পায়ের ফ্লাইংকিক বসিয়ে দিয়েছে, এমন সময় ট্রিগারে টান পড়ল। অটুট নিস্তব্ধতায় অনেক জোরে শোনাল রিভলভারের আওয়াজ।

রানাকে লাফ দিতে দেখে ডাইভ দিয়ে পানিতে পড়েছে সোহানা। কাজেই লাইন অভ ফায়ারে কাউকেই পেল না বুলেট, অদৃশ্য হলো তুষারকম্বলে-ঢাকা লেকে।

রানাকে লাফিয়ে উঠতে দেখে পিছিয়ে গেছে তালপাতার সেপাই, তাই ল্যাণ্ডিং-এর উপর পড়ে বিনাবাধায় একবার ডিগবাজি খেল বসন্তের দাগ। সাপের ছোবল দেয়ার মতো দ্রুততায় উঠে দাঁড়াল রানা আরেকলাফে, একটুও সময় দিতে

রাজি না বসন্তের দাগকে। জানে সামলে নিতে পারলেই গুলি করবে লোকটা। বল জালে জড়ানোর জন্য ডি-বক্সের বাইরে থেকে যেভাবে শুট করে স্ট্রাইকাররা, লোকটার মাথাটাকে ফুটবল ধরে নিয়ে ঠিক চাঁদিতে সেভাবে লাথি মারল রানা জুতোর চোখা প্রান্ত দিয়ে। রাশান ভাষার "মা রে" চিৎকারটা অগ্রাহ্য করে জুতোর সোল দিয়ে মাড়িয়ে দিল লোকটার ডান হাতের আঙুলগুলো—যেভাবে লোকে বিষাক্ত কাঁকড়াবিছা মারে, সেভাবে। অসহ্য ব্যথায় রিভলভারের বাঁট ছেড়ে দিল লোকটা।

কলার ধরে টেনে লোকটাকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা, ডান হাঁটু ভাঁজ করে প্রচণ্ড জোরে গুঁতো মারল অণ্ডকোষে। বীভৎস একটা আওয়াজ করতে গিয়েও করতে পারল না বসন্তের দাগ, আপনা থেকে গোল হয়ে-যাওয়া মুখ দেখে মনে হচ্ছে বমি করবে এখনই, রসগোল্লার মতো বড় হয়ে গেছে দু'চোখ। প্রচণ্ড জোরে কোপ মারল রানা লোকটার নাকের ব্রিজে, তারপর আবার কলার ধরে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল পানিতে।

নিচু হয়ে রিভলভারটা তুলে নিতে যাচ্ছিল রানা, তালপাতার সেপাইকে নড়ে উঠতে দেখে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে গড়ান খেল। বেঁচে গেল সে-কারণে।

পকেট থেকে একটা ছুরি বের করে ভাঁজ খুলেছে লোকটা, প্রফেশনালদের মতো করে ছুঁড়ে মেরেছে রানার দিকে। দু'ইঞ্চির জন্য রানাকে মিস্ করেছে ছুরির ফলা।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল রানা, বিপত্তি ঘটল এমন সময়। পচে গিয়েছিল ল্যাণ্ডিং-এর একটা তক্তা, রানার পা পড়ল সেটার উপর, ভার সইতে না পেরে ভেঙে পড়ল সেটা। তাল সামলানোর জন্য লাফিয়ে সরে যেতে হলো রানাকে, যখন দু'পায়ের উপর দাঁড়াল তখন ভারসাম্য নেই ওর।

সুযোগটা কাজে লাগাল তালপাতার সেপাই। তীর বেগে ছুটে

এসে নিখুঁত এক পাঞ্চ হাঁকিয়ে দিল সে রানার চোয়ালে।

মুহূর্তের মধ্যে হাজারটা তারা জ্বলে উঠল রানার চোখের সামনে। ইচ্ছাকৃতভাবে মাথাটা এদিকওদিক দোলাচ্ছে, প্রতিপক্ষকে বোঝাতে চাচ্ছে জায়গামতো লেগেছে আঘাত; আসলে নিজের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি দৃষ্টি। ঝাপসাভাবে দেখতে পেল, বাঁ পায়ের উপর ভর দিয়ে পজিশন নিয়েছে তালপাতার সেপাই, আরেকটা পাঞ্চ হাঁকানোর জন্য প্রস্তুত।

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে মাথা পিছনের দিকে নিল রানা, তারপর মুহূর্তের মধ্যে বাঁ পা-টা সামনে নিয়ে "হেড" করল তালপাতার সেপাইয়ের নাকে। হাড় ভাঙার পরিষ্কার আওয়াজ শুনল রানা, চুল ভিজে ওঠায় বুঝল গলগল করে রক্ত বের হচ্ছে লোকটার নাক থেকে।

এ-রকম কিছু করবে রানা, কল্পনাও করেনি তালপাতার সেপাই। আতঙ্কিত হয়ে জাপটে ধরল সে রানাকে। তাল সামলাতে পারল না রানা, তালপাতার সেপাইয়ের সঙ্গে কোলাকুলিরত অবস্থায় পেছাতে হলো ওকে, ল্যাণ্ডিং-এর সেই ভাঙা জায়গায় পা পড়ল আবার। এবার সরে যাওয়ার অবকাশ পেল না, কারণ দু'জনের ভারে পেরেক আলগা হয়ে গিয়ে পাশের তক্তাটাও সরে গেছে।

রানা টের পেল পড়ে যাচ্ছে, ও যাতে কিছু করতে না পারে সেজন্য আরও শক্ত করে ওকে জাপটে ধরেছে তালপাতার সেপাই। বুক ভরে দম নিতে শুরু করল রানা।

লেকের হিমশীতল পানি গিলে নিল ওদের দু'জনকে।

বিশ

দেখে মনে হচ্ছে নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে রিভলভারটা।

ভেজা চুপচুপে গায়ে ওটার কাছে এসে দাঁড়াল সোহানা পায়ে পায়ে। রানাকে ডুবে যেতে দেখেছে। ওর জন্য দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সুবিধাজনক অবস্থায় আছে তালপাতার সেপাই, লড়াইটা দেখেছে সোহানা, ওর ধারণা পানির নীচে নিয়ে গিয়ে রানাকে গলা টিপে মারবে শয়তানটা।

পানিতে ঝাঁপ দেবে নাকি সে-ও? সাহায্য করার চেষ্টা করবে রানাকে? কিন্তু তাতে যদি হিতে বিপরীত হয়? যদি ওকে দেখতে পেয়ে জরুরি মুহূর্তে মনোযোগ নষ্ট হয় রানার?

শেষপর্যন্ত সোহানা সিদ্ধান্ত নিল, পানিতে নামবে না। বরং রিভলভারটা কুড়িয়ে নেয়া যাক। অপেক্ষা করা যাক রানার জন্য।

ল্যাণ্ডিং-এর এককোণে কার যেন নড়াচড়া। সতর্ক হয়ে উঠল সোহানা। একটু পর দেখল, পানি থেকে হাঁচড়েপাঁচড়ে কোনোরকমে উঠে আসার চেষ্টা করছে বসন্তের দাগ। কেন যেন লোকটার উপর প্রচণ্ড রাগ হলো সোহানার। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে। ওর উপস্থিতি টের পেল না লোকটা, শরীরের দুর্বলতম জায়গায় প্রচণ্ড আঘাতে কোনোকিছু টের পাওয়ার মতো অবস্থায় নেই সে। ল্যাণ্ডিং-এ ওঠার পর দাঁড়িয়েছে মাত্র, এমন সময় সোহানাকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। ওকে সময় দিল না সোহানা, লোকটার শ্বাসনালীর পাশে নার্ভ সেন্টারে

জুডোর চপ মারল পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে।

জ্ঞান হারিয়ে ল্যান্ডিং-এর উপর লুটিয়ে পড়ল বসন্তের দাগ।

গায়ে পানির স্পর্শ লাগামাত্র রানার মনে হলো যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে।

জানে পানিতে পড়তে যাচ্ছে, তাই আগেই ফুসফুস দুটো ভরে নিয়েছে। তালপাতার সেপাইয়ের মারে জোর আছে, দপদপ করতে শুরু করেছিল মাথাটা, ঠাণ্ডা পানির স্পর্শে ঠিক হচ্ছে আস্তে আস্তে।

অন্য কেউ হলে প্রথমেই বাতাসের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ত, মোচড়ামোচড়ি শুরু করত। রানা করল উল্টো কাজ। মোচড়ামোচড়ির ধারেকাছেও গেল না। টান টান করে দিল পা দুটো, শরীরের ভর তালপাতার সেপাইয়ের উপর দিয়ে ডিগবাজি খেল। পানিতে সিযর্স কিক দিল দু'বার, আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে আরও নীচের দিকে।

রানা যে ইচ্ছা করে নীচে নামছে তা বুঝতে মূল্যবান কতগুলো মুহূর্ত নষ্ট হলো তালপাতার সেপাইয়ের। একে তো ভাঙা নাক থেকে রক্ত হারাচ্ছে, তার উপর অক্সিজেনের সঞ্চয়ও বেশি না, তাই আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে।

রানাকে ছেড়ে দিল তালপাতার সেপাই, দু'হাত সমানে চালাচ্ছে এখন, একের পর এক ঘুসি মারছে। কিন্তু পানির নীচে হাত চলে না ডাঙার মতো, তার উপর জ্যাকেট পরে আছে, তাই একটা ঘুসিতেও কাজ হলো না। ইতিমধ্যে রানা জাপটে ধরেছে লোকটাকে, আরও নীচে নেমে এসেছে।

হঠাৎ টের পেল রানা ঘুসোঘুসি থামিয়ে দিয়েছে লোকটা, প্যান্টের পকেট হাতড়াচ্ছে প্রাণপণে। কেন, আন্দাজ করল রানা, তারপরও সময় দিল লোকটাকে। কালচে ঘোলাটে পানি ভেদ

করে একটু পর দেখল, আরেকটা ড্যাগার বের করেছে তালপাতার সেপাই, ভাঁজ খুলছে।

ছুরিধরা হাতটা ডান হাতে মুচড়ে ধরল রানা, একইসঙ্গে পানিতে লাথি মেরে সরে গেল একপাশে। যা আশা করেছিল ও তা-ই ঘটল তখনই—ডানে-বাঁয়ে সরাতে না পেরে ছুরি দিয়ে উপরের দিকে গুঁতো মারল তালপাতার সেপাই। রানা টের পেল ওর শার্টের কয়েকটা বোতাম ছিঁড়ে নিয়ে গেল ফলা, খোঁচা দিয়ে গেল নাভির একটু উপরে।

সুবিধা করতে পারছে না রানা—গায়ে যথেষ্ট জোর রাখে তালপাতার সেপাই। রানাকে কিছুতেই ধরে রাখতে দেবে না সে নিজের ছুরিধরা হাত, তাই অন্য হাত দিয়ে সমানে মোচড়াচ্ছে রানার ডান হাতটাকে। এবার বাঁ হাতটাও ব্যবহার করতে হলো রানাকে, লোকটার ছুরিধরা হাতের কনুইয়ের কাছটা খামচে ধরল। একইসঙ্গে হাঁটুর কাছে ভাঁজ করে ফেলল দু'পা, প্রতিপক্ষের হাত শক্ত করে ধরে রেখে সাইকেল চালানোর কায়দায় বার বার লাথি মারতে থাকল ভাঙা নাকে।

কাজ হলো, রক্তের একটা ধারা কালো কালির মতো বের হচ্ছে তালপাতার সেপাইয়ের নাক দিয়ে, রানা টের পাচ্ছে জোর কমছে লোকটার। অনুমান করল, শয়তানটার মাথার ভেতরে দপদপ করতে শুরু করেছে। আরেকবার পানিতে পা ছুঁড়ে দিক বদল করল রানা হঠাৎ, চলে এল লোকটার পেছনে। বাঁ হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে লোকটার গলা, চাপ বাড়াচ্ছে আস্তে আস্তে, চাচ্ছে ওর মাথার দপদপানি আরও কিছুটা বাড়ুক। একইসঙ্গে জোর বাড়িয়েছে ডান হাতে, ক্রমাগত মোচড়াচ্ছে প্রতিপক্ষের ছুরিধরা হাত, বাঁটটা আলগা হলেই থাবা দিয়ে কেড়ে নেবে।

রণে ভঙ্গ দিল তালপাতার সেপাই, মূলত অক্সিজেনের অভাবে। দু'পা সমানে ছুঁড়ছে এখন, পানিতে লাথি মেরে উঠে

যেতে চাচ্ছে উপরের দিকে, বোধহয় খেয়ালও করেনি ওর হাত থেকে আলগা হয়ে গেছে ড্যাগার। ডান হাতে থাবা দিয়ে হাতলটা এমনভাবে ধরল রানা যাতে ফলাটা তাক করে থাকে লোকটার দিকে। পানির নীচে অনেকক্ষণ হয়েছে, রানার ফুসফুসও জানান দিচ্ছে অক্সিজেন চাই।

দুটো সেকেণ্ড খরচ করল রানা হিসেব কষতে। তারপর বাঁ হাত আলগা করে দিল, ছুরির ফলা দিয়ে জোরে গুঁতো মারল তালপাতার সেপাইয়ের ডান কানের নীচে, ঘাড়ের রগে। একটা সেকেণ্ডের জন্য পা ছোঁড়াছুড়ি বন্ধ হয়ে গেল লোকটার, হাঁ হয়ে গেছে মুখ, বড় বড় কিছু বুদবুদ উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে। ছুরিটা বের করল না রানা, ঢুকিয়ে দিল লোকটার গলার আরও ভিতরে। তারপর ফলাটা টেনে বের করল শ্বাসনালীর কাছাকাছি জায়গা দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে জোরে ধাক্কা মারল ওকে, দূরে সরে গেল। এবার পা চালিয়ে সরে এল নিরাপদ জায়গায়।

রক্তের কালো রেখা আরও মোটা হয়েছে এখন। প্লবতার কারণে উপরের দিকে উঠছে তালপাতার সেপাই, কিন্তু রানা জানে, পানি গিলতে শুরু করেছে লোকটা। হাত-পা ছুঁড়ছে সে, দেখলে মনে হয় মৃগী রোগ উঠেছে, কিন্তু আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে আসছে ওর অঙ্গবিক্ষেপ। মনে হয় ভেসে ওঠার আগেই প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাবে।

আবারও দু'পা বুকের কাছে জড়ো করল রানা, লাথি মারল পানিতে। কয়েকবার লাথি মেরে ভেসে উঠল, হাঁ করে দম নিচ্ছে। সোহানার কী হয়েছে জানে না, জানে না বসন্তের দাগের কী অবস্থা।

'রানা!' ওকে মাথা তুলতে দেখে চেঁচিয়ে উঠল সোহানা, 'এদিকে!'

চিৎকারটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে তাকাল রানা।

ল্যাণ্ডিং-এর উপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে বসন্তের দাগ, দেখে মনে হচ্ছে জ্ঞান নেই। ওর কাছেই রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে সোহানা। আস্তে আস্তে সাঁতার কেটে সেদিকে এগোতে শুরু করল রানা।

রিভলভারটা নামিয়ে রেখে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সোহানা, ঝুঁকে পড়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। 'এসো, আমার হাত ধরো। টেনে তুলছি তোমাকে।'

মাথা নেড়ে রানা জানিয়ে দিল সাহায্য লাগবে না। ল্যাণ্ডিং-এর একটা তক্তা আঁকড়ে ধরল একহাতে, টেনেটুনে দেখে নিল তক্তাটা পচা অথবা ওটার কোনো পেরেক আলগা কি না। সন্তুষ্ট হয়ে ড্যাগারের বাঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে, তারপর অন্য হাত দিয়েও আঁকড়ে ধরল তক্তাটা। শরীরের ভর ছেড়ে দিল হাত আর কাঁধের উপর, নিজেকে টেনে তুলল ল্যাণ্ডিং-এ। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল, মুখ থেকে সরিয়ে একপাশে রাখল রক্তাক্ত ড্যাগার, হাঁ করে দম নিচ্ছে এখনও।

হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়ল সোহানা। 'রানা...রানা...' কী বলবে বুঝে উঠতে পারছে না, রানার সারা শরীরে চোখ বোলাচ্ছে কোথাও কেটেকুটে গেছে কি না জানার জন্য।

'আমি ঠিক আছি,' মৃদু গলায় বলল রানা, ইঙ্গিতে দেখাল বসন্তের দাগকে। 'খবর কী?'

'অজ্ঞান। আরও আধ ঘণ্টার আগে নড়বে না।'

উঠে বসল রানা। 'গুলির আওয়াজ শুনেছে মেলিখান আর ওর তিন নম্বর চামচা। কাজেই জলদি চলো স্পীডবোটে উঠি।

বোটে উঠে পড়ল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল সোহানা। নিজের জন্য একদিকে জায়গা করে নিয়ে বসে পড়ল রানা। পিঠ ঠেকিয়ে দিয়েছে বোটের একপ্রান্তের সঙ্গে। এখনও হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প।

'রানা,' মৃদু গলায় ডাকল সোহানা, 'যে-লোকটা তোমাকে জড়িয়ে ধরে পানিতে পড়ল...'

'ওকে খুন করতে বাধ্য হয়েছি। জান বাঁচানো ফরজ। ইঞ্জিন স্টার্ট দাও। রিভলভারটা কোথায়?'

ইগনিশন তার ধরে মোচড় দিল সোহানা, গরগর আওয়াজ তুলে চালু হলো ইঞ্জিন। স্পিডোমিটার, ফুয়েল ইণ্ডিকেটর ইত্যাদি চেক করে নিয়ে বলল, 'আমার কাছেই আছে। লাগবে?'

'দাও,' হাত বাড়াল রানা।

ওকে রিভলভারটা দিল সোহানা। ওটা কোমরের কাছে নামিয়ে রেখে বাউ লাইনটা খুলে ফেলল রানা। তারপর খুলল নিজের উইণ্ডব্রেকার আর সোয়েটশার্ট।

থ্রটলে চাপ বাড়াল সোহানা। আস্তে আস্তে পিছিয়ে নিচ্ছে ও স্পীডবোটটাকে, খোলা লেকের দিকে নাক ঘুরিয়ে নিচ্ছে। 'শক্ত করে ধরে বসো,' গিয়ার রিভার্স করে বলল রানাকে, থ্রটল ঠেলে দিয়েছে উল্টোদিকে।

খোলা লেকের দিকে ছুট লাগাল ওদের বোট।

এদিকওদিক তাকাচ্ছে রানা। 'কী খুঁজছ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'ইমার্জেন্সি কিট। অনেক স্পীডবোটে থাকে। ওটার ভেতরে একটা কম্বল-টম্বল পেলে কাজে লাগত। দু'জনই ভিজে গেছি।'

একটা সীট কুশনের নীচে পাওয়া গেল বড় একটা বাক্স। ওটা বের করে খুলল রানা। কিন্তু ভেতরে কম্বল না, পাওয়া গেল বেশ বড় মোটা একটা চাদর। বোঝা গেল বোটটা ঢেকে রাখার কাজে ব্যবহৃত হয় এটা। চাদরটা বের করল রানা, গায়ে জড়াল, তারপর জায়গা বদল করে বসে পড়ল ড্রাইভিং সীটের পেছনে।

ছুটছে সোহানা। গতি বেশি বাড়াতে পারছে না, কারণ তুষারপাতের কারণে দৃষ্টিসীমা নেমে এসেছে এক শ' ফুটেরও

নীচে। আরও বড় কথা, লেকটা চেনে না ও। ঘাড় ঘুরিয়ে রানাকে দেখল একবার। চোখ বন্ধ করে আছে ও, পিঠটা ঠেস দিয়ে রেখেছে ড্রাইভিং সীটের সঙ্গে, কিন্তু ঘুমাচ্ছে না—সোহানা নিশ্চিত।

খানিকটা আশ্চর্য হলো ও। 'রানা,' ডাকল নিচু গলায়, 'কী করছ?'

'যা করা উচিত তা-ই,' নিচু গলায় বলল রানাও। 'শোনার চেষ্টা করছি আমাদের ইঞ্জিনের আওয়াজ ছাপিয়ে অন্য কোনো ইঞ্জিনের আওয়াজ পাওয়া যায় কি না।'

সতর্ক থাকার কারণেই শব্দটা শুনতে পেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলল ও, রিভলভার তুলে নিয়েছে ডান হাতে। 'সোহানা,' বলল নিচু গলায়, 'এসে গেছে মেলিখান!'

কথাটা শেষ হয়েছে কি হয়নি, যেন তুষারের চাদর ভেদ করে বের হলো মেলিখানের বোট। সঙ্গে সঙ্গে যেন কতগুলো কমলা জোনাকি পোকা দেখা গেল ড্রাইভিং সীটের পাশ থেকে—গুলি করেছে মেলিখান। শব্দটা শোনা গেল এক সেকেণ্ড পর। বোটের উইণ্ডশীল্ড ফুটো করে দিয়ে বের হয়ে গেল বুলেট।

'সোহানা!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ডানে ঘোরো! ওরা সরাসরি গুঁতো মারতে চাইছে আমাদেরকে।'

কথাটা বুঝতে এক সেকেণ্ড সময় লাগল সোহানার। তারপর হুইল ধরে মোচড় দিল। ছুটতে ছুটতেই দিক বদলাল বোটের নাক, নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সরে গেল ডানদিকে। সোহানা দিক বদল করছে টের পেয়ে হুইল ঘোরাল মেলিখানের চামচাও, ড্রাইভিং সীটে বসেছে সে, বোধহয় কসম খেয়েছে যেভাবেই হোক গুঁতো দেবেই। কিন্তু পারল না শেষপর্যন্ত। ওদের বোটের নাক রানাদের বোটের পেছনের প্রান্ত ছুঁয়ে বের হয়ে গেল।

সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না রানা, গুলি করল মেলিখানের

বোটের আউটবোর্ড মোটরে। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, 'সোহানা! আগে বাড়ো!'

থ্রটলে চাপ বাড়াতে শুরু করেছে সোহানা, এমন সময় গুলি করল মেলিখান। রানাদের বোটের অ্যালুমিনিয়াম বডিতে সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল বুলেট।

'ঠিক আছো?' সোহানাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হুঁ,' আবার সামনের দিকে ছুটছে সোহানা। 'তুমি?'

'আমিও। বাঁয়ে কাটো, বোটের টপ স্পীডে চালাও ঠিক দশ সেকেণ্ড। তারপর বন্ধ করে দেবে ইঞ্জিন।'

কোনো প্রশ্ন করল না সোহানা। রানা যা বলেছে তা করার পর বন্ধ করে দিল ইগনিশন। বোটটা ছুটছে এখনও, কিন্তু গতি হারাচ্ছে আস্তে আস্তে। একসময় থেমে গেল। এখন স্রোতের সঙ্গে তাল রেখে দুলছে এদিকওদিক।

'কেন থামলাম, রানা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'মেলিখান এখন কী করে জানার জন্য,' ফিসফিসিয়েই জবাব দিল রানা।

'কী মনে হয় তোমার? কী করবে সে?'

'পাগলের মতো খুঁজতে শুরু করবে আমাদেরকে। শেষ যেদিকে হারিয়ে যেতে দেখেছে আমাদেরকে, সেদিকে আসবে। ওর আউটবোর্ড মোটরে একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়েছি আমি, কিছুটা হলেও বিগড়ে গেছে ওটা, আগের চেয়ে অনেক জোরে আওয়াজ করছে। কাজেই ওর মোটরের আওয়াজ শোনামাত্র আবার ইগনিশন চালু করবে তুমি, টপ স্পীডে ত্রিশ সেকেণ্ড ছুটে থামবে। আমাদের বোটের আওয়াজ শুনতে পাবে না সে। আশা করছি এভাবে এগিয়ে গ্রামের কাছাকাছি কোনো জায়গায় হাজির হতে পারবো আমরা।'

'রিভলভারে আর ক'টা বুলেট আছে?'

দেখল রানা রিভলভারটা। স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন পয়েন্ট থ্রি এইট, ফাইভ শট। 'দুটো বুলেট খরচ হয়েছে,' বলল রানা, 'তিনটে আছে।' হঠাৎ কান পাতল। 'শুনতে পাচ্ছ?'

ওদের গলুইয়ের বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সরে যাচ্ছে শব্দটা আস্তে আস্তে। জোরালো হচ্ছে, প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

'যাও!' নিচু গলায় বলল রানা।

মুহূর্তের মধ্যে ইঞ্জিন চালু করে থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিল সোহানা। টপ স্পীড তোলার পর এক দুই তিন করে ত্রিশ পর্যন্ত গুনে বন্ধ করে দিল ইগনিশন।

নীরবতা। ছোট ছোট ঢেউ এসে বাড়ি খাচ্ছে বোটের গায়ে, ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ পাওয়া যায়। বাতাস পড়ে গেছে। তুষারপাত বন্ধ হয়নি, আজ হবে বলে মনেও হয় না। তুষারকণাগুলো আরও মোটা হয়েছে আগের চেয়ে। বোটটা থেমে থাকায় গলুই আর সীটের উপর জমছে সেগুলো।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। মেলিখানের পাত্তা নেই।

'করছে কী লোকটা?' ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল সোহানা একসময়।

'আমরা যা করছি।'

'মানে?'

'শুনছে। অপেক্ষা করছে।'

'কেন?'

'বুঝতে পেরেছে নিজের মোটরের বিকট শব্দের কারণে আমাদের ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাবে না। কাজেই টেকনিক বদল করেছে।'

এক শ' ফুট দূর থেকে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ভেসে এল। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

'বৈঠা?' সোহানার গলায় শঙ্কা।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'বুদ্ধি বের করেছে মেলিখান। কিন্তু চারদিক সুনসান থাকায় ওর এই বুদ্ধিও মার খেয়ে গেল।'

থ্রটলে হাত রাখল সোহানা।

'না,' ফিসফিস করে বারণ করল রানা।

'ওরা কাছে এসে পড়েছে...'

'অপেক্ষা করো।'

প্রথমবার যেভাবে তুষারের চাদর ভেদ করে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছিল মেলিখানদের বোট, এবারও ঘটল অনেকটা সে-রকম। তবে হঠাৎ না, আস্তে আস্তে দেখা গেল বোটটা। পড়ন্ত পুরু তুষারের কারণে মনে হলো একটা বোটের ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে যেন। রানা-সোহানার বাঁ দিকে উদয় হয়েছে সেটা, আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। ড্রাইভিং সীটে নিশ্চল বসে আছে একটা মূর্তি, দেখতে কেমন ভুতুড়ে লাগছে। বার বার এদিকওদিক তাকাচ্ছে বলে বোঝা গেল মেলিখান কোথায় বসেছে।

রিভলভার তুলল রানা। নিশানা করল মেলিখানকে।

কিন্তু গুলি করার দরকার হলো না। ড্রাইভিং সীটে বসে-থাকা লোকটাকে চাপা গলায় কী যেন বলল মেলিখান, বৈঠার ঠেলায় বোটের মুখ আরেকদিকে ঘুরিয়ে নিল সে।

'নামো!' ফিসফিস করে সোহানাকে বলল রানা।

'কী করতে হবে আমাকে বলো,' বলল সোহানা। 'তুমি পিস্তল নিয়ে রেডি থাকো।'

কী করতে চাইছে বুঝিয়ে বলল সোহানাকে সংক্ষেপে।

'এটা স্রেফ পাগলামি, রানা,' একমত হতে পারছে না সোহানা। 'যা বলছ, করছি। তবে আমাদের ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনে ফেলবে ওরা। আর ফায়ারআর্ম আছে মেলিখানের কাছেও। সন্দেহ নেই গুলি চালাবে সে।'

'কিন্তু লাগাতে পারবে না—এঁকে বেঁকে চালাবে। ওদের ইঞ্জিন বন্ধ আছে, এ-ই সুযোগ।'

ড্রাইভিং সীটের পেছনে, একচিলতে জায়গায় পা গুটিয়ে বসে পড়ল রানা। মাথা আড়াল করেছে পাশের সীটের নীচে।

ইগনিশন স্টার্ট করেই থ্রটলে চাপ বাড়াল সোহানা। বাঁ হাতে ধরে রেখেছে হুইল, রানার ডান হাতে স্মিথ অ্যাণ্ড ওয়েসন। টপ স্পীড তুলে ফেলল সোহানা সাত সেকেণ্ডেই। মেলিখানদের বোটটা যেদিকে অদৃশ্য হয়েছে, দাঁতে দাঁত চেপে ছুটছে সেদিকে। ওদের উপস্থিতি টের পেয়ে মেলিখান যা করতে চেয়েছিল, এবার তা-ই করতে চাচ্ছে রানা। মোটর স্টার্ট করে সরে যেতে যে-সময় লাগবে মেলিখানদের, তারই মধ্যে ওদের বোটটাকে জোরালো একটা "ঘষা" দিয়ে যেতে চায়।

মেলিখানদের বোটটা দেখা গেল, আরেকটু বাঁয়ে সরে গেছে। সমানে চিৎকার করছে মেলিখান, ড্রাইভিং সীটে বসে থাকা লোকটাকে একের পর এক আদেশ দিচ্ছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে ভয়ে জমে গেছে ড্রাইভার, কর্তব্য স্থির করতে পারছে না।

কাজ হবে না বুঝতে পেরে রিভলভার তুলল মেলিখান। সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতে বোটের হুইলটাকে এদিকওদিক ঘোরাতে শুরু করল সোহানা। পর পর দু'বার গুলি করল মেলিখান, দুটোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। ততক্ষণে আরও কাছে চলে গেছে রানা। এবার লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানল পর পর দু'বার। প্রথম গুলিতে মেলিখানের হাঁটুর কাছে, বোটের অ্যালুমিনিয়াম বডিতে চলটা উঠে গেল। দ্বিতীয় গুলিতে পেছনের দিকে হঠাৎ ঝাঁকি খেল মেলিখানের চামচা, চিৎকার করে লাফিয়ে পড়ল পানিতে। একহাতে হুইল ধরল মেলিখান।

হুইলটা আরেকটু ঘোরাল সোহানা—বোটের নাক দিয়ে না, পাশের দিক দিয়ে গুঁতো মারতে চাইছে মেলিখানের বোটটাকে।

কী ঘটতে চলেছে বুঝতে পেরে হাল ছেড়ে দিল মেলিখান। জানে, এখন অস্ত্র তাক করলেই গুলি খাবে কপালে। নিজেকে বাঁচাতে সহজাত প্রবৃত্তির বশে রিভলভার ছেড়ে দিয়ে এক হাত তুলে ধরেছে চোখের সামনে। ওর থেমে থাকা বোটটাকে বেমক্কা এক ধাক্কা মারল রানাদের বোট, মুহূর্তে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল বোটটা মেলিখানকে নিয়ে।

অ্যালুমিনিয়ামের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ উঠল, ধাক্কা সামলাতে দু'হাতে হুইল ধরেছে সোহানা। চুরমার হয়ে গেছে ওদের উইণ্ডশীল্ডের কাঁচ, ভেঙে গেছে ডেক রেইল, খসে পড়েছে লাইট। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল রানা মেলিখানের বোটের দিকে। কী কী ক্ষতি হয়েছে দেখার সুযোগ নেই, কারণ প্রচণ্ড ধাক্কায় উপুড় হয়ে গেছে ওটা, আউটবোর্ড মোটরের ভারে ডুবে যাচ্ছে এখন বুদবুদ তুলে।

গতি একটুও কমাল না সোহানা, কে জানে বোটের তলার কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না! যে-গ্রামে ওদের মোটেল, সেটার তীর থেকে ষাট-সত্তর গজ দূরে থাকতে থ্রটলে চাপ কমাল আস্তে আস্তে। একটু পর বন্ধ করে দিল ইগনিশন, এখন নিজের গতিতেই তীরে গিয়ে ঠেকবে বোট।

হুইল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সোহানা, 'চলো এবার,' বলল ও, 'মনে হচ্ছে, বিপদ কেটেছে আপাতত।'

উঠে দাঁড়াল রানাও।

গ্রামের তীরটা কাছিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। কিছু পাথর পড়ে আছে সেখানে, ওগুলোর গায়ে বার বার আঘাত করছে ছোট ছোট ঢেউ। অনেকগুলো গাছ জন্মে জঙ্গলের মতো বানিয়ে ফেলেছে জায়গাটাকে। কোনো কোনো গাছের কোনো কোনো ডাল প্রলম্বিত হয়ে ঝুঁকে পড়েছে লেকের উপর, তুষারে-ছাওয়া ডালগুলো দূর থেকে দেখলে মনে হয় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে

কঙ্কাল। এই বৈরী আবহাওয়াতেও নাম-না-জানা কিছু পাখি তাদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে লতাপাতার আড়াল থেকে।

তীরে বোট ভিড়তেই লাফিয়ে নামল রানা। নামতে সাহায্য করল সোহানাকে। ব্যাকপ্যাকগুলো নিল।

দুজন মিলে জোর এক ধাক্কায় ডাঙা থেকে দূরে পাঠিয়ে দিল বোটটাকে। তারপর বলল, 'এবার যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মোটেলে ফিরতে হবে।'

'মেলিখানের তাড়া খেয়ে পালানোর চেয়ে এ-কাজ কোনো অংশে কম কঠিন না,' হাসার চেষ্টা করল সোহানা কিন্তু ঠিকমতো পারল না, ঠাণ্ডায় রীতিমতো কাঁপছে। 'কারণ কোন্‌দিকে যেতে হবে কিছুই জানি না। তোমার প্ল্যান কী?'

'সোজা গ্রামে ঢুকে পড়বো। সাহায্য চাইবো গ্রামবাসীদের কাছে। আশা করছি পথ দেখিয়ে দেবে ওরা।'

একুশ

মোটেলে ফিরে প্রথমেই হটওয়াটার শাওয়ার নিল দু'জনে। ম্যানেজারকে বলে কিছু খাবার আনিয়ে নিল রানা, সোহানার সঙ্গে ভাগাভাগি করে খেল রুমে বসে। গির্জা থেকে নেপোলিয়নের যে-বোতলটা পাওয়া গেছে, ওটার কয়েকটা ছবি তুলল তারপর। ওগুলো ই-মেইল করে পাঠিয়ে দিল অপির কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সোহানার মোবাইলে ফোন করল অপি।

'কী খবর, অপি?' রিসিভ করে বলল সোহানা, স্পিকার মোডে

দিয়েছে যাতে রানাও শুনতে পায়।

'রাজা যারক্সিয আর অ্যাপোলোর মন্দিরের ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য জানতে পেরেছি। ভাবলাম আপনাদেরকে জানাই। সময় আছে?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'কিছু নির্ভরযোগ্য বর্ণনা থেকে জানতে পারলাম, ওই মন্দিরে খুব বেশি ধনসম্পদ ছিল না। তারপরও, যে-কোনো কারণেই হোক, যারক্সিয বিশ্বাস করেছিলেন গ্রীকরা খুব দামি কিছু একটা লুকিয়ে রেখেছিল সেখানে। কিন্তু যা বললাম একটু আগে, ওই ব্যাপারে গুজব ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষ কোনো প্রমাণ ছিল না।'

'পরে কি কেউ কিছু খুঁজে বের করেছে সেখান থেকে?' জানতে চাইল রানা।

'প্রত্নতত্ত্ববিদেরা যখন নজর দেন মন্দিরটার দিকে, ততদিনে একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে সেটা। কিছু মূর্তি এবং চমৎকার নকশা-করা কয়েকটা স্তম্ভ বাদে কিছু পাওয়া যায়নি। স্বর্ণালঙ্কার বা রত্নপাথরের কোনো উল্লেখই নেই কোথাও।

সোহানা বলল, 'মন্দিরটার ব্যাপারে অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখায়নি কেউ কখনও? রেকর্ড কী বলে?'

'ওটা অনেকদিন থেকেই প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে আছে। ওদের সব রেকর্ড নির্দিষ্ট সময় পর পর আপডেট করা হয় ওয়েবসাইটে। অ্যাপোলোর মন্দিরের ব্যাপারে দুটো পেইজ আছে, দেখেছি আমি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি, কিন্তু কারও অতিআগ্রহের ব্যাপারে কিছু জানতে পারিনি। তবে...'

'তবে কী?' প্রশ্ন করল সোহানা।

'সরকারের পক্ষ থেকে একজন কিউরেটর নিযুক্ত করা হয়েছে ওই মন্দিরের জন্য। ওখানে একটা যাদুঘর খোলা যায় কি না সে-ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছে সরকার। সার্বিক তত্ত্বাবধান আর

সম্ভাব্য যাদুঘর নিয়ে পরিকল্পনা করাই কিউরেটরের প্রধান কাজ। অনেক খোঁজাখুজি করে, বেশ কয়েক জায়গায় ফোন করে তাঁর কণ্ট্যাক্ট নম্বর জানতে পেরেছি আমি। এবং কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে।'

'কী জানতে পারলে?'

'ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, লণ্ডন ইউনিভার্সিটির স্কুল অভ হিস্টরির জনৈক লেকচারার নাকি একবার আবেদন করেছিলেন তাঁর কাছে।'

'কী বিষয়ে?'

'টানা এক মাসের জন্য ঘাঁটি গাড়তে চায় মন্দিরে, ওখানকার স্থাপনা আর শিল্পকলার উপর গবেষণা করবে। কিন্তু ভদ্রমহিলা মানা করে দেন। কারণ কোনো স্থাপনা যখন প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তর নিয়ে নেয়, সরকারি লোক ছাড়া অন্য কেউ সেখানে গবেষণা চালাতে পারে না। তারপরও লোকটা নাছোড়বান্দার মতো লেগে থাকে মহিলার পেছনে, বার বার যোগাযোগ করতে থাকে তাঁর সঙ্গে। শেষে বাধ্য হয়ে নিজের ই-মেইল অ্যাড্রেস আর মোবাইল নম্বর বদল করেন তিনি।'

'আশ্চর্য তো!'

'আরও কথা আছে। অনুমতি না পেয়ে শেষে চুরি করে অ্যাপোলোর মন্দিরে ঢুকে পড়ে লোকটা একরাতে। এবং প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ে যায়।'

'কী করছিল সে ওখানে?'

'লোকটা নাকি একটা কলামের ওপর অ্যাসিড টেস্ট করছিল।'

'অ্যাসিড টেস্ট?' রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল সোহানা। 'মন্দিরের একটা কলামের ওপর?'

'হ্যাঁ, তবে বিশেষ একটা কলাম। মন্দিরে ঢোকার মুখেই

পাশাপাশি বিশাল দুটো কলাম ছিল। ঐতিহাসিকেরা ওগুলোর নাম দিয়েছেন দ্য কারয়াটিড কলাম। প্রাচীন গ্রীকরা বিশ্বাস করত, ওই কলাম দুটো ছিল সিফিয়ান ট্রেজারির প্রবেশদ্বার। কারয়াটিড কলাম কী, জানতে চেয়েছিলাম কিউরেটরের কাছে।'

'কী বললেন তিনি?'

পাতা উল্টানোর শব্দ পাওয়া গেল মোবাইলের স্পিকারে, নোটবুক খুলেছে অপি। একটু পর বলতে লাগল, 'কারয়াটিড কলাম আসলে একজাতের পাথরের কলাম। মার্বেল পাথর ব্যবহার করে এ-ধরনের কলাম বানানো হতো, দেখতে সাধারণ কলামের মতো না। আলখাল্লা-পরা যুবতীদের দেহকাঠামোর আকৃতিতে বানানো হতো এগুলো। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে আজও দেখতে পাওয়া যায় এ-রকম কিছু কলাম।'

কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। রানা কী যেন ভাবছে। সোহানা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না কী জিজ্ঞেস করবে।

কিছুক্ষণ পর রানা বলল, 'অ্যাসিড টেস্ট বলতে আসলে কী বোঝাতে চেয়েছেন কিউরেটর?'

'তিনি বলেছেন, যখন ধরা পড়ে তখন নাকি স্বর্ণকারদের মতো হাতুড়ি আর একটা অ্যাসিড-কিট পাওয়া যায় পাগলাটে লোকটার কাছে। পরে প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তর ওই কিউরেটরকে প্রধান করে দুই সদস্যের একটা তদন্তদল গঠন করে, এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলে। যথাসময়ে রিপোর্ট জমা দেয়া হয়। ওটার একটা কপি আছে তাঁর কাছে।'

'কপিটা কোনোভাবে যোগাড় করা যায় তাঁর কাছ থেকে?'

'প্রশ্নটা করেছিলাম আমিও। তিনি বলেছেন, গোপন দলিল, তা-ও আবার সরকারি, কোনোভাবেই ফাঁস করতে চান না।'

'ভালো। সৎ মানুষ। ওই প্রভাষক ধরা পড়ার সময় কিছু বলেছিল?'

বলেছে। সে নাকি জানত না জায়গাটা প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তরের অধীনে চলে গেছে। আইনকানুন সম্বন্ধে ভালো ধারণা নেই। আসলে এটা-সেটা বলে কী করছিল সে তা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। প্রত্নসম্পদ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পরে লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।'

'পুলিশে দেয়া হয়নি লোকটাকে?'

'না। কারণ অনুপ্রবেশ করলেও কিছু চুরি করেনি, তার সেই "অ্যাসিড-টেস্টের" কারণে কোনো কিছুর ক্ষতিও হয়নি। তবে লোকটা ইংল্যাণ্ডের নাগরিক বলে ছাড় পেয়েছে সম্ভবত। যা-হোক, অভিযোগপত্রের কারণে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয় পাগলটাকে, লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে খোঁজ নিয়ে জেনেছি। সে কোথায় গেছে কিংবা কী করছে সে-ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই কারও কাছে।'

'কিউরেটর কি লোকটার নাম বলেছেন তোমাকে?'

'বলতে চায়নি। অনেক অনুরোধ করে জানতে হয়েছে।'

'কী নাম?'

'আলফ্রেড হাইকার।'

'আচ্ছা অপি, হাইকারের অ্যাসিড-কিটে ঠিক কোন্ অ্যাসিডটা ছিল?'

'নাইট্রিক অ্যাসিড। এবং এ-জন্যই তিনি পাগলাটে বলেছেন হাইকারকে।'

'কেন?' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল সোহানা।

'কারণ প্রত্নসম্পদ-সংক্রান্ত কোনো কাজে কখনও নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করেন না প্রত্নতত্ত্ববিদেরা। স্ট্যাণ্ডার্ড আর্টিফ্যাক্ট টেস্টেও এর ব্যবহার নেই।'

'তা হলে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহার করে কারা?' আবারও প্রশ্ন করল সোহানা।

'মেটালারজিস্ট, মানে ধাতুবিজ্ঞানীরা,' জবাবটা দিয়ে দিল রানা। 'কোনো অ্যান্টিকের ভিতরে সোনা আছে কি না জানার জন্য ওই অ্যাসিড ব্যবহার করে তারা। তারমানে অ্যাপোলোর মন্দিরে, বিশেষ ওই কারয়াটিড কলামে সোনা আছে কি না দেখতে গিয়েছিল হাইকার।

অপির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলার পর লাইন কেটে দিল সোহানা।

নিজের ল্যাপটপটা নিল রানা, চালু করল। হোটেলের নিজস্ব ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক আছে, সংযুক্ত হলো সেটাতে। গুগলে আলফ্রেড হাইকার নামটা লিখে সার্চ দিল।

দু'হাজারের মতো রেযাল্ট আছে ওই নামের বিপরীতে। কয়েক মিনিট খুঁজে আসল আলফ্রেড হাইকারকে বের করে ফেলল রানা। লোকটার বায়োগ্রাফি পড়ল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'ইতিহাস, বিশেষ করে পারস্য আর গ্রীসের ইতিহাসকে ফোকাস করে বেশ কিছু আর্টিকেল লিখেছে লোকটা। নামিদামি পত্রিকায়, এমনকী কয়েকটা ব্লগে ছাপানোও হয়েছে কিছু। ওর একটা লেখা দেখতে পাচ্ছি বছরখানেক আগে প্রকাশিত হয়েছে একটা অনলাইন ম্যাগাজিনে। ওটাই শেষ।'

'এবং ওই সময় নাগাদই চাকরি হারায় সে,' মনে করিয়ে দিল সোহানা, রানার পাশে বসে উঁকি দিয়ে তাকিয়ে আছে ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে। 'লোকটার কোনো রিসার্চ পেপার আছে নেটে?'

'প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা, ইতিহাস, ভাষাবিজ্ঞান, জীবাশ্মবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে রিসার্চ পেপার দাখিল করার জন্য জনপ্রিয় কিছু সাইট আছে। ওগুলোতে খোঁজ করে দেখতে হবে। অপিকে বলে দেখি, ও-রকম কিছু থেকে থাকলে খুঁজে বের করুক।' দ্রুত একটা ই-মেইল টাইপ করে অপির কাছে পাঠিয়ে দিল রানা।

কিছুক্ষণ পর বিশেষ একটা শব্দ হলো রানার ল্যাপটপে—ফিরতি ই-মেইল পাঠিয়েছে অপি। ওটা খুলল রানা। পড়ে সোহানাকে বলল, 'হাইকারের নামে চোদ্দটা রিসার্চ পেপার খুঁজে পেয়েছে অপি। পিডিএফ অ্যাটাচমেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছে সবগুলো। অপি বলছে, অ্যাপোলোর মন্দিরে হাতেনাতে ধরা পড়ার আগে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে "বৃহত্তর গবেষণার সুবিধার্থে" এক বছরের ছুটি নিয়েছিল হাইকার।'

'কিন্তু ওর সেই বৃহত্তর গবেষণা নিশ্চয়ই লণ্ডন ইউনিভার্সিটির স্বার্থে ছিল না? থাকলে ওকে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হতো না।'

'ঠিক। তারমানে সে আসলে ফ্রিল্যান্সিং করছিল।'

'কার হয়ে?'

জবাব না দিয়ে ঝুঁকে স্ক্রিনের আরেকটু কাছে গেল রানা, ভ্রূ কুঁচকে গেছে। কিছুক্ষণ দেখল একদৃষ্টিতে দেখার পর বলল, 'ভালোমতো দেখো তো, সোহানা। আমার মনে হয় তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে।'

তাকাল সোহানা।

অ্যাটাচমেন্ট করে যে-পিডিএফ ফাইলগুলো পাঠিয়েছে অপি, একটা একটা করে সেগুলো খুলে দেখছিল রানা। একটা ফাইলের সঙ্গে রিসার্চারের ছোট একটা ফটোও আছে। ফটোটা রঙিন, তাই কালো ফ্রেম-পরা অর্ধেক টেকো লোকটার কপালের দু'পাশে কমলা চুলগুলোর রঙ বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না।

সিদোরভের ব্যক্তিগত ল্যাবরেটরিতে এই লোকটাকেই দেখেছে রানা-সোহানা।

বাইশ

নিজের মেইলে ফুটনোট লিখেছে অপি: “হাইকারের ডকুমেন্টগুলো কিনতে হয়েছে। আমার আগে মাত্র একজন করেছে কাজটা। নামটা কি অনুমান করতে পারেন?’

শুধু রানা-সোহানা কেন, যে-কেউই অনুমান করতে পারবে লোকটা কে।

ডকুমেন্টগুলো নিজের আই-ফোনে ট্রান্সফার করে নিল রানা। ল্যাপটপটা ছেড়ে দিল সোহানার জন্য। পরের তিনটে ঘণ্টা হাইকারের রিসার্চ পেপারগুলো নিয়ে পড়ে থাকল দু'জনে। সবগুলো পেপারের ওপর আলাদা আলাদাভাবে নোট নিল। পরে রুম-সংলগ্ন ব্যালকনিতে গিয়ে বসল, নোটগুলো ক্রস চেক করতে চায় রানা।

‘রিসার্চ পেপারগুলো পড়ে কী মনে হলো তোমার?’ জিজ্ঞেস করল রানা। ‘হাইকার আসলে কী? শূন্য কলসি বাজে বেশি টাইপের? নাকি আসলেই জিনিয়াস?’

‘ইতিহাস, ভাষা বা নৃতত্ত্ববিজ্ঞান নিয়ে তেমন পড়াশোনা নেই আমার। তবে যতদূর মনে হয়েছে, নিজের ফিল্ডে অনেক কিছু জানে লোকটা। আর ওর রিসার্চ ওয়ার্কগুলো মৌলিক, অন্তত প্রতিটা পিডিএফ-এ তা-ই দাবি করা হয়েছে। আর, রাজা যারক্সিস আর অ্যাপোলোর মন্দির নিয়ে একরকম মোহ তৈরি হয়ে গেছে ওর মনে।’

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একটা ফাইলে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা পড়লাম। হাইকার দাবি করছে, গ্রীক ঐতিহাসিকেরা যা বলেছেন, অ্যাপোলোর মন্দির লুটের ব্যাপারে তার চেয়ে বেশি সফল হয়েছিলেন রাজা যারক্সিয। আর এই সাফল্য আসলে...কী বলবো...বিমূর্ত। কারণ তাঁর ভয়ে মন্দিরের সব স্বর্ণালঙ্কার গালিয়ে ফেলতে বাধ্য হয় সিফ্বিয়ানরা। তারপর সেই বিশেষ সোনা ঢেলে দেয় বিশেষ দুটো ফাঁপা কারয়াটিডের ভিতরে। ঠাণ্ডা হয়ে সোনা জমাট বাঁধার পর জিপসাম প্লাস্টার দিয়ে ঢালাই করে দেয়া হয় কারয়াটিড দুটোকে। তারপর ওগুলোকে তথাকথিত রত্নভাণ্ডারে ঢোকার প্রবেশপথে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়।'

নিজের নোটের উপর চোখ বুলিয়ে নিল সোহানা। 'হুঁ, মিলছে। কিন্তু সিফ্বিয়ানদের এই বুদ্ধি শেষপর্যন্ত কাজে লাগেনি। ওদের এই চাতুরির খবর আগেই পেয়ে যান যারক্সিয। মন্দিরে অভিযানের সময় আলাদা একটা দল পাঠান তিনি, এরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে ছিল কিন্তু সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দলটাতে দু'শ'র মতো লোক ছিল। এরা সেই কারয়াটিড দুটো চিহ্নিত করে, তারপর দুটো দলে ভাগ হয়ে যায়। পাহারার দায়িত্বে ছিল এক শ' জন, বাকি এক শ' কারয়াটিড দুটোকে বের করে নেয়ার কাজে নিয়োজিত ছিল। গ্রীস থেকে বের হয়ে ওরা প্রথমে, দিক পাল্টে পুবে যায়, কথা ছিল মেসেডোনিয়া আর থ্রেস হয়ে হাজির হবে অ্যাকিমেনিডের রাজধানী পার্সিপোলিসে।'

'যারক্সিয প্ল্যান করেছিলেন কারয়াটিড দুটো ভাঙবেন, ভিতরের সোনা গালিয়ে অভিনব একটা সিংহাসন বানাবেন। সিফ্বিয়ানদের উপর তাঁর বিজয়ের প্রতীক হয়ে থাকবে সিংহাসনটা। কিন্তু গুড়ে বালি—ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে গ্রীকরা, থার্মোপিলির লড়াইয়ে পরাজিত একদল সৈন্য বাড়ি

ফেরার পথে মন্দির লুটের ঘটনা জানতে পেরে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওই দলটাতে মাত্র সাতাশজন সৈন্য ছিল। যারক্সিযের দু'শ'জনের দলটাকে ধাওয়া করে ওরা এবং এখনকার আলবেনিয়ার কাছে এসে প্রায় ধরে ফেলে। মেসেডোনিয়ায় চলে যেতে চাচ্ছিল ওরা, ওদের সেই পথ বন্ধ করে দেয় গ্রীক যোদ্ধারা। এরা ছিল দক্ষ সৈন্য, ওদিকে যারক্সিযের লোকদের কাছে অস্ত্রের চেয়ে যন্ত্রপাতি বেশি। কাজেই লড়তে গিয়ে মরে অনেকে, বাকিরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। গ্রীক যোদ্ধাদের দাবড়ানি খেয়ে টানা তিন সপ্তাহ ধরে পালাতে থাকে যারক্সিযের লোকেরা। পার্সিপোলিসে পৌঁছানো পরের কথা, মণ্টিনিগ্রো বসনিয়া আর ক্রোয়েশিয়ার পাহাড়ে-পর্বতে ঘুরে বেড়াতে থাকে তারা উদ্‌ভ্রান্তের মত। শেষপর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম স্লোভেনিয়ার একজায়গায় কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ওখানে যুদ্ধ বাধে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, সাতাশজনের দলটার কাছে হেরে যায় দু'শ'জনের দলটা, অবশ্য এদের অনেকে পটল তুলেছে আগেই। শেষে মাত্র ত্রিশজন বেঁচে ছিল। কারয়াটিড বহনের জন্য ওই ত্রিশজনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল গ্রীকরা।'

'গ্রীক দলটার নেতা ছিলেন বুদ্ধিমান। তিনি বুঝতে পারেন কলাম দুটো নিয়ে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়া ঠিক হবে না। কারণ আবার হামলা করতে পারেন যারক্সিয। তখন দলবলসহ যতটা সম্ভব চুপিসারে বের হয়ে আসেন স্লোভেনিয়া থেকে। আসলে এমন একটা জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে নিরাপদে লুকিয়ে রাখা যায় কারয়াটিড দুটো। কিন্তু ভীষণ এক তুষারঝড়ের কবলে পড়ে যায় দলটা। সাতাশ আর ত্রিশ, মানে সাতান্নজনের মধ্যে মাত্র একজন প্রাণে বাঁচে। মরতে মরতে লোকটা ফিরে আসে গ্রীসে, কিন্তু বেশিদিন টিকতে পারেনি। মরার আগে শুধু বলে যেতে পেরেছিল, অ্যাপোলোর স্বর্ণ

অ্যাপোলোই ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন।'

'তারমানে কারয়াটিড দুটো ঠিক কোন্ জায়গায় তুষারঝড়ের কবলে পড়েছিল তা আজও রহস্য হয়ে আছে ইতিহাসবিদদের কাছে।'

'আমাদের কাছেও।'

'এবং সে-রহস্যের সমাধান করতে হবে,' একটা সিগারেট ধরিয়ে একবুক ধোঁয়া টেনে নিল রানা। 'পারবো কি না জানি না। যেমন জানি না সিদোরভ কী করে খুঁজে বের করল হাইকারকে, আর হাইকারই বা ওর হয়ে কাজ করতে রাজি হয়ে গেল কেন।'

'কিন্তু এটা পরিষ্কার, সিদোরভকে নিজের গল্প আদ্যোপান্ত বিশ্বাস করাতে পেরেছে হাইকার। সিদোরভ আরও বিশ্বাস করে নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডার হচ্ছে সিফ্ফিয়ানদের সেই কলাম দুটো খুঁজে বের করার ট্রেজারম্যাপ।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ব্যাপারটা নাকি তার বংশমর্যাদার সঙ্গে জড়িত। তারমানে শয়তানটা যদি কোনোভাবে উদ্ধার করতে পারে কারয়াটিড দুটো, যারস্কিয় যা করতে চেয়েছিলেন তা-ই করবে—ভিতরের সোনা বের করে গলিয়ে ফেলবে। কাজটা করতে দেয়া যাবে না ওকে, সোহানা। সোনার জন্য বলছি না, আর্কিয়োলজিকাল আর্টিফ্যাক্ট হিসেবে ওই কারয়াটিড দুটো এককথায় অমূল্য। অবশ্য সত্যিই যদি সেগুলোর অস্তিত্ব থেকে থাকে।'

পরদিন সকাল ছ'টায় বেজে উঠল রানার আই-ফোন। ফোনটা রিসিভ করে রানা বলল, 'কী খবর, অপি?'

'নতুন যে-ছবিটা পাঠিয়েছেন, সেখান থেকে আরেকটা কোড পাওয়া গেছে। ওটার মানে বের করতে পেরেছি। আপনার কাছে

ই-মেইল করে দিচ্ছি। কোনো ইনফর্মেশনের দরকার হলে জানাবেন আমাকে।'

'ঠিক আছে, জানাবো,' লাইন কেটে দিল রানা।

আই-ফোনের মাধ্যমে নেটে সংযুক্ত হলো রানা। নিজের ই-মেইল চেক করে পড়ল অপির নতুন মেইলটা:

ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন

হাউস অভ ল্যাযারাস অ্যাট নাযারেথ

সন অভ মর্পেথ, কীপার অভ লিউস, দ্য ল্যাণ্ড দ্যাট স্ট্যাণ্ডস অ্যালোন

টুগেদার দে রেস্ট।

বিছানা ছাড়ল রানা। রওনা দিল বাথরুমের দিকে। সময় নিয়ে শেভ করবে আজ, তারপর অনেকক্ষণ ধরে গোসল করবে। জানে ওই সময়ের মধ্যেই ওকে পেয়ে বসবে "ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া"।

গুনগুন করে প্রিয় একটা গান গাইতে গাইতে বাথরুমের দরজায় ঠেলা দিল রানা।

নেপোলিয়ন আর লোরনের দুটো ধাঁধার সমাধান করা হয়েছে, তাই রানার বিশ্বাস তৃতীয় ধাঁধাটারও সমাধান করতে পারবে। এর আগে প্রতিটা লাইনের মাধ্যমে একটা শব্দ বোঝাতে চেয়েছেন নেপোলিয়ন আর তাঁর জেনারেল, পরে শব্দগুলো জোড়া দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ মানে পাওয়া গেছে। এবারও হয়তো সে-রকম হবে। তবে যে-সব শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁরা, সেগুলোর বেশিরভাগেরই একাধিক মানে থাকে। আর বেশিরভাগ শব্দই হয় ঐতিহাসিক।

ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভেঙে তাকিয়ে দেখল সোহানা, হোটেলরুমের সোফায় পা তুলে বসে আছে রানা। কোলে

ল্যাপটপ, পিঠে কুশন ঠেকিয়ে তাতে হেলান দিয়ে আছে। কাজ করছে একমনে। রুমসার্ভিসকে খবর দিয়ে ব্রেকফাস্ট আনিয়ে নিয়েছে, খাওয়াও শেষ। খালি প্লেট আর কফির কাপ দেখা যাচ্ছে টেবিলের উপর।

'গুডমর্নিং,' রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল সোহানা।

ল্যাপটপের স্ক্রিনে ডুবে ছিল রানা, সোহানা ডাকায় কিছুটা চমকে উঠে তাকাল ওর দিকে। মুচকি হেসে বলল, 'গুডমর্নিং। উঠলে তা হলে?' হাতঘড়ি দেখল। 'সেঁটে ঘুম দিয়েছ।'

'হুঁ। কী করছ?'

সংক্ষেপে জবাব দিল রানা। তারপর বলল, 'যেভাবে ঘুমাচ্ছিলে, দেখে বুঝলাম উঠতে দেরি হবে তোমার। তাই ভাবলাম একাই শুরু করে দিই।'

'কিছু জানতে পারলে?'

'পেরেছি। এখনই শুনবে, নাকি ফ্রেশ হওয়ার পর?'

'এখনই বলো। আগে ধাঁধাটা বলো আরেকবার।'

'ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন। হাউস অভ ল্যাযারাস অ্যাট নাযারেথ। সন অভ মর্পেথ, কীপার অভ লিউস, দ্য ল্যাণ্ড দ্যাট স্ট্যাণ্ডস অ্যালোন। টুগেদার দে রেস্ট।'

'এবার তোমার ফাইণ্ডিংসগুলো বলো।'

'প্রথম লাইন—ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন। হিস্ট্রিয়া শব্দটার একটা সমার্থক ল্যাটিন শব্দ আছে—ইস্ট্রিয়া।'

'এটা কী?'

'একটা উপদ্বীপ। ট্রিয়েস্ট উপসাগর আর ক্যাভার্নার উপসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত।'

'আর?'

'দ্বিতীয় লাইন—হাউস্ অভ ল্যাযারাস অ্যাট নাযারেথ। এক শ'র মতো মানে পেয়েছি শব্দগুলোর। বাইবেলে ল্যাযারাস শব্দটা

আছে দু'বার। যিশুখ্রিষ্ট যে-লোকটাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন তার নাম ল্যাযারাস। আবার ওই নামে এক ভিক্ষুকের কথাও বলা হয়েছে। আর শৈশবে যে-জায়গায় বড় হয়েছেন যিশুখ্রিষ্ট, সে-জায়গার নাম নাযারেথ।'

'জটিল হয়ে যাচ্ছে না?'

'শুরুতে সব ধাঁধাই জটিল থাকে। তৃতীয় লাইনটা শোনো এবার। সন অভ মর্পেথ, কিপার অভ লিউস। এটারও অনেকগুলো মানে পাওয়া গেছে। উত্তরপূর্ব ইংল্যাণ্ডের একটা শহরের নাম মর্পেথ। আর গ্রীক মিথোলজি বলছে, লিউস একটা পরী—ওসিয়ানুসের মেয়ে।'

'চতুর্থ লাইনটার মানে কী? টুগেদার দে রেস্ট বলতে কী বোঝানো হয়েছে? দে মানে কারা? রেস্ট মানে ঘুমাচ্ছে নাকি মৃত্যুবরণ করেছে? নাকি আগেরটার মতো রূপক কোনো কথা?'

হাসল রানা। 'যাও, ফ্রেশ হয়ে এসে আগে নাস্তা খাও। তারপর দু'জনে মিলে শুরু করি।'

নাস্তা সেরে রানার বাঁ পাশে, সিঙ্গেল একটা সোফায় বসল সোহানা। রানার মতো পা তুলে বসতে গিয়ে বুঝল এই সোফায় অত আরামের সুযোগ নেই। কাজেই সামনের টেবিলটার উপর দু'পা তুলে দিল। ইতিমধ্যে এঁটো প্লেট আর খালি কফির কাপগুলো নিয়ে গেছে রুমসার্ভিস।

'শেষ ধাঁধাটার কথা ভাবো,' কাজুবাদামের একটা প্যাকেট খুলে সোহানার দিকে ছুঁড়ে দিল রানা, নিজের জন্য খুলল আরেকটা। 'জিনিয়াস অভ আইওনিয়া বলতে পিথাগোরাসকে বুঝিয়েছিলেন নেপোলিয়ন আর লোরন। আমার ধারণা এবারের ধাঁধায়ও একই কাজ করেছেন তাঁরা। মর্পেথ নামটা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ সার্চ করলাম, কিন্তু নির্দিষ্ট কিছু পেলাম না।'

কী যেন ভাবছে সোহানা। 'এক কাজ করো। মর্পেথ আর লিউস শব্দ দুটোর ক্রস রেফারেন্স দিয়ে দেখো কিছু পাওয়া যায় কি না। নেপোলিয়ন বা লোরনের কেউ কি গ্রীক মিথোলজিতে এক্সপার্ট ছিলেন?'

'বলতে পারবো না,' গুগলে সার্চ করছে রানা। 'না, ওই নাম দুটো দিয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই।'

'আচ্ছা লিউসের কথা যেন কী বললে? পরী? বিশেষ কোনো ঘটনা কি ঘটেছিল ওর সঙ্গে?'

'পাতালপুরীর দেবতা হেডেস এসে উঠিয়ে নিয়ে যায় লিউসকে। কিন্তু ওই দেবতার সঙ্গে থাকতে চাননি লিউস, তাই আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃতদেহ পরিণত হয় একটা চিনার গাছে।'

'চিনার গাছ? ওই গাছের নাম দিয়ে...'

সোহানা কথা শেষ করার আগেই কীবোর্ডে টাইপ করতে শুরু করে দিল রানা। স্ক্রিনের রেযাল্টগুলো দেখার পর বলল, 'একজাতের চিনার গাছের নাম দেখতে পাচ্ছি লিউস। এবার চিনার গাছের সঙ্গে মর্পেথের ক্রসম্যাচ করে দেখি কী পাওয়া যায়।' কয়েক মিনিটের নীরবতার পর বলল, 'কিছু পেলাম নাকি বুঝতে পারছি না।'

'কী?'

'উইলিয়াম টার্নার। জন্ম মর্পেথ, পনেরো শ' আট সাল। তাঁকে ইংরেজ উদ্ভিদবিদ্যার জনক হিসেবে মনে করা হয়।'

'ইন্টারেস্টিং। তারমানে প্রথম লাইনে ইংরেজ উদ্ভিদবিদ্যার জনকের ব্যাপারে কিছু বলা হয়েছে? নাকি চিনার গাছ?'

'বুঝতে পারছি না। দ্য ল্যাণ্ড দ্যাট স্ট্যাণ্ডস অ্যালোনের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?'

'যে-ল্যাণ্ড একা দাঁড়িয়ে থাকে সেটা দ্বীপ ছাড়া আর কী?'

'আমারও তা-ই মনে হয়,' দ্বীপ, চিনার গাছ আর টার্নার নামগুলো দিয়ে সার্চ দিল রানা। কিছুক্ষণ পর মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'চেযাপিক উপসাগরে চিনার নামের একটা দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। ওখানে বন্যপ্রাণীদের জন্য অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয়েছে। এসবের সঙ্গে টার্নার নামটার কোনো সম্পর্ক নেই।'

'ঠিক আছে। প্রথম লাইনটা নিয়ে আবার ভাবা যাক তা হলে। ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন।'

সার্চ করে ইস্ট্রিয়ান উপদ্বীপের সঙ্গে অনেকগুলো নাম পাওয়া গেল। কিন্তু কোনোটাই ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, অন্তত মর্পেথের মতো না।

'হাউস অভ ল্যাযারাস অ্যাট নাযারেথ দিয়ে খুঁজে দেখো তো,' পরামর্শ দিল সোহানা।

কাজটা করল রানা। অনেকগুলো রেযাল্ট পাওয়া গেল। যে রেযাল্টগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো ওর কাছে, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে পড়ল সেগুলো। তারপর মুখ তুলে বলল, 'মধ্যযুগে কুষ্ঠরোগীদের আলাদা একটা কলোনী ছিল, খ্রিষ্টান মিশনারীরা ধর্মপ্রচারের জন্য নিয়মিত যেতেন সেখানে। ওই কলোনীগুলোকে লেইযার হাউস বলা হতো। কুষ্ঠরোগীদের একজন সাধু ছিলেন, তাঁর নাম দেখতে পাচ্ছি ল্যাযারাস।'

সোহানা বলল, 'ইটালিয়ান ভাষায় লেইযার শব্দটাকে বলা হয় ল্যাযারেট। এর মানে বিশেষ একটা বন্দর যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত কোনো জাহাজকে আলাদা করে রাখা হয় মেরামতের জন্য। দেখো তো ল্যাযারেট দিয়ে কিছু পাও কি না।'

খুঁজল রানা। 'দেখতে পাচ্ছি প্রথম ল্যায়ারেট নির্মিত হয়েছিল চোদ্দ শ' তিন সালে, ভেনিসের এক উপকূলে, স্যান্টা মারিয়া ডি নাযারেথ দ্বীপের কোল ঘেঁষে।'

'তারমানে আমাদের ল্যাযারাস আর নাযারেথের মধ্যে যোগাযোগ ওটাই?'

'নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। প্রথম লাইন থেকে কোনো মানে বের করতে পারছি না, ব্যাপারটা কেমন খোঁচাচ্ছে আমাকে।' আবারও গুগলের সাহায্য নিল রানা। নির্দিষ্ট শব্দগুলো কখনও একসঙ্গে করে, আবার কখনও আলাদা আলাদাভাবে টাইপ করে সার্চ করছে। কখনও আবার সার্চ রেযাল্ট থেকে বিশেষ কিছু শব্দ বাছাই করে নিয়ে খুঁজছে। শেষপর্যন্ত একটা রেযাল্ট ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, সোহানাকে শোনানোর জন্য পড়ল: 'দু'হাজার সাত সালে একটা গণকবরের সন্ধান পায় ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক সোসাইটি। ধারণা করা হয়, ভেনিসে বহুবছর আগে ছড়িয়ে-পড়া দ্রুত সংক্রমণশীল প্লেগে যারা আক্রান্ত হয়নি তারা, যারা আক্রান্ত হয়েছিল তাদেরকে নির্বিচারে খুন করে মাটিচাপা দেয়।'

'জায়গাটা কোথায়?'

'ভেনিসের একটা লেগুনে। নাম ল্যাযেরাটো ভেখিহো।'

'ভেখিহো নামটা দিয়ে খোঁজো তো।'

ওই নামটা দিয়ে খোঁজার পর সোজা হয়ে বসল রানা, লম্বা করে দম নিল।

সোহানা বলল, 'কী?'

'সান্টা মারিয়া ডি নাযারেথের আধুনিক নাম দেখতে পাচ্ছি ভেখিহো।'

আশার আলো জ্বলে উঠল সোহানার দু'চোখে। 'তারমানে এবার ওখানে যেতে হচ্ছে আমাদেরকে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। আরেকটু খুঁজে দেখি।'

পরের বিশটা মিনিট দ্বীপ, ভেনিস, প্লেগ শব্দগুলো দিয়ে

খুঁজল রানা। পার্মিউটেশন-কম্বিনেশন করেও দেখল। তারপর বলল, 'পোভেগলিয়া।'

'এটা আবার কী?'

'ভেনিস লেগুনের আরেকটা দ্বীপ। এখানে প্লেগ আক্রান্ত লোকদেরকে নিয়ে এসে আলাদা করে রাখা হতো। যারা মারা যেত তাদেরকে দাফন করা হতো গণকবরে। এভাবে প্রায় এক লক্ষ ষাট হাজার থেকে আড়াই লক্ষ লোকের কবরস্থানে পরিণত হয়েছে দ্বীপটা।'

'আল্লা! কত কষ্টের দিন পার করেছে ওরা, ভেবে দেখো।'

'তা তো বটেই। আরেকটা কথা। পোভেগলিয়ার অন্য একটা নাম ছিল।'

'কী?'

'পপিলিয়া।'

'পপিলিয়া? শব্দটা পরিচিত মনে হচ্ছে না?'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'শব্দটা এসেছে ল্যাটিন পপুলাস থেকে, ইংরেজিতে যার মানে পপলার। কুঞ্জবন, মানে সারি সারি গাছের কারণে এককালে বিখ্যাত ছিল পোভেগলিয়া।'

'তারমানে আমাদের হাতে এখন দুটো চয়েস—পোভেগলিয়া এবং সাণ্টা মারিয়া ডি নাযারেথ?'

ল্যাপটপটা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে সোফায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। কয়েক ঘণ্টা একটানা কাজ করার কারণে ঘাড় আর পিঠ ব্যথা করছে। হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার নিল ও। 'সোহানা, মাই ডারলিং, যদি কিছু মনে না করো, এখন একটা সিগারেট না খেলেই নয় আমার। ধোঁয়া সহ্য হবে না তোমার, কাজেই দয়া করে ব্যালকনির দরজাটা খুলে দেবে? একটু পর তোমাকে নিয়ে ঘুরতে বের হবো, তাই

সাজুগুজু করে নাও। বাইরের কোনো রেস্টুরেন্টে একসঙ্গে লাঞ্চ করবো দু'জনে। আর হ্যাঁ, আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ভেনিস।'

সেভ্যাস্টাপোল।

সুদৃশ্য ফোনের রিসিভার কানে ঠেকিয়ে রেখেছে সিদোরভ। চেহারা থমথম করছে ওর। এইমাত্র ফোন করেছে মেলিখান, কিন্তু টেলিফোনটা বেজে উঠতেই সিদোরভ বুঝে নিয়েছে খবর ভালো না। জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল সে, 'আমি ভালো আছি কি না তা জানার জন্য নিশ্চয়ই ফোন করোনি, মেলিখান? তুমি আমার ব্যক্তিগত চিকিৎসক না। সময় কাজে লাগানোর জন্য বেতন দেয়া হয় তোমাকে, নষ্ট করার জন্য না। খারাপ খবর দেবে তো? দাও।'

ওপ্রান্তে বার কয়েক ঢোক গিলল মেলিখান, শুকিয়ে-আসা ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে ভেজানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল। মরার আগে যেভাবে ছটফট করছিল নিয়াযভ, কেন যেন সে-দৃশ্য ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'ওরা পালিয়ে গেছে। আমার একজন লোক মারা পড়েছে।'

নীরবতা।

সিদোরভ টের পাচ্ছে ওর রক্তচাপ বেড়ে গেছে। ঘাড়ের পেছনে চিনচিনে ব্যথা। অনেক বছর আগে যে-দুর্দমনীয় ক্রোধ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত সে রুশবাহিনীর ওপর, সে-রকম একটা রাগ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে। নিজেকে সংযত করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। 'আর?'

'সেইন্ট বার্থোলোমিউ'র পার্কে, একটা বাহারি কাপড়ের দোকানে খুঁজে পাওয়া গেছে ট্র্যান্সপণ্ডার চিপটা। বুঝতে পারছি না ওটার কথা কীভাবে জানল ওরা।'

'আর?'

সিদোরভকে ব্যর্থতার আর কোনো খবর জানানোটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল না মেলিখান। তাই বলল, 'আর সব খবর ভালো, বস্। পরিস্থিতি আমাদের নিয়ন্ত্রণে।'

খাস ফারসী ভাষায় জঘন্য একটা গাল দিল সিদোরভ। মেলিখানের কপাল ভালো সে ফারসী জানে না। জানলে ওর দু'গাল তো বটেই, নিঃসন্দেহে আপাদমস্তক লাল হয়ে যেত।

'স্যর, কী বললেন?' তেলতেলে গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'বললাম ওরা কি বোতলটা পেয়ে গেছে?'

কোন্ বোতল বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল মেলিখান। 'জানি না।'

'এখন কোথায় আছে ওরা?'

এবার জানি না বলতে গিয়ে নিজেকে সামলাতে হলো মেলিখানকে। 'আমরা স্থানীয় এক লোককে পাকড়াও করে কথা আদায় করেছি। লোকটা বলেছে, রানা-সোহানার মতো এক যুবক-যুবতীকে একটা মার্সিডিযে উঠতে দেখেছে। খবর নিয়ে জানতে পেরেছি ওটা স্যালয্বার্গের একটা রেণ্ট-আ-রাইড কোম্পানির গাড়ি। জায়গামতো যাচ্ছি আমরা। পুলিশের পরিচয় দিয়ে বলবো রানা-সোহানা ফেরারি আসামি, ওদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সম্ভাব্য কিছু হোটেল-মোটেল, এয়ারপোর্ট আর ট্রেনস্টেশনেও খুঁজবো।'

'দরকার নেই।'

'সরি, স্যর?'

'একাধিকবার ওদের নাগাল পেয়েছ তুমি, এবং প্রত্যেকবার তোমাকে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গেছে দু'জনে। বুঝতে পারছি, ওদের সঙ্গে পাল্লা দেবার সাধ্য তোমার নেই। যেতে দাও ওদেরকে, যা করতে পারে করুক ওরা। আমাদের বিকল্প প্ল্যান নিয়ে কাজ করতে থাকো।'

'কিন্তু স্যর...যদি কিছু মনে না করেন...ঝুঁকি আছে কাজটাতে।'

'কীসের ঝুঁকি?'

'কোনোভাবে যদি জানতে পারে মাসুদ...'

'চুপ করো!' বাঘের মতো গর্জে উঠল সিদোরভ। 'নামটা যদি আরেকবার উচ্চারণ করো আমার সামনে, তোমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো। যত ঝুঁকিই থাকুক, পরোয়া করি না আমি। মাত্র দু'জন মানুষের পেছনে এতগুলো দিন ধরে দুনিয়াময় এতগুলো লোক বেহুদা ঘুরছ, মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে আমার। আর সময় নষ্ট করতে আমি রাজি না।'

'ঠিক আছে স্যর, আপনি যা বলেন। আমার সোর্স জানিয়েছে, বউ আর এক ছেলে নিয়ে থাকে লোকটা।'

'তা হলে পাকড়াও করো তাকে। খবর আদায় করো। বোঝাও, আমাদের সঙ্গে হাত মেলানো ছাড়া কোনো উপায় নেই তার।'

'যদি বুঝতে না চায়?'

'নিশ্চয়ই গলা কাটতে হাত কাঁপে না তোমার? আর যদি চাও, খুন করার আগে ওর বউটাকে নিয়ে ফুর্তি করতে পারো। এসব কথা নিশ্চয়ই নতুন করে বলে দিতে হবে না তোমাকে?'

'সব বুঝতে পেরেছি, স্যর,' মেলিখানের শুকনো ঠোঁট এতক্ষণে ভিজেছে, 'পরে আপনার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবো।'

তেইশ

ভেনিস, ইটালি।

ওয়াটার-ট্যাক্সিটা থামল, নামল রানা-সোহানা। আশপাশের ভবনগুলোর দিকে তাকাচ্ছে দু'জনে।

'আগেও অনেকবার দেখেছি বহু পরিচিত এই দৃশ্য,' নিচু গলায় বলল সোহানা, 'তারপরও মনে হয় যেন প্রথমবার দেখছি। এই শহরটাকে কেন যেন বড় বেশি আপন মনে হয় আমার কাছে। শুনলে হয়তো হাসবে, রানা, তারপরও একটা কথা বলি। ভেনিসকে দেখলে কেন যেন বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে যায় আমার।'

হাসল না রানা। রোদ লাগছে চোখে, তাই শার্টের পকেট থেকে বের করে সানগ্লাস পরল।

এখন যে-জায়গায় আছে ওরা সে-জায়গার নাম পিয়াযা স্যান ভিঞ্জো, ইংরেজিতে বললে সেইন্ট ভিঞ্জো'য প্লাযা। এটা গ্রন্ড ক্যানালিস বা গ্র্যাণ্ড ক্যানালের তীরে অবস্থিত। লক্ষ লক্ষ কবুতর আর এক্কাদোক্কা খেলার জন্য পাথরের বড় বড় ব্লকের ওপর খোদাই-করা "কোর্টের" জন্য বিখ্যাত। শত শত যুগলকে দেখা যাচ্ছে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হানিমুনের জন্যও নাম আছে ভেনিসের।

হাতঘড়ি দেখল রানা, ইটালিতে পা দিয়েই স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিল করেছে। সন্ধে প্রায় ছ'টা বাজে। দিগন্তের পশ্চিম

কোণে ঢলে পড়েছে সূর্য, তারপরও মনে হচ্ছে না তেজ কমেছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইতে শুরু করেছে খালের উপর দিয়ে। কিন্তু তা গা জুড়িয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট না। স্থানীয় একটা লাইব্রেরির জানালার কাঁচে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চায় রোদ। কোনো কোনো দোকানে একটা-দুটো আলো জ্বলে উঠেছে ইতিমধ্যে। ট্যুরিস্টদের বড় একটা অংশ ফিরে গেছে হোটেলে, তা না হলে এই জায়গা গমগম করার কথা। যারা আছে তাদের হাসাহাসির শব্দ শোনা যায় কান পাতলে। একটানা বাকবাকুম করছে কবুতরের দল।

লাইব্রেরির দিকে তাকাল সোহানা। 'কী মনে হয় তোমার? দেখা যে করতে চাচ্ছ লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে, আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন তিনি?'

'তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি আমি। আমাকে আশ্বস্ত করেছেন, তিনি বলতে না পারলেও অসুবিধা নেই। ইতিহাস আর অ্যান্টিক বিশেষজ্ঞ একজনের সঙ্গে নাকি পরিচয় আছে তাঁর। দরকার হলে ওই লোকের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে আমাদেরকে।'

'লাইব্রেরিয়ানের নাম কী?'

'সিনোরা র‍্যাফায়েভো নামে ডাকে সবাই।'

'ভদ্রমহিলার সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কী করে?'

'ওই লাইব্রেরি শুধু লাইব্রেরিই না, ছোটখাটো একটা মিউযিয়ামও। সেই হিসেবে সিনোরাকে লাইব্রেরিয়ান-কাম-কিউরেটর বলা যায়। কিছু ডায়েরি ছিল যাদুঘরে, ইটালির প্রাচীন রাজবংশের জনৈক যুবরাজের। নিজের প্রণয়কাহিনি বিস্তারিত লিখেছেন তিনি ডায়েরিগুলোতে। একদিন হঠাৎ করেই চুরি হয়ে যায় কয়েকটা ডায়েরি। ভেনিস পুলিশ অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু চোরের দলকে ধরতে পারে না। বাধ্য হয়ে রানা এজেন্সির

ভেনিস শাখার সাহায্য নেন সিনোরা র‍্যাফায়েভো। আমি তখন একটা মিশনে ছিলাম, তাই সময় দিতে পারিনি। তবে সময়ে সময়ে খোঁজখবর করেছি, দরকারি নির্দেশনা দিয়েছি আমার লোকদেরকে। আমার কথামতো কাজ করে ডায়েরিগুলো উদ্ধার করতে পারে ওরা। কিন্তু ওদের সামান্য অসর্তকতার সুযোগে পালিয়ে যায় চোরেরা। সে-ব্যাপারে অবশ্য তেমন একটা আফসোস নেই সিনোরা র‍্যাফায়েভোর, ডায়েরি ফেরত পাওয়ায় তিনি খুশি। অনেক পরে একদিন সময় করে দেখা করে যাই তাঁর সঙ্গে।'

'ওই দেখো,' রাস্তার ওপারের ফুটপাতের দিকে ইশারা করল সোহানা, 'দূর থেকে তোমাকে চিনতে পেরে হাত নাড়ছেন মিসেস র‍্যাফায়েভো।'

রানাও হাত নাড়ল, এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াল সিনোরা র‍্যাফায়েভোর সামনে।

'আপনাকে দেখে কী যে খুশি লাগছে, মিস্টার রানা!' মিসেস র‍্যাফায়েভোর গলায় অকৃত্রিম আনন্দ।

'আবারও আপনি? আবারও মিস্টার রানা?' কোমরে হাত রাখল রানা। 'আমি আপনার ছেলের বয়সী। আমাকে তুমি করে বলবেন। আর নাম ধরে ডাকবেন।'

সোহানাকে আপাদমস্তক দেখছেন মিসেস র‍্যাফায়েভো। 'আগেরবার তো একা এসেছিলে, এবার বুঝি বউকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ? তোমার কপাল খুব ভালো। বড় লক্ষ্মী আর মিষ্টি একটা মেয়েকে বউ হিসেবে পেয়েছ। কী নাম তোমার, মা?'

নিজের নাম বলল সোহানা, একটু বাচাল হলেও মিসেস র‍্যাফায়েভোকে পছন্দ হয়েছে ওর।

'চলো, ভিতরে যাই,' বললেন মিসেস র‍্যাফায়েভো। 'গত কয়েকদিন ধরে যা গরম পড়েছে না! রাত না নামলে রাস্তায়

বেরই হওয়া যায় না।'

মিউযিয়াম-কাম-লাইব্রেরির দরজা দিয়ে ঢোকার পর রানা বলল, 'আমাদের হাতে সময় কম। তাই আমার মনে হয় শুধু কাজের কথা বললে ভালো হয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ধীর গতিতে হাঁটতে শুরু করলেন মিসেস র‍্যাফায়েভো। তাঁর পিছন পিছন রানা-সোহানা।

এখন যে-জায়গা দিয়ে যাচ্ছে ওরা, মিউযিয়ামটা মূলত সেখান থেকেই শুরু হয়েছে। প্রথমে বেশ কিছু মূর্তি দেখা যাচ্ছে। আলাদা আলাদা পেডেস্টালের উপর দাঁড়িয়ে আছে, গোড়ায় একটা করে ছোট প্ল্যাকার্ড বসানো—কোন্ মূর্তিটা কার, কোত্থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ইত্যাদি লেখা আছে।

ওগুলো ছাড়িয়ে আরেকটু দূরে শোভা পাচ্ছে প্রাচীন মিশরীয় পাথরের-শবাধার, মেসোপটেমিয়ান রথ, টুসকান ফ্লাওয়ার ভাস আর রোমান নগ্নবক্ষা পাথুরে নারী। হাতির দাঁত দিয়ে চমৎকার-করে-বানানো বাইযানটাইন শো-পিস আর মিনোয়ান আমলের মাটির কিছু জারও আছে।

হাঁটতে হাঁটতে মিউযিয়ামের শেষপ্রান্তে চলে এসেছেন সিনোরা র‍্যাফায়েভো। সামনে অনুজ্জ্বল আলোয় আলোকিত দীর্ঘ একটা হলওয়ে। সারি সারি বইয়ের-র‍্যাক দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা লাইব্রেরি।

মিসেস র‍্যাফায়েভো বললেন, 'যার সঙ্গে কথা বলাতে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে সে আসলে আমাদের মিউজিয়ামের কেউ না, তারপরও এখানে আছে। কত বছর ধরে আছে জানো? শুনলে অবাক হবে—ষাট বছর। পাগলাটে স্বভাবের। ওর বয়স যখন বিশ তখন প্রেমিকা আরেক লোকের সঙ্গে চলে যায়। আধ পাগল হয়ে যায় সে। তখন থেকে এই লাইব্রেরিতে আছে। এখানকার এমন কোনো বই নেই যেটা পড়েনি, এমন কোনো

আর্কিয়োলজিকাল আর্টিফ্যাক্ট নেই যেটার ডিটেইলস ওর মুখস্থ নয়। আমরা ঘাঁটাঘাঁটি করি না ওকে, সে-ও সারাদিন একমনে বইপত্র নিয়েই থাকে। ওর ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না। যদি মেজাজ ভালো থাকে, তোমাদের প্রশ্নের সঠিক জবাব দেবে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা।

'যাও তা হলে,' মুচকি হেসে বললেন র‍্যাফায়েভো। 'সামনেই কোথাও আছে গুইডো। ও, বলা হয়নি, ওটাই ওর নাম। গুড লাক।'

লাইব্রেরিটা দৈর্ঘ্যে যতখানি, প্রস্থে ততটা না। এক শ' ফুট বাই চল্লিশ হবে, অনুমান করল রানা। যতদূর চোখ যায়, শুধু বই আর বই। এমনকী দু'দিকের দেয়ালও দেখা যায় না র‍্যাক আর আলমারির কারণে। প্রতিটা র‍্যাক মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু, লম্বায় বিশ ফুটের মতো।

চাকা-লাগানো মই দেখা যাচ্ছে কয়েকটা। র‍্যাকের উপরের দিকের তাকগুলো থেকে বই নামানোর কাজে ব্যবহৃত হয়, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঠেলা দিয়ে সরাতে হয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর কয়েকটা টেবিল আর পুরনো কিছু চেয়ার আছে। ছাদ থেকে ঝুলছে অনুজ্জ্বল হ্যালোজেন-বাতি। সবুজ টাইলসের মেঝেতে অদ্ভুত আলোছায়া তৈরি হয়েছে ওগুলোর কারণে।

'কে?' বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করে উঠল কেউ। মনে হলো কথা বলছে না, যেন চেঁচাচ্ছে।

'সিনোরা র‍্যাফায়েভো পাঠিয়েছেন আমাদেরকে,' বলল রানা।

আলো সয়ে আসার পর লোকটাকে দেখতে পেল ওরা। দূরের এককোণে একটা মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। রানার মুখে সিনোরা র‍্যাফায়েভোর নাম শোনার পর নামল। ধীর পায়ে হেঁটে আসছে রানা-সোহানার দিকে। কিছুক্ষণ পর সামনে এসে

দাঁড়াল।

'হ্যাঁ, বলো।'

টেনেটুনে পাঁচ ফুটের বেশি হবে না লোকটা। গালে বসন্তের দাগ আছে। র‍্যাফায়েভোর কথা ঠিক হলে কমপক্ষে আশি বছর বয়স হবে লোকটার, তারপরও মাথা ভর্তি চুল। সব পেকে সাদা। তেল-চিরুনির কোনো বালাই নেই, চুলগুলো পরিণত হয়েছে কাকের বাসায়। গালে দু'সপ্তাহের না কাটা দাড়ি। ওজন নব্বই পাউণ্ডের বেশি না। নীল দু'চোখ জ্বলছে!

'হ্যালো,' হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'আমার নাম...'

'তোমার নাম জেনে কোনো কাজ আছে আমার?' খেঁকিয়ে উঠল গুইডো। 'কেন পাঠিয়েছে তোমাদেরকে র‍্যাফায়েভো? আমার সময় নষ্ট করার জন্য?'

'আসলে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার ছিল,' নিচু গলায় বলল সোহানা।

'তা হলে সেটা জিজ্ঞেস করে বিদেয় হচ্ছ না কেন?'

'আমরা আসলে একটা ধাঁধার মানে বের করতে চাচ্ছি,' সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল রানা, বুঝতে পারছে ওদেরকে বেশি সময় দেবে না গুইডো।

'কীসের ধাঁধা?'

'আমাদের ধারণা ধাঁধাটার সঙ্গে ক্রোয়েশিয়ার ইস্ট্রিয়ার যোগাযোগ আছে। আবার পোভেগলিয়া বা সাণ্টা মারিয়া ডি নাযারেথের সঙ্গেও কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে।'

'তুমি কথা বেশি বলো, ছোকরা। ধাঁধাটা শোনাও।'

'ম্যান অভ হিস্ট্রিয়া, থার্টিন বাই ট্রাডিশন।'

গুইডো কিছু বলছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর ঠোঁট দুটো একটা আরেকটার সঙ্গে চেপে বসেছে।

সোহানা বলল, 'আমাদের মনে হয় এটার সঙ্গে ল্যাযারেটেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।'

বিষদৃষ্টিতে সোহানার দিকে তাকাল গুইডো। বোঝা যাচ্ছে মেয়েদেরকে দু'চোখে দেখতে পারে না। থুতু ফেলতে যাচ্ছিল মেঝেতে, কিন্তু কোথায় আছে বুঝতে পেরে শেষমুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। ঝট্ করে ঘুরল। একসারি র‍্যাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুদূর যাওয়ার পর থামল আচমকা। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে, ঠিকমতো শোনা যাচ্ছে না। একইসঙ্গে ডান তর্জনী তুলে কী যেন গুনছে।

'নির্দিষ্ট কোনো একটা বই খুঁজছে মনে হয়,' নিচু গলায় রানাকে বলল সোহানা।

'এই মেয়ে!' গুইডোর চিৎকারে চমকে উঠল ওরা, 'ঘাড় ধরে বের করে দেবো, বুঝেছ? চুপ করে থাকো। একদম চুপ। আমাকে গুনতে দাও।'

আমার ঘাড় ধরতে হলে, মনে মনে বলল সোহানা, আরও ইঞ্চি সাতেক লম্বা হতে হবে আপনাকে।

দু'-তিন মিনিট পর ডানদিকের দেয়ালের দিকে হাঁটতে শুরু করল গুইডো। চাকাওয়ালা একটা মই ঠেলতে ঠেলতে এগোচ্ছে। নির্দিষ্ট একটা র‍্যাকের গায়ে ঠেকাল মইটা, ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল। সাত-আট ধাপ ওঠার পর র‍্যাক থেকে একটা বই বের করল। মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে থেকেই পাতা উল্টাচ্ছে। একজায়গায় এসে থামল, পড়ল কিছুক্ষণ। তারপর বইটা জায়গামতো রেখে দিয়ে নামল মই থেকে, আবার ঠেলতে শুরু করল।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

এভাবে পাঁচবার মই নিয়ে পাঁচটা আলাদা র‍্যাকের কাছে গেল গুইডো, ধাপ বেয়ে উঠে একটা করে বই নিয়ে পাতা উল্টে

পড়ল। মনঃপুত না হওয়ায় চারবার বই রেখে দিল। কিন্তু পঞ্চমবার দেখা গেল বই পড়তে তুলনামূলক বেশি সময় লাগছে ওর। এবার মনে হয় পছন্দ হয়েছে, কারণ মাথা ঝাঁকাচ্ছে, চেহারায় সন্তুষ্টি।

মই থেকে নেমে স্বভাবসুলভ ধীর গতিতে হাঁটতে হাঁটতে রানা-সোহানার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'তোমরা যে লোকটাকে খুঁজছ তার নাম পিয়েত্রো ট্রাডোনিকো। আট শ' ছত্রিশ সাল থেকে আট শ' চৌষট্টি সাল পর্যন্ত ভেনিসের চীফ ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। হিসেব অনুযায়ী এগারো নম্বর ম্যাজিস্ট্রেট, কিন্তু ট্রাডিশনালি তেরো।' জঘন্য একটা গাল দিল নিয়তিকে। 'খুন করা হয় লোকটাকে। ওর অনুসারীরা পোভেগলিয়ায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। দ্বীপটার উত্তরপুব কোণে ওদের-বানানো কিছু কুঁড়েঘর ছিল।' কথা শেষ করে চলে যাওয়ার জন্য ঘুরল।

'একটু দাঁড়ান, প্লিয,' বলল রানা। 'আরেকটা প্রশ্ন ছিল আমাদের।'

ঘুরল গুইডো, কিছু বলল না। দু'চোখে আগুন।

'কোথায় কবর দেয়া হয়েছে ট্রাডোনিকোকে? ওই দ্বীপেই?'

'কেউ বলে ওখানেই। কেউ দ্বিমত পোষণ করে। তবে ওর অনুসারীরা ওর লাশটা হাতে পেয়েছিল, এ-ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওরা সেটা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল জানে না কেউ,' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল গুইডো।

'ধন্যবাদ,' নিচু গলায় বলল সোহানা।

'চুপ করো, ছুকরি!' কড়া গলায় ধমক দিল গুইডো, ঘুরে তাকিয়েছে সোহানার দিকে। 'তোমার ধন্যবাদের নিকুচি করি আমি!'

'কী? তোমাদের প্রশ্নের জবাব পেলে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনোরা

র‍্যাফায়েভো।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।'

'গুইডো খারাপ ব্যবহার করেনি তো?'

'না, না, তেমন কিছু না,' মিথ্যা কথাটা বলতে খারাপ লাগল সোহানার। 'একটা কথা বলুন তো, মিসেস র‍্যাফায়েভো। এখান থেকে পোভেগলিয়ায় যাওয়ার সহজ উপায় কী?'

'ওখানে কেন যেতে চাও তোমরা?'

'গবেষণা।'

হাসলেন সিনোরা র‍্যাফায়েভো। 'কষ্ট করে এত দূর যাওয়ার দরকার আছে? তোমাদের গবেষণার কাজ তো গুইডোই করে দিতে পারে।'

'আমরা আসলে সশরীরে গিয়ে দেখতে চাই,' রানা বলল।

'কোনো কোনো জায়গায় সশরীরে যাওয়া ঠিক না।'

সোহানা বলল, 'আপনি কি প্লেগের জন্য বলছেন? কিন্তু সেটা তো...

'প্লেগ ছাড়া আর কিছু কি থাকতে পারে না?'

আবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে হলো রানা-সোহানাকে।

মুচকি হাসলেন র‍্যাফায়েভো। 'চলো বাইরে কোথাও গিয়ে বসি। গলা ভেজাই। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।'

চব্বিশ

গোধূলিবেলা। পশ্চিমাকাশে একগাদা লাল রঙ মাখিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে সূর্য। ঠাণ্ডা সান্ধ্যবাতাস বইছে লেকের উপর দিয়ে, রাস্তার এপারেও আসছে। মিউযিয়ামের কাছেই একটা ফাস্টফুড শপ, বড় ছাতার নীচে কয়েকটা টেবিল পেতে খদ্দেরদের বসার সুবিধা করে দিয়েছে মালিক। একটা টেবিলে, ছাতার নীচে বসেছে রানা-সোহানা। মিসেস র‍্যাফায়েভোও আছেন ওদের সঙ্গে।

তিন কাপ কফি আর তিনটে চিকেন স্যাণ্ডউইচ নিয়েছে ওরা। স্যাণ্ডউইচ খাওয়া শেষ। এখন যার যার কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। বেশ ভালো হয়েছে কফিটা।

'পোভেগলিয়ার সমস্যার ব্যাপারে কী যেন বলবেন, মিসেস র‍্যাফায়েভো?' এটা-সেটা নিয়ে টুকটাক কথা বলার পর মূল প্রসঙ্গে এল সোহানা।

'তোমরা জানো এককালে মহামারির আকারে প্লেগ দেখা দেয় ভেনিসে। প্লেগরোগীদেরকে তখন জোর করে ফেলে রেখে আসা হতো ওই দ্বীপে। তবে ওটা শুধু রোগীদের আখড়াই না। ওখানে আশ্রম আছে, কলোনি আছে, একটা দুর্গও আছে। এককালে সম্রাট নেপোলিয়ন ব্যবহার করেছেন দ্বীপটা, অস্ত্রাগার হিসেবে। উনিশ শ' বিশ সালে সেখানে একটা মানসিক হাসপাতাল চালু করা হয়।' কফির কাপে চুমুক দিলেন

র‍্যাফায়েভো, তাকিয়ে আছেন লেকের দিকে।

'তারপর?' তাগাদা দিল সোহানা।

মুখ ঘুরালেন র‍্যাফায়েভো। 'ওই হাসপাতালে কাজ করতে যেতে চায় না কোনো ডাক্তার।'

'কেন?'

'কারণ ওখানে নাকি ভূত আছে।'

একসঙ্গে হেসে ফেলল রানা-সোহানা।

'হেসো না। নিজে থেকে বানিয়ে কিছু বলছি না। লোকে যা দেখেছে বা শুনেছে, তা-ই বলছি তোমাদেরকে। ডাক্তারদের কাছে নালিশ করেছে অনেক রোগী, প্লেগরোগীদের ভূত দেখেছে। একে তো মানসিক রোগীদের সামলানো, তার উপর ভূতের উৎপাত; চাপ সামলাতে না পেরে দু'-একজন ডাক্তার আত্মহত্যা করেছে। এক ডাক্তার তো লাফিয়ে পড়েছে বাতিঘরের চূড়া থেকে।'

'কিছু মনে করবেন না, মিসেস র‍্যাফায়েভো, ভূত বিশ্বাস করি না আমরা,' বলল রানা।

'সেটা তোমাদের ব্যাপার। আমি শুধু ঘটনাগুলো জানিয়ে রাখি। যে-ডাক্তারের কথা বললাম একটু আগে, তিনি আত্মহত্যা করার পর টনক নড়ে কর্তৃপক্ষের। হাসপাতালটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন তাঁরা। মিশনারিরাও তাদের কাজ গুটিয়ে নিতে থাকে। আস্তে আস্তে একসময় জনশূন্য হয়ে পড়ে পোভেগলিয়া। কিন্তু আজও নাবিকেরা বলে, দ্বীপটাকে পাশ কাটিয়ে আসার সময় নাকি ঘণ্টার আওয়াজ কিংবা বাতিঘরের আলো দেখেছে। আমার কথা বিশ্বাস না হলে বন্দরে যাও, দু'-চারজন নাবিককে পাবে যারা কসম খেয়ে বলবে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে হাসপাতালের বারান্দায় বীভৎস ছায়ামূর্তি দেখেছে।'

'কিন্তু আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে, সিনোরা

র‍্যাফায়েভো। উপায় নেই।'

'যাও। কিন্তু মনে রেখো, ওই দ্বীপ ইটালির সবচেয়ে ভুতুড়ে জায়গা।'

'আচ্ছা, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কী অসুবিধা ছিল বলো তো?' বলল সোহানা।

'এখন তো সকালই,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'সাদাচামড়ার মানুষরা রাত দুটোকে টু ও' ক্লক ইন দ্য মর্নিং বলে, জানো না?'

'জানি,' জবাব দিল সোহানা। 'কিন্তু আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলছি। বাংলায় কী বলে? দেখো, রানা,' শাসানোর সুরে বলল সোহানা, 'টেকনিকাল কথাবার্তা বলে আমার মেজাজটা খারাপ করে দিয়ো না। রাত বাজে দুটো আর তুমি আমাকে সাদাচামড়ার মানুষদের হিসেব শেখাতে এসেছ, নাকি? সূর্য না ওঠা পর্যন্ত সকাল হয় কখনও?'

'এহ্, দিলে তো হারিয়ে!' কোর্স ঠিক রাখার জন্য স্টিয়ারিং হুইল আরেকটু ঘুরাল রানা। ওদের গন্তব্যস্থলে কোনো আলো নেই, কিন্তু রাতের আকাশের পটভূমিতে বাতিঘরটা দেখা যাচ্ছে।

পোভেগলিয়া দ্বীপটা আয়তনে পাঁচ শ' বাই তিন শ' গজ। একটা খাল বয়ে গেছে ওটার মাঝখান দিয়ে, পশ্চিম থেকে পুবে। ফলে দু'ভাগে ভাগ হয়ে আছে দ্বীপটা।

সিনোরা র‍্যাফায়েভোর সঙ্গে কথা শেষ করে একটা রেন্ট-আ-বোট অফিসে যায় রানা-সোহানা। তখনও খোলা ছিল অফিসটা। মালিক তার চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছিল। একটামাত্র নৌকা রয়েছে, বাকিগুলো ভাড়া নিয়ে গেছে স্থানীয় জেলেরা।

ওদের কপালে জুটল বারো ফুটের চ্যাপ্টা-তলার দাঁড়টানা

একটা নৌকা, সঙ্গে আউটবোর্ড মোটর যুক্ত আছে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো—ওটাই ভাড়া নেয় রানা। ভেনিস থেকে পোভেগলিয়া তিন মাইল দূরে, সান্ধ্য বাতাসটাও জোরালো না; রানার ধারণা পালবিহীন নৌকাটা দিয়ে কাজ হয়ে যাবে।

'সোহানা,' মেঘমুক্ত আকাশে তারাদের অবস্থান দেখে নিল রানা, 'তুমি কি মিসেস র‍্যাফায়েভোর গল্প বিশ্বাস করেছ? পোভেগলিয়ায় যেতে ভয় লাগছে?'

'বাজে বোকো না,' ধমক দিল সোহানা। 'তবে...ভেতরটা কেমন কেমন যেন করছে, অস্বীকার করবো না।'

স্পিডোমিটার আর ফুয়েলমিটারটা চেক করে নিল রানা। 'কেন?'

'এ কথা তো সত্যি, হাসপাতালটা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। এ কথাও সত্যি, কয়েকজন ডাক্তার আত্মহত্যা করেছেন। খোদা না খাস্তা, তুমি যদি আবার...' হাসল সোহানা। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল। 'এখানে ট্যুরিস্টদের আসা নিষেধ। আমরা তো আসলে অনুপ্রবেশ করতে যাচ্ছি।'

'এবং সে-কারণেই রাতের আঁধারে, থুড়ি, মর্নিঙের আঁধারে যেতে হচ্ছে আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকাল সোহানা।

কয়েক মিনিট পরে দ্বীপের সেই খালটা দেখতে পাওয়া গেল। কয়েক শ' গজ দূরে, তীর বরাবর দেখা যাচ্ছে হাসপাতালটাও। বাতিঘরটা আরও কাছিয়ে এসেছে।

'সোহানা!' ফিসফিস করে ডাকল রানা। 'কোনো ভুতুড়ে আলো দেখতে পাচ্ছ?'

'সবকিছু নিয়েই দুষ্টুমি করা চাই, নাকি?'

ঢেউয়ের প্রকৃতি বুঝে নিয়ে গতি কমাল রানা, মোটরের উপর বাড়তি প্রেশার দিতে চায় না। নৌকাটা এগিয়ে যাচ্ছে

খালের দিকে। এ-এলাকায় ডুবোপাথর থাকার সম্ভাবনা কম, তারপরও ঝুঁকি নিতে চায় না রানা।

আশ্চর্যের বিষয়, খালের পানি খানিকটা লোনা হওয়ার পরও জায়গায় জায়গায় ফুটে আছে পদ্মফুল। তলদেশের কোথাও কোথাও পড়ে আছে বড় বড় পাথর, হয়তো অনেক আগে ভূমিকম্পের কারণে গড়িয়ে নেমে এসেছে পাহাড় থেকে। যেসব জায়গায় পাথর আছে, সেখানে পানির গভীরতা মাত্র কয়েক ফুট। খুব সাবধানে, গতি অনেক কমিয়ে জায়গাগুলো পার হলো রানা।

হাতের বাঁ দিকে হরেক রকমের গাছ। সেগুলোর আড়ালে ইটের দেয়াল দেখা যায়। কোন ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিল হয়তো, কিন্তু অসমাপ্ত অবস্থাতেই রয়ে গেছে। ডানদিকে ঝোপঝাড় আর লতাগুল্মের পরিমাণ বেশি। ডানা ঝাপ্টানোর সাঁই সাঁই আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল ওরা। শিকারের খোঁজে বেরিয়েছে একদল বাদুড়।

খালের বেশ কিছুটা ভিতরে ঢোকার পর একদিকে বালির চড়া দেখা গেল। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে বৈঠা তুলে নিল রানা। নৌকার নাকের সঙ্গে বাঁধা দড়ি হাতে অপেক্ষা করছিল সোহানা, তলাটা চড়ায় ঠেকামাত্র লাফিয়ে নামল। খানিকটা দৌড়ে গিয়ে দাঁড়াল বালিতে, কাছের একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে দিল দড়িটা। ততক্ষণে নেমে এসেছে রানাও, নৌকাটাকে ঠেলে বালির আরও কিছুটা উপরে তুলে দিয়েছে। কাজ শেষে পকেট থেকে বের করে নিজের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল ও। সোহানাও ফ্ল্যাশলাইট বের করতে যাচ্ছিল, ওকে নিষেধ করল রানা।

'কোন্‌দিকে যাবে?' আলো ফেলে এদিক-ওদিক দেখছিল রানা, ওকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'উত্তরদিকে।'

বালির চড়া বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। জায়গাটা ঢালু হয়ে নেমে মিশে গেছে খালের পাড়ের সঙ্গে। ঢালের মাথায় ঘন ঝোপজঙ্গল। ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে ঝোপ কম এ-রকম একটা জায়গা চিহ্নিত করল রানা, সোহানাকে পেছনে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পরই হাজির হলো ফুটবল-মাঠের সমান বড় একটা জায়গায়। এখানে চারদিকে ছোট ছোট গাছ জন্মে আছে।

'এটাই কি...' ফিসফিস করে বললেও কথাটা শেষ করল না সোহানা, কণ্ঠ শুনে বোঝা গেল অস্বস্তিতে ভুগছে।

'হতে পারে,' সোহানা কী বলতে চায় বুঝতে পেরে বলল রানা। 'পোভেগলিয়ার কয়েকটা ম্যাপ দেখেছি। কিন্তু মৃত প্লেগরোগীদেরকে ঠিক কোথায় কবর দেয়া হতো সে-ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা হয়নি কোনোটাতে। খেয়াল করে দেখো, এখানে ঝোপজঙ্গল জন্মাতে পারেনি। আসলে বছরের পর বছর ধরে খোঁড়াখুঁড়ি চলেছে, তাই নিজের মতো করে বাড়তে পারেনি জঙ্গল।'

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে মাঠের ভিতর দিয়ে এগোতে লাগল দু'জনে। হাজার হাজার লোকের লাশ এককালে চাপা দেয়া হয়েছে পায়ের নীচে, ভাবলেও কেমন যেন করে বুকের ভিতরে।

মাঠটা পার হয়ে পুবদিকে বাঁক নিল রানা, এক শ' ফুটের মতো এগিয়ে মোড় নিল উত্তরে। গাছপালা আর ঝোপজঙ্গল পাতলা হতে শুরু করেছে। খোলা একটা জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। দূর থেকে বোঝা যায় ওখানে শুধু ঘাস—হাঁটু সমান উঁচু। মেঘমুক্ত আকাশে একটুখানি চাঁদ আছে, ঘেসোজমির ওপারে চাঁদের আলোর প্রতিফলন দেখা যায়। তারমানে ওখানে পানি আছে।

দূরে কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠল।

'বয়া,' বলল রানা, 'তীরের কাছে সাগরের পানিতে ভাসছে।'

'খোদা!' বুকে হাত রাখল সোহানা, কিছুটা হলেও ভড়কে গেছে।

মুচকি হাসল রানা, আলো ফেলে দেখছে এদিক-সেদিকে। 'পাথরের কয়েকটা ব্লক দেখা যাচ্ছে, ঘাসের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে। কোনো ধরনের ফাউণ্ডেশন হবে।'

ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল সোহানার হাতে, অনতিদূরের একটা সীমানাখুঁটির উপর আলো ফেলেছে। 'পাথরের ব্লকগুলো দেখার আগে,' নিচু গলায় বলল রানাকে, 'আমার মনে হয় ওই খুঁটিটা দেখা উচিত।'

খুঁটিটার কাছে এসে থামল দু'জনে। প্লেক্সিগ্লাসের একটা প্ল্যাকার্ড দেখা যাচ্ছে ওটার গায়ে, পেরেক দিয়ে আটকানো আছে। ইটালিয়ান ভাষায় লেখা আছে:

ভেনিসের চীফ ম্যাজিস্ট্রেট (৮৩৬ থেকে ৮৬৪ সাল পর্যন্ত) পিয়েত্রো ট্রাডোনিকোর অনুসারীদের খাসসম্পত্তি। ১৮০৫ সালে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

পোভেগলিয়া হিস্টোরিকাল সোসাইটি।

'পুনরুদ্ধারের সালটা খেয়াল করেছ, সোহানা? আঠারো শ' পাঁচ। ওই বছর ইটালির রাজা ঘোষণা করা হয় নেপোলিয়নকে। যদি ধরে নিই তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন লোরন, তা হলে আমি নিশ্চিত দু'জনই জানতেন কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ট্রাডোনিকোর মৃতদেহ।'

'কী বলতে চাও?'

'বলতে চাইছি, এখানে আনা হয়নি চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের লাশ। তারমানে এখানে কোনো বোতল লুকানো নেই। অর্থাৎ নেপোলিয়ন জুনিয়রকে অন্য কোথাও খুঁজবার ইঙ্গিত করা হয়েছে।'

'কিন্তু সেই অন্য কোথাওটা কোথায়?'

পরদিন গ্র্যাণ্ড ক্যানাল ধরে অনেকদূর এসে একটা গির্জার পাশে থামল ওদের ওয়াটার-ট্যাক্সি। ঘড়িতে তখন সকাল আটটা বাজতে দু'মিনিট বাকি।

ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নামল ওরা। গির্জার পাশেই বহু পুরনো একটা ভবন। যত্নের অভাবে দিন দিন আরও হতশ্রী হচ্ছে। সদর-দরজাটা লোহার, তাতে জায়গায় জায়গায় মরচে ধরেছে। দরজার একপাশে, লাল রঙ-করা দেয়ালে ছোট ব্রোঞ্জফলকে খোদাই করা: পোভেগলিয়া হিসটোরিকাল সোসাইটি।

কলিংবেলে চাপ দিল রানা। কিছুক্ষণ পর কারও পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। দরজা খুলে উঁকি দিল নাদুসনাদুস এক মহিলা, পরনে হলুদ ব্লাউয আর ঢলঢলে গোলাপি স্কার্ট।

'জী?' প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করা হলো ইটালিয়ান ভাষায়।

'ইংরেজি বলতে পারেন?' জানতে চাইল সোহানা।

'পারি তো,' ঝরঝরে ইংরেজিতে জবাব দিল মহিলা। 'কী সাহায্য করতে পারি আপনাদেরকে?'

'আপনি কি সোসাইটির কিউরেটর?'

'সোসাইটি?' ভ্রূ কুঁচকে গেছে মহিলার। 'কীসের সোসাইটি?'

ব্রোঞ্জফলকে খোদাই-করা লেখাটা দেখিয়ে দিল রানা।

'ও,' হাসল মহিলা। 'পাঁচ-ছ'বছর হলো আর বৈঠকে বসছে না সোসাইটির সদস্যরা।'

'কেন?'

'কী করবে? লোকে এসে শুধু জ্বালায়। বিশেষ করে সাংবাদিকেরা। একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে বার বার, আবারও ভূত দেখা গেছে পোভেগলিয়ায়? আবারও কেউ আত্মহত্যা করেছে? কাঁহাতক সহ্য করা যায় এসব, বলুন?'

'তা হলে...' ভদ্রতার খাতিরে সোহানা জিজ্ঞেস করতে পারল না আপনি কে অথবা আপনি কী করছেন এখানে।

একগাল হাসলেন মহিলা। 'আমার নাম ফ্রিডা ভার্নন। সোসাইটিতে একসময় সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করতাম।'

'তা হলে আমাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন সম্ভবত,' নিজের পরিচয় দিল সোহানা, পরিচয় করিয়ে দিল রানাকেও। 'পোভেগলিয়ার ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন ছিল আমাদের। ঠিক সাংবাদিক বলা যাবে না আমাদেরকে। একটা গবেষণার কাজে এখানে এসেছি আমরা আসলে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ভার্নন, ইশারায় ঢুকে পড়তে বললেন রানা-সোহানাকে। ভিতরে ঢুকে লম্বা একটা হল ধরে হাজির হলেন কিচেনে। এখানকার মেঝেতে সাদাকালো টাইলস বসানো। এককোনায় একটা টেবিল। ওটা দেখিয়ে দিয়ে ভার্নন বললেন, 'বসে পড়ুন। কফি বানিয়ে নিয়ে আসি আমি।'

রূপালি একটা পার্কোলেটর থেকে তিনটা মগ পূর্ণ করলেন তিনি, একটা ট্রে-তে করে মগগুলো নিয়ে এসে রাখলেন কিচেন-টেবিলের উপর। বসে পড়লেন সোহানার পাশের চেয়ারে। 'বলুন, কী জানতে চান?'

'পিয়েত্রো ট্রাডোনিকোর ব্যাপারে জানতে চাই। তাঁকে কোথায় কবর দেয়া হয় বলতে পারবেন? পোভেগলিয়াতেই?'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভার্নন। কিচেনের এককোণে কেবিনেট, হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন সেটার সামনে। সিঙ্কের ঠিক উপরের কেবিনেটটা খুললেন। হাত বাড়িয়ে বের করে আনলেন বাদামি চামড়ায়-মোড়া কিছু একটা, দূর থেকে ফটো অ্যালবামের মতো দেখাচ্ছে। টেবিলে ফিরে এসে বসে পড়লেন আগের জায়গায়।

একটার পর একটা পাতা উল্টাতে লাগলেন তিনি, থামলেন

অ্যালবামের মাঝামাঝি জায়গায় এসে। হলুদ হয়ে-যাওয়া এক তা কাগজ বের করলেন, তাতে কারও হাতে-লেখা কয়েকটা লাইন দেখা যাচ্ছে।

'অরিজিনাল রেফারেন্স?' জানতে চাইল সোহানা।

'হ্যাঁ। পোভেগলিয়ার সরকারি একটা নথি বলা যায়, আঠারো শ' পাঁচ সালের। ওই সময়ে নেপোলিয়ন তাঁর সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে নেন দ্বীপটাকে। তখন সরকারি কর্মকর্তারা অনেক গোপন দলিল সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।'

'ট্রাডোনিকো আর তাঁর অনুসারীরা যে-জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিলেন তার দলিলপত্রও কি গায়েব করে ফেলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। তবে আমার হাতের এই ডকুমেণ্ট বলছে, স্ত্রী মাজেলার পাশের সমাধিতেই দাফন করা হয় ট্রাডোনিকোকে। তাঁদের লাশ পচে কঙ্কাল হওয়ার পর তোলা হয় কবর থেকে। তারপর একই কফিনে ঢুকিয়ে অস্থায়ীভাবে দাফন করা হয় একটা প্রাসাদের বেইযমেণ্টে।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা। ধাঁধার শেষ লাইনের সমাধান হয়ে গেছে: টুগেদার দে রেস্ট।

নীরবতা। হাতেধরা কাগজটা মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন ভার্নন। কিছুক্ষণ পর বললেন, 'কিন্তু ওই বেইযমেণ্টে স্থায়ীভাবে থাকতে পারেননি তাঁরা। পরে ট্রাডোনিকোর জন্মস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় লাশ দুটো।'

'জন্মস্থান?' সোহানার প্রশ্ন। 'কোথায়?'

'ইস্ট্রিয়া। দুটো কঙ্কাল একসঙ্গে করার পর তাঁর ভাই-বেরাদার এসে কফিনটা নিয়ে যায়।'

'ইস্ট্রিয়ার কোথায়?'

'সম্ভবত ট্যাজল-এ, যে-গ্রামে জন্ম হয়েছিল তাঁর।'

উঠে দাঁড়াল রানা, হ্যাণ্ডশেক করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল

ভার্ননের দিকে। সোহানাও উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল। তারপর বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। সদরদরজা পর্যন্ত ওদেরকে এগিয়ে দিলেন ভার্নন।

'তা হলে এবার ক্রোয়েশিয়া?' বেশ কিছুদূর চলে আসার পর রানাকে জিজ্ঞেস করল সোহানা।

কিছু না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল রানা।

ট্যাজলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা গড়িয়ে গেল।

ছোট গ্রামটা সমুদ্র সমতল থেকে এক হাজার ফুট উঁচুতে। এখানে ভূমধ্যসাগরীয় একটা আবহ আছে। বেশিরভাগ বাড়ির ছাদে টেরাকোটা ইট দেখা যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই সামনের একটুখানি জায়গায় বাগান বানিয়ে চাষ করা হচ্ছে আঙুর আর জলপাই।

টাউন হলটা খুঁজে বের করতে কষ্ট হলো। প্রধান কারণ ভাষার সমস্যা। এখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী এমনকী ইটালিয়ানও বোঝে না, ইংরেজি পরের কথা। স্থানীয় যে-ভাষা ব্যবহার করে তারা তা কোনোদিন শোনেনি রানা-সোহানা।

তারপরও শেষপর্যন্ত হলটা খুঁজে বের করল ওরা। ভাড়া-করা গাড়িটা পার্ক করল একটা জলপাই বাগানের পেছনে। নামল গাড়ি থেকে।

রেফারেন্স বই থেকে জানা গেছে, গ্রামে মাত্র দেড় হাজারের মতো লোক থাকে। কাজেই আশা করা যায় ট্রাডোনিকো নামটার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় থাকবে কারও-না-কারও।

নিরাশ হতে হলো না। নামটা দু'-চার জায়গায় উচ্চারণ করার পর একজন নিয়ে গেল টাউনহলের কেরানির কাছে। রানার মুখ থেকে নামটা শুনে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল সে, তারপর দোমড়ানো-মোচড়ানো একটুকরো কাগজে

যাচ্ছেতাইভাবে একটা ম্যাপ এঁকে দিয়ে জঘন্য ইটালিয়ানে বলল, যা বলল তার সহজ-সংক্ষিপ্ত বাংলা হচ্ছে, 'জনাব ট্রাডোনিকো।'

ম্যাপটা নিয়ে গাড়িতে চড়ল রানা, এবার স্টিয়ারিং সোহানার হাতে। সর্পিলাকার পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে আরও উপরে যাওয়ার নির্দেশনা আছে ম্যাপে। চলতে শুরু করল ওরা। একটা চারণভূমি পার হয়ে এল, ওখানে এই সন্ধ্যাবেলাতেও কিছু গরু দেখা যাচ্ছে। পথের দু'পাশে জমিন বলতে গেলে নেই, প্রায় সবই শস্যক্ষেত। আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে সাবধানে এগোচ্ছে সোহানা। এদিক-ওদিক হলে দেড় হাজার ফুট নীচে আছড়ে পড়বে গাড়ি।

শেষপর্যন্ত পাকা একটা দালানের সামনে হাজির হলো ওরা, নীচে একটা গ্যারেজ আছে। ওখানে রঙ দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে: ট্রাডোনিকো। অবশ্য ক্রোট শব্দটার মানে বুঝতে সময় লাগল রানা-সোহানার।

বাগানের দরজা খোলাই আছে। ওটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। আশপাশে কোথাও রেডিয়োতে গান বাজছে। পোর্চে, একটা আরামকেদারায় হেলান দিয়ে ছিল এক বুড়ো। রানা-সোহানাকে ঢুকতে দেখে পিঠ সোজা করল। লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা।

পকেট থেকে ক্রোয়েশিয়ান ফ্রেইযের একটা চটিবই বের করল রানা। ওটার নির্দিষ্ট একটা পৃষ্ঠা দেখে নিয়ে ভাঙা ভাঙা ক্রোটে বলল, 'আমি মাসুদ রানা। সঙ্গেরজন সোহানা। আপনার নাম কী?'

'অ্যান্টনি,' বিদেশির মুখে নিজের ভাষা শুনে মজা পেয়েছে বুড়ো, ফোকলা দাঁত বের করে হাসছে।

'ইংরেজি?'

'অল্প অল্প।'

'চলবে। পিয়েত্রো ট্রাডোনিকো নামের এক লোককে খুঁজছি আমরা।'

'ম্যাজিস্ট্রেট?'

'হ্যাঁ।'

'মরে গেছে।'

'জানি। এখন কোথায়?'

'মরে গেছে। অনেক আগে।'

'জানি। পোভেগলিয়ায় কবর দেয়া হয়েছিল প্রথমে। তারপর কোথায়?'

'হ্যাঁ। অনেক আগে। আঠারো শ' পাঁচ সালে। বউয়ের সঙ্গে।'

'এখন কোথায়?'

'আছে। ভিতরে। দেখবে?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এসো।'

উঠে বাড়ির ভিতরে ঢুকল অ্যান্টনি। লিভিংরুম পার হয়ে স্টাডিরুমের মতো দেখতে একটা ঘরে ঢুকল। তালাবদ্ধ একটা আলমারির সামনে দাঁড়াল। ভিতরে একটা তাকে বড় একটুকরো কাঠের গায়ে কারও চেহারা খোদাই-করা। ওটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাদের লোক। সরু চেহারা। লম্বা নাক।'

রানা কিছু বলল না। আলমারির ভিতরে আরও কিছু জিনিস আছে। বেশিরভাগই অলঙ্কার। ছোট একটা আবক্ষ মূর্তিও আছে। কার, বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

সময় নিয়ে জিনিসগুলো দেখল রানা, তারপর অ্যান্টনিকে বলল, 'আপনিও কি একজন ট্রাডোনিকো?'

'হ্যাঁ।'

'আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের কবরটা দেখতে চাই।'

'এসো।' ছোট হলওয়ে ধরে আরেকটা দরজার কাছে এসে থামল বুড়ো। পকেট থেকে বের করল সেকেলে স্কেলিটন-কী। ওটা দিয়ে খুলল দরজাটা।

ঠাণ্ডা একঝলক বাতাস ঢুকল ভিতরে। কোথাও পানি পড়ছে, আওয়াজ পাওয়া যায়। দড়ির মতো কী যেন ঝুলছিল দরজার একপাশে, ওটা ধরে টান দিল অ্যান্টনি। কম পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলে উঠল। পাথরের কতগুলো ধাপ দেখা যাচ্ছে অনুজ্জ্বল আলোয়। কিছুদূর নামার পর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে ধাপগুলো।

'কবর,' ফিসফিস করে বলল অ্যান্টনি, কেন কে জানে। 'মাটির নীচে।' ধাপ বেয়ে নামতে শুরু করল।

ওকে অনুসরণ করছে রানা-সোহানা। যত নামছে, অনুজ্জ্বল বাতিটার আলো তত ঘোলাটে হয়ে আসছে।

আনুমানিক ত্রিশ ফুট নীচে নামার পর ডানে বাঁক নিল ধাপগুলো। তারপর শেষ হয়ে গেল আচমকা। অন্ধকার গিলে নিয়েছে ওদের তিনজনকে। দেয়ালের গায়ে হাতড়াচ্ছে অ্যান্টনি, আওয়াজ শুনলে বোঝা যায়।

একটু পর আরেকটা বাল্ব জ্বালল সে। চোখে আলো সয়ে আসার পর রানা-সোহানা দেখল, সামনে একটা পাথুরে প্যাসেজওয়ে।

ওটার দু'দিকের দেয়ালে, নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর আয়তাকার লম্বাটে গর্ত করা আছে। মসৃণ করে বানানো প্রতিটা গর্তে ঠাঁই পেয়েছে একেকটা কফিন।

'পঞ্চাশ,' গুনে বলল রানা।

'না, আটচল্লিশ,' মাথা নাড়ল অ্যান্টনি। 'দুটো খালি।'

'তারমানে পুরো ট্রাডোনিকো পরিবার ঠাঁই পেয়েছে এই ভূগর্ভস্থ কবরস্থানে?'

'পুরো?' আবারও ফোকলা দাঁতের হাসি দেখাল অ্যান্টনি। 'অনেকেরই জায়গা হয়নি। অনেকে সাধারণ কবরস্থানে আছে। এসো।'

এগোচ্ছে আর বিড় বিড় করে বিদঘুটে একেকটা নাম উচ্চারণ করছে বুড়ো। রানা-সোহানা বুঝতে পারল "কবরবাসীদের" কথা বলছে সে আসলে। প্যাসেজওয়ের শেষপ্রান্তে পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। একটা গর্তের দিকে আঙুল তুলে বলল, 'পিয়েত্রো। উপরেরটাতে ওর বউ মাজেলা।' পকেট থেকে একটা ফ্ল্যাশলাইট বের করে এগিয়ে দিল রানার দিকে।

ফ্ল্যাশলাইটটা নিল রানা, জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিল সোহানার হাতে। টান দিয়ে পিয়েত্রোর কফিনটা বের করে আনল গর্তের ভিতর থেকে। বেশি ভারী না। ওটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল। ঢাকনা তুলতে বেগ পেতে হলো না।

একটা কঙ্কাল শুয়ে আছে। আর কিছু না।

কী মনে হতে মাজেলার কফিনটাও নামিয়ে দেখল রানা। এখানেও কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নেই।

'গুড়ে বালি?' বাংলায়, নিচু গলায় বলল সোহানা, 'দুটো কফিনের একটাতেও কিছু নেই?'

রানা কিছু বলল না, কী যেন ভাবছে। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল অ্যান্টনির দিকে। 'আর কিছু? কঙ্কাল দুটোর সঙ্গে?'

'উপরে।'

'উপরে কী?'

'আসার সময় দেখেছ।'

বিরক্তি চাপল রানা। 'অন্য কিছু?'

'কী?'

'কোনো বোতল? গায়ে ফরাসি ভাষায় কিছু লেখা?'

'ফরাসি? বুঝি না।'

'ঠিক আছে। কোনো বোতল?'

'না। বাক্স।'

'বাক্স? কীসের?'

'জানি না।'

'দেখতে কেমন?'

'পাউরুটির মতো।'

'কোথায় আছে?'

'সামনে।'

দেরি না করে কফিন দুটো জায়গামতো "তুলে রাখল" রানা। তারপর অ্যান্টনিকে বলল, 'চলুন বাক্সটা দেখি।'

আবার হাঁটতে শুরু করল বুড়ো। প্যাসেজওয়েতে ঢোকার মুখে এসে থামল। সবার প্রথম গর্তটাতে কোনো কফিন নেই। হাঁটু গেড়ে বসে ওখানে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। হাতড়াল কিছুক্ষণ। তারপর কাঠের একটা ঝুড়ি বের করে আনল, নামিয়ে রাখল মাটিতে।

ওটার ভিতরে একটা কার্ডবোর্ড, সম্ভবত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আমলের, সৈন্যদের গুলির নিশানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। সঙ্গে পচে-যাওয়া ক্যানভাস আর সুতো দিয়ে প্যাঁচানো পরিচিত একটা বাক্স।

'আল্লা!' বিড়বিড় করে বলল সোহানা।

'বাক্সটা দেখতে পারি?' অ্যান্টনিকে জিজ্ঞেস করল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে দূরে সরে গেল বুড়ো।

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা। ঝুড়ির ভিতর থেকে সাবধানে বের করে আনল বাক্সটা। খোলার আগে উল্টেপাল্টে দেখে নিল। সোহানার দিকে তাকাল একবার।

শেষে হাত রাখল ডালায়।

পঁচিশ

ইটালি

রানার আই-ফোনটা বাজছে। স্ক্রিনের দিকে তাকাল ও। তারপর সোহানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'অপি।' ফোন রিসিভ করে বলল, 'তুমি তো দেখি রেকর্ড করে ফেললে। দু'ঘণ্টার মধ্যেই সমাধান?'

হোটেলরুম-সংলগ্ন ব্যালকনিতে বসে আছে ওরা। রাত নেমেছে, রাস্তার ওপারের বাজারে জ্বলে উঠেছে উজ্জ্বল বাতি, লোকজনের আনাগোনাও বেড়েছে। বাজার ছাড়িয়ে আরও কিছুটা দূরে তাকালে বন্দরের বাতিও চোখে পড়ে।

'হ্যাঁ, মাসুদ ভাই, দু'ঘণ্টার মধ্যেই বুঝে ফেললাম। কোডের মাধ্যমে নেপোলিয়ন যে-ধাঁধা দিয়েছেন তা এখন সহজ মনে হয় আমার কাছে। কারণ প্যাটার্নটা ধরে ফেলেছি আমি।'

"পাতাল কবরস্থান" থেকে যে-বোতলটা পায় রানা-সোহানা সেটা নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের সম্ভবত শেষ বোতল। কিন্তু ওটা পাওয়ার পর উভয় সঙ্কটে পড়ে যায় ওরা। বোঝা যাচ্ছিল বোতলটার মূল্য জানে না অ্যান্টনি, অথচ প্রায় দু' শ' বছর ধরে ওটা পড়ে আছে ওদের পারিবারিক "কবরস্থানে"। এবং এ-ও বোঝা যাচ্ছিল, বোতলটা হাতছাড়া করতে রাজি হবে না বুড়ো, অন্তত বিনামূল্যে না।

'এটা একটা দুর্লভ বোতল, জানেন?' রানা তখন বলে।

'ফরাসি?' জানতে চায় অ্যান্টনি।

'হ্যাঁ।'

'ফরাসিদের পছন্দ করি না। ওদের কোনো জিনিস রাখতে চাই না। ইচ্ছা হলে নিয়ে যাও।'

মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি!

রানা বলে, 'এটার বদলে আপনাকে কিছু দিতে চাই।'

বিরক্তিসূচক শব্দ করে অ্যান্টনি। 'কী ভেবেছিলে? মাগনা দিচ্ছি? বাতের ব্যথা নিয়ে এতদূর হেঁটেছি খামোকা? তিন হাজার কুনা লাগবে।'

রানার দিকে তাকায় সোহানা। বাংলায় বলে, 'বুড়ো একটা মতলববাজ। অথচ দেখলে মনে হয় ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। তিন হাজার কুনায় কত টাকা হয়?'

'প্রায় চল্লিশ হাজার। ডলারে হিসেব করলে পাঁচ শ'।'

ডলার শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনে লোভে চকচক করে ওঠে অ্যান্টনির চোখ। 'আছে?'

'কী?' জিজ্ঞেস করে রানা।

'ডলার?'

'আছে।'

'তা হলে দেরি কেন? বোতল নাও, ডলার দাও,' হাড় জিরজিরে, কাঁপা কাঁপা ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয় অ্যান্টনি সামনের দিকে। 'হ্যাণ্ডশেক। ডিল।'

সোহানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে ডান হাত সামনে বাড়ায় রানা।

'ধাঁধাটা ই-মেইল করলাম আপনার কাছে,' বলল অপি।

'তা হলে এখন রাখি, মানে বের করতে পারলে যোগাযোগ করবো তোমার সঙ্গে,' লাইন কেটে দিল রানা। হোটেলের

ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ঢুকল। নিজের ই-মেইল খুলল। ওর আরও কাছে এসে বসল সোহানা।

ই-মেইলটা পড়তে লাগল রানা:

'ইস্ট অভ দ্য ডুব্র

দ্য থার্ড অভ সেভেন শ্যাল রাইয

দ্য কিং অভ আইওভিস ডাইয

আলফা টু ওমেগা, স্যাভয় টু নোভারা, সেইভিয়ার অভ স্টিরি

টেম্পল অ্যাট দ্য কনকারার্স ক্রসরোডস

পেইস ইস্ট টু দ্য বৌল অ্যাণ্ড ফাইণ্ড দ্য সাইন।'

'এবারের ধাঁধাটা বেশ লম্বা,' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল সোহানা, 'ছ'টা লাইন। শেষের লাইন অন্যগুলোর চেয়ে আলাদা। প্রথম পাঁচ লাইন পড়লে মনে হয় নেপোলিয়ন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, না?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এবারই প্রথম মনে হচ্ছে নেপোলিয়ন যেন বলছেন, "ওখানে যাও," "এটা খুঁজে বের করো" ইত্যাদি। মনে হয় রহস্যটার সমাধানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছি আমরা।'

নিঃশব্দে হাসল সোহানা।

আগেরবার যেভাবে শুরু করেছিল, এবারও সেই পদ্ধতিতেই এগোতে লাগল ওরা। যে শব্দগুলো ঐতিহাসিক জায়গা বা নামের সঙ্গে জড়িত বলে মনে হলো, প্রথমেই আলাদা করে ফেলল সেগুলোকে।

ডুব্র শব্দটার সঙ্গে দুটো নাম পাওয়া গেল: অ্যাড ডুব্র—উত্তর ইয়েমেনের একটা গ্রাম এবং শুধু ডুব্র—কেল্টিক একটা শব্দ যার মানে পানি।

'ইস্ট অভ দ্য ডুব্র,' বলল সোহানা, 'তারমানে ওই গ্রামটার পুবদিকে যেতে বলেছেন নেপোলিয়ন। কী আছে সেখানে,

রানা?'

গুগল আর্থে চেক করল রানা। 'ওই গ্রামের পুবে আশি মাইল এলাকা জুড়ে দেখতে পাচ্ছি শুধু পর্বতমালা আর মরুভূমি। এরপর লোহিতসাগর। কেন যেন মনে হচ্ছে ঠিক মিলছে না।'

'কারণ?'

'এ-পর্যন্ত যত জায়গায় গিয়েছি আমরা, সব ইউরোপের ভিতরেই ছিল।'

'তা হলে অন্য একটা লাইন নিয়ে কথা বলি। দ্য কিং অভ আইওভিস ডাইয। কবে মারা গিয়েছিলেন আইওভিসের রাজা?'

গুগলে সার্চ দিল রানা। 'উঁহুঁ, আইওভিসের রাজা বলে কাউকে পাচ্ছি না। ওই নামে কোনো রাজত্ব বা জায়গারও উল্লেখ নেই। দাঁড়াও, দাঁড়াও, কিছু একটা পেয়েছি মনে হয়। আমাদের বুঝতে ভুল হয়েছে। একজায়গায় দেখতে পাচ্ছি "আইওভিস ডাইস" একক একটা শব্দ বোঝাচ্ছে।'

'কী?'

'বৃহস্পতিবার।'

'বৃহস্পতিবার? মানে?'

'মানে আইওভিস ডাইস হলো থার্সডে'র ল্যাটিন প্রতিশব্দ।'

'দ্য কিং অভ আইওভিস ডাইস...মানে দ্য কিং অভ থার্সডে?'

'জুপিটার,' মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল রানা। 'রোমান মিথোলজি অনুযায়ী জুপিটার হলেন দেবতাদের রাজা। ঠিক যেমন গ্রীকরা মনে করত যিউসকে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সোহানা বুঝে ফেলল কী বলতে চেয়েছে রানা। 'জুপিটার...মানে জোভিয়ান প্ল্যানেট। তারমানে ল্যাটিন শব্দ আইওভিস থেকে জোভিস এসেছে? তারপর সেখান থেকে জোভিয়ান?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'তা হলে জুপিটার, ডুব্র, থ্রি আর সেভেন দিয়ে সার্চ করে দেখো কী পাওয়া যায়।'

খুঁজল রানা কিন্তু কিছু পেল না। আরও কিছু শব্দ যোগ করে, কখনও আবার দু'-একটা শব্দ কমিয়ে খুঁজল, ফল একই। 'পঞ্চম লাইনটা কী ছিল?' জিজ্ঞেস করল সোহানাকে।

'টেম্পল অ্যাট দ্য কনকারার্স ক্রসরোড্স।'

এবার জুপিটারের সঙ্গে কনকারার্স ক্রসরোড্স যুক্ত করে খুঁজল রানা।

কিছু পাওয়া গেল না।

তারপর জুপিটারের সঙ্গে টেম্পল।

'এবার কিছু পাওয়া গেছে মনে হয়,' ল্যাপটপের স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকল রানা, 'জুপিটারের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এ-রকম বেশ কয়েকটা মন্দিরের নাম দেখতে পাচ্ছি। লেবানন, পম্পেই, রোম ইত্যাদি ইত্যাদি। রোমে একটা মন্দির আছে, নাম ক্যাপিটোলাইন হিল। এটা উৎসর্গ করা হয়েছে "ক্যাপিটোলাইন ত্রয়ী", মানে জুপিটার, জুনো আর মিনার্ভার নামে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যেটা দেখতে পাচ্ছি তা হলো, মন্দিরটা রোমের বিখ্যাত সাতটা পাহাড়ের একটায় অবস্থিত।'

'সাত পাহাড়ের একটা?' রানার দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'ধাঁধার তৃতীয় লাইনে বলা হয়েছে দ্য থার্ড অভ সেভেন শ্যাল রাইয। আমরা কি কিছু বুঝতে পারছি?'

কিছু বলল না রানা, গুগলে গিয়ে ম্যাপ খুঁজতে শুরু করে দিয়েছে। প্রাচীন এক চিত্রশিল্পীর হাতে-আঁকা কিছু ম্যাপ পাওয়া গেল একটা ওয়েবসাইটে। রোমান সাম্রাজ্য যখন সমৃদ্ধির চূড়ায় তখন ম্যাপগুলো এঁকেছিলেন সেই শিল্পী।

ল্যাপটপের স্ক্রিন সোহানার দিকে কিছুটা ঘুরিয়ে দিয়ে রানা

বলল, 'ভালোমতো দেখে বলো তো পরিচিত কিছু চোখে পড়ে কি না।'

'কী বলতে চাইছ?' ভ্রূ কুঁচকে স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আছে সোহানা। 'ক্যাপিটোলাইন পাহাড় ছাড়া অন্য কিছু? কই, না...দেখে মনে হয় কোনোকিছুই আমার পরিচিত না।'

স্ক্রিনে সর্পিলাকার একটা রেখা দেখা যাচ্ছে, পাহাড়গুলোর মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়েছে। ওটার উপর তর্জনী রাখল রানা। 'টিবার নদী। উত্তর থেকে দক্ষিণে গেছে।'

তুড়ি বাজাল সোহানা। 'পানির কেল্টিক শব্দটা যেন কী বলেছিলে?'

'ডুব্র।'

রানার দিকে তাকাল সোহানা। 'ধাঁধায় আর কোনো লাইন বা শব্দ যদি না থাকত, আমি কী বলতাম জানো? বলতাম, চলো এখনই রোমে যাই। কিন্তু কেন যেন মনে হচ্ছে, দিল্লি দুরাস্ত।'

রানা-সোহানার ধারণা, সঠিক জায়গায় পৌঁছাতে পারলে শেষ লাইনের মানে বুঝতে অসুবিধা হবে না—পেইস ইস্ট টু দ্য বৌল অ্যাণ্ড ফাইণ্ড দ্য সাইন। তাই চতুর্থ আর পঞ্চম লাইনের উপর মনোযোগ দিল ওরা।

চতুর্থ লাইনে বলা হচ্ছে: আলফা টু ওমেগা, স্যাভয় টু নোভারা, সেইভিয়ার অভ স্টিরি।

পঞ্চম লাইন: টেম্পল অ্যাট দ্য কনকারার্স ক্রসরোড্স।

দুই ঘণ্টা একটানা খাটল ওরা। লিখে নোটপ্যাডের কয়েকটা পাতা ভরিয়ে ফেলেছে সোহানা, কোথাও কোথাও কাটাকুটি করেছে। বার বার মনে হচ্ছে ওর, একই বৃত্তে ঘোরাঘুরি করছে আসলে, নেপোলিয়ন আর লোরন কী বলতে চেয়েছেন বুঝতে পারছে না।

মাঝরাতের কিছু আগে ল্যাপটপ নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল রানা, দু'হাতে চুল টানছে আস্তে আস্তে। হঠাৎ থেমে গেল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

'নেপোলিয়নের বায়োগ্রাফিকাল স্কেচটা দেখতে পারলে কাজ হতো।'

'কোন্‌টার কথা বলছ?'

'ই-মেইল করে আমাদেরকে যেটা পাঠিয়েছিল অপি,' এদিক-ওদিক তাকিয়ে খুঁজে পেতে আই-ফোনটা তুলে নিল রানা। মেইলবক্স চেক করে সঠিক মেইলটা বের করল, খুলল। 'পেয়েছি। স্টিরি।'

'বুঝলাম না, রানা,' মাথা নাড়ছে সোহানা। 'এটা নতুন করে পাওয়ার কী আছে? স্টিরি যে অস্ট্রিয়ার একটা জায়গার নাম তা তো আমরা আগে থেকেই জানি। তা ছাড়া স্টিরির সঙ্গে নেপোলিয়নের স্কেচের সম্পর্ক কী?'

'সম্পর্কটা হলো, স্টাইরি নামে একটা ঘোড়া ছিল নেপোলিয়নের। স্টিরি আর স্টাইরির বানান একই।'

কিছুক্ষণ রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সোহানা। 'তা হলে সেইভিয়ার অভ স্টাইরি...সেইভিয়ার মানে ত্রাণকর্তা। প্রশ্ন হলো, নেপোলিয়নের সেই ঘোড়াকে কে বাঁচিয়েছিল? কোনো পশুচিকিৎসকের খোঁজ করতে হবে আমাদেরকে?'

মাথা নাড়ল রানা।

'তা হলে আমার কী মনে হয় বলে ফেলি। আগের লাইন, মানে স্যাভয় টু ওমেগা, আলফা টু নোভেরা'র সঙ্গে যোগাযোগ আছে স্টিরির ত্রাণকর্তার। আমরা জানি ফ্রান্সের একটা জায়গার নাম স্যাভয়, আর নোভেরা হলো ইটালির একটা রাজ্য।'

'এবং নোভেরা ছিল নেপোলিয়নের ডিপার্টমেন্ট অভ দ্য

কিংডম অভ ইটালি'র হেডকোয়ার্টার। আঠারো শ' চোদ্দ সালে এর দায়িত্ব অর্পিত হয় হাউস অভ স্যাভয়ের কাছে।'

'তাতে আমাদের কী লাভ হচ্ছে? আমরা কি কিছু বুঝতে পারছি? আলফা টু ওমেগা'র মানে বের করতে পারলে...'

'আলফা টু ওমেগার মানে যদি বলি সূচনা আর পরিসমাপ্তি, জন্ম আর মৃত্যু, শুরু আর শেষ?'

'আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ডিপার্টমেন্ট অভ দ্য কিংডম অভ ইটালির দায়িত্ব পালন করেছেন যিনি সবার আগে, তাঁর কথা বলছ? নাকি আঠারো শ' চোদ্দোতে যিনি দায়িত্ব বুঝে নিয়েছিলেন তাঁকে খুঁজবো? না, কোনোটাই হবে বলে মনে হয় না। আমরা কি আসলে কারও নাম খুঁজছি, রানা? এমন কেউ, যিনি জন্মেছিলেন স্যাভয়ে, মারা গেছেন নোভেরাতে?'

ছোঁ মেরে ল্যাপটপটা তুলে নিল রানা। কীবোর্ডের উপর আঙুল চালাল দ্রুত গতিতে। আবারও কম্বিনেশন করে খুঁজছে গুগলে।

দশ মিনিট পর একটা ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া গেল নামটা, জোরে জোরে পড়ল রানা, 'বার্নার্ড অভ মেন্থন। জন্ম স্যাভয় ন'শ' তেইশ সাল। মৃত্যু নোভেরা, এক হাজার আট সাল। তাঁকে একজন সাধু হিসেবে ঘোষণা করেন একাদশ পোপ, উনিশ শ' তেইশ সালে।'

'বার্নার্ড,' বিড়বিড় করছে সোহানা। 'মানে সেইন্ট বার্নার্ড?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু মনে কোরো না, রানা, সেইন্ট বার্নার্ড শব্দটা শুনলে প্রথমেই বিশেষ একজাতের কুকুরের কথা মনে পড়ে।'

শূন্য দৃষ্টিতে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা কিছুক্ষণ। তারপর গুগলে সার্চ দিল: সেইন্ট বার্নার্ড কুকুর।

স্বাভাবিকভাবেই অনেকগুলো রেযাল্ট পাওয়া গেল। একটা

ওয়েবপেজ থেকে জানা গেল, কুকুরগুলো তাদের কুখ্যাতি বা অপযশ পেয়েছে সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথের অনেক পুরনো একটা আশ্রম-কাম-সরাইখানা থেকে। কারও কারও দাবি, সরাইখানাটাই নাকি কুকুরগুলোর বর্তমান প্রজাতির উৎপত্তিস্থল।

এবার গুগলে রানা লিখল: গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথ।

চমকে দেয়ার মতো একটা রেযাল্ট পাওয়া গেল এক ওয়েবপেজ থেকে। পড়তে লাগল রানা, 'গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথ, পেনাইন আল্পস্। এখানে অনেক পুরনো একটা আশ্রম বা সরাইখানা আছে, যা, এই এলাকায় এসে যারা আহত হয় অথবা হারিয়ে যায়, মূলত তাদের সেবা দিয়ে থাকে। এগারো শতক থেকে কাজ করছে সরাইখানাটা। এমনকী নামিদামি লোকদেরও সেবাশুশ্রূষা করেছে। আঠারো শ' সালে রিযার্ভ আর্মি নিয়ে এখান দিয়ে ইটালি যাচ্ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, তখন তিনি সরাইখানাটার আতিথ্য গ্রহণ করেন।' কিছুক্ষণ চুপ

করে থাকার পর বলল, 'অনুমানে যদি বলি, তখন তুষারঝড়ের কবলে পড়েছিলেন নেপোলিয়ন এবং নাল পরানো কিংবা অন্য কোনো শুশ্রূষার জন্য স্টাইরিকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই সরাইখানায়, তা হলে কি ভুল হবে?'

'হয়তো না। টেম্পল অ্যাট দ্য কনকারার্স ক্রসরোডের আলোচনায় এসো এবার। কনকারার্স মানে বিজয়ীরা। ওই পর্বতমালা অতিক্রম বা বিজয় করেছেন অনেকে। যেমন হানিবাল, শার্লেম্যাগনে, রোমানরা।'

ল্যাপটপে আবার টাইপ করতে শুরু করেছে রানা। জুপিটার আর টেম্পল শব্দ দুটোর সঙ্গে গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ডকে জুড়ে দিয়েছে।

পাওয়া গেল ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটির একটা আর্টিকেল। বলা হচ্ছে, গিরিপথের চূড়ায় অবস্থিত টেম্পল অভ জুপিটার মন্দিরটি

প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট অগাস্টাস, সত্তর খ্রিষ্টাব্দে।

আবার গুগল আর্থে সার্চ দিল রানা। কিন্তু টেম্পল অভ জুপিটারের নামের বিপরীতে ধূসর গ্র্যানিটের স্তূপ ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

'আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না,' বলল সোহানা।

'কিছু না কিছু আছেই। আমি শিওর।'

'মন্দিরের পুব দিকে কী আছে?' তর্জনী দিয়ে নদীর তীর বরাবর দেখাচ্ছে সোহানা। 'উঁহুঁ, বৌলের মতো দেখতে কিছু তো নজরে আসে না?'

'ছবিটার রেযোল্যুশন আসলে ভালো না। আমাদেরকে ওই মন্দিরের ছাদে চড়তে হবে। পুবদিকে তাকিয়ে দেখতে হবে কীসের কথা বলেছেন নেপোলিয়ন।'

'চমৎকার!' মিনিট দশেক পর সোহানার ফোন পেয়ে সব শুনে বলে উঠল অপি। হাতে-ধরা চায়ের কাপে চুমুক দিল, হেলান দিল চেয়ারে। আরাম করে যাতে কথা বলতে পারে সেজন্য চালু করে দিল ফোনের স্পীকার মোড। 'এখন আপনাদের প্ল্যান কী, সোহানাদি?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গিয়ে হাজির হওয়া গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথে। ছুটিও ফুরিয়ে আসছে।'

'ঠিক আছে, যান তা হলে। আমি সেই ফাঁকে কিছু পড়াশোনা করে রাখি। গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পারলে যোগাযোগ করবো আপনাদের সঙ্গে। ও, হাইকারের ধারণাই তা হলে ঠিক? ইটালি হয়ে গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কারয়াটিড দুটো? তারপর?'

'তারপর, আমাদের অনুমান, প্রায় আড়াই শ' বছর পর যেভাবেই হোক ওগুলো খুঁজে পান নেপোলিয়ন। দুটো প্রশ্ন এখন

আমাদের সামনে—কোথায় এবং কীভাবে। ওই মন্দিরে না যাওয়া পর্যন্ত প্রশ্ন দুটোর উত্তর জানা যাবে না।'

'এক্সাইটিং! আমার ইচ্ছা করছে ছুটে গিয়ে যোগ দিই আপনাদের সঙ্গে। কিন্তু এজেন্সি ফেলে সেটা সম্ভব নয়। দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাতে হবে। সময়ে সময়ে যোগাযোগ করবো আপনাদের সঙ্গে। আপনারা বিরক্ত হবেন না তো, দিদি?'

'আরে না! বিরক্ত হবো কেন? রাখি তা হলে? আমাদেরকে মালসামান গোছাতে হবে,' লাইন কেটে দিল সোহানা।

চেয়ারে আরেকটু হেলান দিতে দিয়ে পেছনে মৃদু একটা শব্দ শুনতে পেল অপি। ঝট্ করে ঘাড় ঘুরাল। যে-রুমে কাজ করে সে, ইচ্ছা করেই সেখানে উজ্জ্বল আলো ব্যবহার করে না; দরজার কাছটা তাই অন্ধকারে ঢাকা। একটা ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে, অপিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে দেখে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

ভয় পেয়ে গেল অপি। নিজের অজান্তেই চিৎকার করে বলে উঠল, 'কে?'

থমকে দাঁড়িয়ে গেল ছায়ামূর্তিটা। ইতস্তত করছে, চলে যাবে কি না ভাবছে বোধহয়। তারপর ধীর পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়াল ঘরের ভিতর, রহস্যময় আলোআঁধারিতে।

'আমি আরিফ, ম্যাডাম,' বলল সেফ হাউসের গার্ড।

'তুমি?' চেপে-রাখা দম শব্দ করে ছাড়ল অপি। 'ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে আমাকে। ডিউটি ফেলে দরজার কাছে ওভাবে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন?'

'এদিকে একটা শব্দ শুনে দেখতে এসেছিলাম, ম্যাডাম। দেখলাম আপনি ব্যস্ত, কথা বলছেন, তাই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।'

চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠল অপি।

'এদিকে কোনও শব্দ হয়নি। হলে আমিই ডাক দিতাম। ডিউটি ফেলে এখানে আসা মোটেও ঠিক হয়নি তোমার। যাও, কাজে যাও।'

'সরি, ম্যাডাম। এমন ভুল আর হবে না।'

আরিফ বের হয়ে গেল ঘর থেকে। কেন যেন মনটা কু ডাকছে অপির। কথা শুনছিল লোকটা... মনে হচ্ছে, কোনও বিশেষ মতলব ছিল আরিফের। কী হতে পারে সেটা?

ছাব্বিশ

গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথ, সুইস-ইটালিয়ান সীমান্ত।

ইটালিয়ান সীমান্ত ঘুরে এখানে এসেছে রানা-সোহানা। গিরিপথের নামের সঙ্গে মিল রেখে একটা টানেল বানানো হয়েছে, ওখান দিয়ে ভাড়া-করা গাড়িতে করে যাচ্ছে দু'জনে। শেষমাথায় পৌঁছাতে ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে, হিসেব করল রানা।

প্রকৌশলবিদ্যা কতদূর এগিয়েছে, টানেলটা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। পর্বতের ভিতর দিয়ে বানানো হয়েছে ওটা, সোজা এগিয়ে গেছে চার মাইল, ইটালি সীমান্তের অ্যাওস্টা-র সঙ্গে যুক্ত করেছে সুইস সীমান্তের মার্টিগনি উপত্যকাকে। উপরের গিরিপথে আবহাওয়ার ঠিক-ঠিকানা নেই; যখন-তখন শুরু হয় তুষারপাত, কখনও বিনা নোটিশে হিমপ্রপাত। কিন্তু অনেক নীচের এই টানেলে ওসবের কোনো বালাই নেই।

পঞ্চান্ন মিনিটের মাথায় টানেলের আরেক প্রান্ত দিয়ে বের হলো ওরা। সরু একটা উপত্যকায় হাজির হয়েছে। সামনে বেশ বড় একটা লেক, ওটার একধারে গাড়ি থামাল রানা।

এখানে সুইস-ইটালিয়ান বর্ডার নামধারী কোনো পিলার নেই। দু'-চার ঘর বসতি আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, সম্ভবত শুধু তারাই বলতে পারে কোন্ জায়গাটা সুইটযারল্যাণ্ডের, কোন্টা ইটালির। কে জানে, ভৌগোলিকভাবে লেকটা হয়তো ভাগাভাগি করে নিয়েছে দু'দেশ।

তবে লেকটা দেখার মতো। অনেকটা ডিম্বাকৃতির, নীলচে-সবুজ পানির একপাশ ঢেকে গেছে বরফে। চারদিক ঘিরে রেখেছে খাড়া পাহাড়ি দেয়াল। পুবদিকে, মানে সুইস সীমানায়, সেই আশ্রম-কাম-সরাইখানা। উল্টোদিকে, যেখানে ইটালির শুরু, তিনটে বড় বড় দালান। একটা হোটেল, একটা স্টাফ কোয়ার্টার, আর ইটালিয়ান আর্মি-পুলিশের একটা ব্যারাক-কাম-চেকপয়েন্ট। দূর থেকে ব্যারাকটাকে সিগারের মতো দেখায়।

মেঘহীন নীল আকাশে জ্বলছে সূর্য, কিন্তু তাতে ঠাণ্ডা কমেনি। ঝকঝকে রোদ প্রতিফলিত হচ্ছে লেকের পানিতে এবং এখানে-সেখানে জমে থাকা টুকরো টুকরো বরফে, এমনকী গিরিপথের বরফসমৃদ্ধ একাধিক ঢালে। কোনো কোনো প্রতিফলন এত তীব্র যে, চোখ মেলে তাকানো দায়। লেকের দক্ষিণ তীরে লম্বা ছায়া ফেলেছে "উন্নত মম শিরের" অহঙ্কারী এক পর্বতচূড়া।

হোটেলের কাছে পৌঁছাতে হলে লেকের অনেকখানি ঘুরতে হবে। আবার গাড়ি চালাতে শুরু করল রানা। একটা পার্কিং স্পট আছে হোটেলের কাছে, ওখানে এসে থামল। দু'জনই বের হলো গাড়ি থেকে। আড়মোড়া ভাঙল সোহানা।

আরও পাঁচটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। হোটেলরুমগুলোর

কয়েকটা বারান্দায় এবং হোটেলের লবিতে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ট্যুরিস্টকে। ঢলাঢলি করছে কেউ-কেউ, কেউ ছবি তোলায় ব্যস্ত।

'জায়গাটা সুন্দর,' এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল সোহানা।

গাড়ির দরজা বন্ধ করল রানা। 'একবার ভেবে দেখো। রিযার্ভ আর্মি নিয়ে এই জায়গা দিয়ে যাচ্ছেন সম্রাট নেপোলিয়ন। হঠাৎ কারয়াটিড দুটোর সন্ধান পেয়ে যান, ও-রকম কিছু দেখতে পাওয়ার চিন্তাও করেননি হয়তো। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধুরন্ধর মস্তিষ্কে খেলা করে কিছু একটা। সম্ভবত তখনই সেনাপতি লোরনকে নিয়ে একটা পরিকল্পনা এঁটে ফেলেন।'

হাসল সোহানা। 'যদি অন্য কিছু বলি?'

'যেমন?'

'তখন হয়তো তুষারধস শুরু হয়েছিল কাছাকাছি কোথাও। ভয়ে কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল নেপোলিয়ন আর লোরনের, একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরে ভাবছিলেন কী করে বের হওয়া যায় এই মরণ-উপত্যকা থেকে। পালাতে গিয়েই হয়তো আবিষ্কার করে ফেলেন কারয়াটিড দুটো।'

সোহানার বলার ঢং দেখে হেসে ফেলল রানা। 'চলো মন্দিরটা খুঁজে বের করি। কাছেপিঠেই কোথাও হবে। হোটেলের পেছনে ছোট ছোট কয়েকটা পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, আমার ধারণা ওগুলোর কোনোটার...'

'এক্সকিউয মি, এক্সকিউয মি,' চিৎকার করে বলছে আর হোটেলের প্রবেশপথ থেকে হন্তদন্ত হয়ে রানাদের দিকে ছুটে আসছে বয়স্ক এক লোক। ইটালিয়ান টানের ইংরেজি উচ্চারণ ভাঙা ভাঙা।

নীল বিযনেস স্যুট পরিহিত লোকটার দিকে ঘুরল রানা। 'বলুন?'

'ক্ষমা করবেন, কিন্তু আপনাদেরকে এভাবে বিরক্ত না করেও উপায় ছিল না,' হাতে-ধরা কাগজের দিকে একনজর তাকাল লোকটা, তারপর রানাদের গাড়ির নম্বরপ্লেট দেখে নিল। 'আপনি মিস্টার মাসুদ রানা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'একটা মেসেজ আছে আপনার, আই মীন, আপনাদের জন্য।'

'মেসেজ? কীসের মেসেজ?'

'অপি চৌধুরী নামের জনৈক ভদ্রমহিলা কথা বলতে চান আপনাদের সঙ্গে। তিনি বলেছেন বিষয়টা খুবই জরুরি। হোটেল-লবিতে ফোন আছে, ইচ্ছা করলে ব্যবহার করতে পারেন।'

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা। তবে কেউ কিছু না বলে নাম-না-জানা লোকটার পিছু পিছু গিয়ে ঢুকল হোটেলের লবিতে।

একধারে ফোন বুথের মতো ব্যবস্থা আছে, নিজের ক্রেডিটকার্ড পাঞ্চ করে অগ্রীম বিল চুকিয়ে এগিয়ে গেল রানা সেদিকে।

যেন রিং হওয়ার অপেক্ষাতেই ছিল অপি, ওপ্রান্তে দু'-তিনবার বাজামাত্র রিসিভ করল। 'মাসুদ ভাই?'

'বলো।'

'ঝামেলা হয়েছে।'

'কী?'

'আমি যে-ঘরে কাজ করি, গতরাতে কেউ ঢুকেছিল সেখানে।'

'তোমার সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম?'

'সম্পূর্ণ ওকে।'

'সিসি টিভি?'

'কোনো সমস্যা নেই। একবারের জন্যও বন্ধ হয়নি।'

'তা হলে কেউ ঢুকেছিল বুঝলে কীভাবে?'

'ফোর্স শাটডাউন করা হয়েছে আমার কম্পিউটার। এই কাজ কখনও করি না আমি। স্পষ্ট খেয়াল আছে, গতরাতে কাজ শেষে ঠিকমতোই বন্ধ করেছিলাম ওটাকে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখানে আছি জানলে কীভাবে?'

'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন তা তো আগে থেকেই জানি। গতরাতের ব্যাপারটা টের পাওয়ার পর ভাবলাম আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি। এখন যেখানে আছেন আপনারা, ট্যুরিস্টরা গিয়ে সেখানেই থামে। বিশ্রাম নেয়, খাবার আর গাড়ির তেল কেনে। আপনারা এ-পর্যন্ত যতবার গাড়ি ভাড়া করেছেন, সোহানাদি এসএমএস করে প্রতিবার রেণ্ট-আ-রাইড কোম্পানির নাম আর গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নাম্বার জানিয়ে দিয়েছেন আমাকে, যাতে কোনো সমস্যা হলে আপনাদেরকে ট্রেস করতে পারি। কিন্তু আপনাদের মোবাইলে অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও যখন পেলাম না...'

'টানেলের ভেতরে ছিলাম, নেটওয়ার্ক ছিল না।'

'আমাকেও বার বার বলছিল নেটওয়ার্ক ফেইলিউর। শেষে অস্থির হয়ে ফোন করলাম হোটেলে। ম্যানেজমেন্টকে জানিয়ে রাখলাম অমুক নম্বরের একটা গাড়িতে করে অমুক অমুক লোক এলে আমার কথাটা যেন জানানো হয়।'

'গার্ড আরিফ কোথায়?'

'সকালে দেখেছি ডিউটি দিচ্ছে। বলল: কাউকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেনি।'

'লোকটা তোমার কম্পিউটার চালু করল কীভাবে? পাসওয়ার্ড-

প্রটেক্টেড ছিল না?'

'না। কখনও কল্পনাও করিনি এতসব বাধা ডিঙিয়ে এ-রকম কিছু হতে পারে...'

'কম্পিউটার খুলে কী দেখেছে সে?'

'আপনাদেরকে পাঠানো সমস্ত ডকুমেন্ট। কোনো কোনো ডকুমেন্টের প্রিন্টআউট নেয়া হয়েছে। প্রিন্টারে যে-পরিমাণ কাগজ ছিল, সকালে দেখি তার অর্ধেকও নেই। ঘাঁটা হয়েছে আমার নোটবুকগুলো, দেখলাম কোনো কোনো পৃষ্ঠা স্ক্যান করা হয়েছে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে স্ক্যান করা ডকুমেন্টগুলো ডিলিট করতে ভুলে গেছে লোকটা। ব্যবহার করা হয়েছে আমার ফ্যাক্স মেশিন। কিন্তু কোন্ নম্বরে ফ্যাক্স করা হয়েছে জানতে পারিনি। সে-সব রেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে মেশিন থেকে। ফ্যাক্স সাকসেসফুলি পাঠানো হলে একটা রিপোর্ট বে হয়, সেটাও খুঁজে পাইনি।'

'রবিন তো দেশে গেছে, জানি। বাচ্চাটাকেও নিয়ে গেছে?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই।'

'কাল সারাদিনে কে কে এসেছিল সেফহাউসে?'

'কেউ না।'

'মানতে পারলাম না কথাটা। কেউ-না-কেউ নিশ্চয়ই এসেছিল।'

'আরিফ এসেছিল...'

'আরিফ? গার্ড আরিফ?'

'জ্বী, মাসুদ ভাই। আপনাদের সঙ্গে কথা শেষ করে পিছন ফিরে দেখি, আঁধারে দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করায় বলল: কী একটা আওয়াজ শুনে এসেছিল এদিকে। আমি ঘুমাতে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে, আবার এসেছিল আর কাউকে নিয়ে। সর্বনাশ হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই!'

'ও কি এখনও ডিউটিতে?'

'না, মাসুদ ভাই। সকালে আমার সঙ্গে কথা বলার পরই পালিয়েছিল। আমাদের তিনজন এজেন্ট পাঠিয়ে ধরে এনে আটকে রেখেছি।'

'ও কী বলে?'

'কিছুই না। স্বীকার করেছে কাজটা ওর, এর বেশি আর কোনও কথা ওর মুখ থেকে বের করতে পারিনি। বলেঃ আপনাকে বলবে।'

'ঠিক আছে। আটক থাক। আমি ফিরে ওর ব্যবস্থা করব। তুমি শিয়োর, আরিফ ছাড়া আর কেউ আসেনি?'

'সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেম আর সিসি টিভি ক্যামেরা তো তা-ই বলছে।'

লম্বা করে দম নিল রানা। 'অপি, নিশ্চয়ই জানো সিকিউরিটি অ্যালার্ম সিস্টেমকে ফাঁকি দেয়া কঠিন কোনো কাজ নয়...ঘরের অন্য কোনো জিনিস তো হারায়নি, না?'

'না, মাসুদ ভাই।'

'আচ্ছা দেখো সময় করে। শোনো, অপি, একটা কথা বলি, কিছু মনে কোরো না। এমন কি হতে পারে, আমাদেরই আর কোনও এজেন্ট...'

'না, মাসুদ ভাই। বললাম তো, কোনও জোরাজুরি লাগেনি, আরিফ নিজেই স্বীকার করেছে।'

'ঠিক আছে, অপি। কাছাকাছি কোনও রানা এজেন্সি থেকে আরেকজন গার্ড আনিয়ে নাও। আর নিজে তুমি সাবধানে থেকো। দরকার পড়লে আবার যোগাযোগ করবো।' লাইন কেটে দিয়ে সোহানার দিকে তাকাল রানা।

'কী সমস্যা?' জানতে চাইল সোহানা।

লবির যে-প্রান্তে ফোনকলের সুবিধা আছে, তার উল্টোদিকেই

কয়েকটা সোফা বসানো আছে। ইশারায় সোফাগুলো দেখিয়ে রানা বলল, 'চলো, বসি।'

বসার পর কফির অর্ডার দিল রানা। কফি আসতে বেশি সময় লাগল না। কাপে চুমুক দিতে দিতে ঘটনা বলল রানা।

'কে হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'মেলিখান?'

'হতে পারে। গার্ডকে ম্যানেজ করে আমাদের সেফহাউসে মেলিখানই ঢুকেছে, জোর দিয়ে তা বলা যাচ্ছে না এখনই। তবে ডকুমেণ্টগুলো যে ওর কাছেই পাচার করা হয়েছে সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।'

'তারমানে আমাদের আগেই জায়গামতো হাজির হয়ে গেছে শয়তানটা? ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে?'

'হতে পারে।'

'কিন্তু রানা, একটা কথা বুঝতে পারছি না। তোমার সেফহাউসের সন্ধান জানল কী করে? জানল কীভাবে অপির কাছে পারস্য-অ্যান্টিক বিষয়ক ডকুমেণ্টগুলো আছে?'

কফির কাপে আবারও চুমুক দিল রানা। ভালো হয়েছে কফিটা। ঠাণ্ডায় আরাম পাওয়া যাচ্ছে। বলল, 'আমার মোবাইলে একবার ফোন দিয়েছিল সিদোরভ, মনে আছে?'

'আছে।'

'আমার নম্বর পেল কী করে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে বলেছিল, আগে নাকি টাকা দিলে বাঘের চোখও পাওয়া যেত। এখন যে-জমানা এসেছে, টাকা পেলে মা-ও ছেলেকে চিনতে চায় না।'

'তো?'

'টাকা খরচ করে যে-লোক হাজার মাইল দূরের মোটামুটি অচেনা কারও মোবাইল নম্বর পেয়ে যেতে পারে, আরেকটু বেশি টাকা খরচ করলে সে কি ওই নম্বর দিয়ে অন্য কোন্ নম্বরে কথা

বলা হচ্ছে তার লিস্ট পেতে পারে না?'

রানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সোহানা, চুমুক দিতে ভুলে গেছে কফির কাপে।

'এবার ছুটিতে আসার পর থেকে আমার নম্বর দিয়ে সবচেয়ে বেশি কথা বলা হয়েছে অপির সঙ্গে। তারপর সোহেল। কিন্তু সোহেলের নম্বর ট্রেস করা কঠিন। কিন্তু অপিরটা?'

'মাই গড!'

'আমার ধারণা সে-কাজটা করেছে সিদোরভ, ইউক্রেইনের মাফিয়া-সর্দার। নিরপেক্ষভাবে যদি বলি, ঠিক কাজটাই করেছে সে। ওর জায়গায় আমি থাকলেও তা-ই করতাম। মেলিখানকে আমাদের পেছনে লাগানোর একটাই কারণ ছিল ওর—পারস্য অ্যান্টিকের খোঁজ পাওয়া। প্রথমে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে সরিয়ে দিতে চেয়েছে আমাদেরকে। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পেরেছে আমাদেরকে হাত করতে পারলে ওর লাভ হবে, একসঙ্গে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে। জোঁকের মতো লেগে থাকার চেষ্টা করেছে মেলিখান বার বার, বার বারই ব্যর্থ হয়েছে। শেষপর্যন্ত সিদোরভ বুঝতে পেরেছে এভাবে হবে না, তাই সরে গিয়েছে। বিকল্প পথে চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হয়তো সফলও হয়েছে।'

'তা হলে, এখন?'

'এখন আমরা আমাদের মতো কাজ করবো। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে আরেকটু বেশি। সিদোরভ হয়তো ধরে নিয়েছে সেফহাউসের ঘটনা জানি না আমরা। ওরা যদি ফাঁদ পেতেও থাকে, অন্তত অন্ধের মতো সে-ফাঁদে ধরা পড়তে যাচ্ছি না আমরা।'

হোটেল থেকে বাইরে বের হয়ে এল ওরা। গাড়ির ভিতর থেকে

প্রয়োজনীয় মালসামান বের করে নিল। একটা চক্কর দিয়ে চলে এল হোটেলের পেছনে, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

পথের পুরোটা বরফে-ঢাকা না। বরং এখানে-সেখানে গজিয়ে আছে কচি সবুজ ঘাস। দু'-এক জায়গায় উঁকি দিচ্ছে বেগুনি আর হলুদ রঙের বুনো ফুল। পাহাড়ের চূড়ায় হাজির হওয়ার পর পকেট থেকে জিপিএস ইউনিটটা বের করে রিডিং দেখল রানা।

রানার ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে যুম করে হোটেলের পার্কিং লটটা দেখছে সোহানা। বলল, 'ঠিক কোথায় ওঁৎ পেতে থাকতে পারে ওরা?'

'জানি না। যে-কোনো জায়গায় অ্যামবুশ হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। কী খুঁজতে হবে, কোথায় খুঁজতে হবে জেনে গেছে ওরা। কাজেই আমাদের মতো দু'জন "অ্যান্টিক শিকারী" এখন ওদের কাছে মূল্যহীন। আমাদের পেছনে সময় নষ্ট করে লাভ কী?' জিপিএস স্ক্রিনের রিডিং পড়ল রানা ভালোমতো। দক্ষিণ দিকে এক শ' ফুটের মতো হাঁটল হিসেব করে, তারপর পুবদিকে ত্রিশ ফুট। হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার মনে হয় ঠিক ওটার ওপর দাঁড়িয়ে আছি।'

এদিক-ওদিক তাকাল সোহানা। 'কই, কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না?'

পা ঠুকল রানা। 'আমি শিওর।' বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

এগিয়ে এসে সোহানাও বসে পড়ল একইভাবে।

পাহাড়ি শক্ত মাটিতে আঠারো ইঞ্চির মতো লম্বা সরু একটা রেখা দেখা যাচ্ছে, খালিচোখে মনে হয় বাটালি দিয়ে খোদাই করা। আস্তে আস্তে এ-রকম আরও কিছু দাগ চোখে পড়ল ওদের। কোনো কোনোটা একটা আরেকটাকে ছেদ করে গেছে। কোনো কোনোটা আবার বিভিন্নমুখী হয়ে চলে গেছে বিভিন্ন

দিকে।

'ফাউণ্ডেশন স্টোন,' বলল সোহানা। 'আই মীন এককালে ছিল আর কী। তুলে বা সরিয়ে নেয়ার পর চিড় ধরেছে মাটিতে।'

আপাতদৃষ্টিতে যে-জায়গাটাকে মন্দিরের কেন্দ্র বলে মনে হচ্ছে, আস্তে আস্তে হেঁটে সেখানে এসে দাঁড়াল ওরা। তারপর ঘুরল পুবদিকে। জিপিএস ইউনিটটা আবারও চেক করল রানা। লেকের একদিকে বিশেষ একটা ল্যাণ্ডমার্ক চিহ্নিত করল। তারপর সোহানাকে নিয়ে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে।

যে-পথ দিয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল ওরা, ঢাল বেয়ে নামার পর সে-পথটা পার হতে হলো। রানা খেয়াল করল, যে-ল্যাণ্ডমার্কটা চিহ্নিত করেছে, লেকের তীর ঘেঁষে এগিয়ে-যাওয়া আরেকটা পথ গেছে সেদিকে। ওই পথ ধরে এগোতে লাগল দু'জনে।

বিশাল একটা প্রায় গোল বোল্ডার পড়ে আছে, তাই সামনের ছোট্ট রেস্তোরাঁটা দেখা যায়নি আগে। মালিক শখ করে কৃত্রিম একটা ঝরনা বানিয়েছে রেস্তোরাঁর সামনে, ঠাণ্ডায় বেশিরভাগ পানি জমে বরফ হয়ে গেছে। হাতে স্থানীয় বিয়ারের গ্লাস নিয়ে দু'-চারজন ট্যুরিস্ট বসে আছে রেস্তোরাঁর বাইরে, কাঠের ওয়াকওয়েতে। সোহানাকে দেখে ওর রূপের প্রশংসায় গ্লাস উঁচু করল একজন। জবাবে মুচকি হেসে নড করল সোহানা।

ওয়াকওয়ে ছাড়িয়ে আসার পর দেখা গেল পাথরের একটা তাক তৈরি হয়েছে একদিকের পাহাড়ি-দেয়ালে। তারপর খাড়া ঢাল। ওটা বেয়ে সাবধানে নামতে লাগল দু'জনে। অস্পষ্ট একটা ট্রেইল এগিয়ে গেছে সামনের দিকে। ওটা ধরে কিছুদূর যাওয়ার পর মোটামুটি সমতল একটা জায়গায় হাজির হলো দু'জনে। এখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে কিছু বোল্ডার, ন্যাড়া জমিনের জায়গায় জায়গায় খাবলা খাবলা ঘাস। ট্রেইলটা সামনে প্রায়

পঞ্চাশ ডিগ্রি বাঁক নিয়েছে। ওখানে বিশাল ছায়া ফেলেছে সেই উন্নত শিরের পর্বত। ওই জায়গার তাপমাত্রা এখানকার চেয়ে পাঁচ ডিগ্রি কম হবে, অনুমান করল রানা।

'তেমন কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না?' সোহানার গলায় হতাশা। 'আসার পথে কিছু মিস করলাম নাকি?'

'দু'শ' বছর আগে বৌলের মতো দেখতে যা ছিল এখানে, হতে পারে ভূমিক্ষয় সেটার নামনিশানা মুছে দিয়েছে। নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, একটা বৌলের পিরিচে পরিণত হতে দু'শ' বছর যথেষ্ট সময়?'

'তোমার সবকিছুতেই দুষ্টুমি। সরাসরি বললেই তো হয় ভুল বুঝেছি আমরা। কে জানে, বৌল বলতে হয়তো লেকটাকেই বুঝিয়েছেন নেপোলিয়ন।' এক ঝলক দমকা বাতাস বয়ে গেল, উড়িয়ে এনে কয়েক গাছি চুল ফেলল সোহানার গালে। চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে কানের পেছনে নিয়ে গুঁজল ও।

ডান দিক থেকে শিস বাজানোর মতো একটা আওয়াজ শুনতে পেল রানা—মৃদু, কিন্তু কানে আসে। ঝট্ করে ঘাড় ঘোরাল ও। ব্যাপারটা কী বোঝার চেষ্টা করছে।

'কোনো সমস্যা?' জানতে চাইল সোহানা।

জবাবে ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে কথা বলতে নিষেধ করল রানা।

আবারও হলো শিস বাজানোর মতো শব্দটা। এবার আগের চেয়েও আস্তে, কান পেতে রেখেছিল বলে শুনতে পেল দু'জনই। বেশি দূর থেকেও আসছে না, কয়েক ফুট হবে। সেদিকে এগিয়ে গেল রানা।

গ্র্যানিটের একটা স্ল্যাব দেখা যাচ্ছে সামনে। দশ ফুটের মতো উঁচু, ফুট চারেক চওড়া। রানার মাথা ছাড়িয়ে দশ-বারো ইঞ্চি উপরে চতুর্ভুজের কর্ণের মতো দেখতে একটা ফাটল দেখা

যাচ্ছে। সহজে চোখে পড়ে না, কারণ হলদে-সবুজ লাইকেন দিয়ে ঢেকে আছে।

পায়ের আঙুলগুলোর উপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, ডান হাতের একটা আঙুল ঢুকিয়ে দিল ফাটলের ভিতরে। 'ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে ভিতর থেকে,' বলল ভ্রূ কুঁচকে। 'তারমানে ভিতরটা ফাঁপা।' কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'স্ল্যাবের উপরে যে-পাথরটা আছে, আমার অনুমান সেটার ওজন পাঁচ শ' পাউণ্ডের বেশি হবে না। কোনো লিভার ঠিকমতো ব্যবহার করতে পারলে ওটা সরাতে বেশি বেগ পেতে হবে না আশা করি।' নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে দুটো আইস-অ্যাক্স বের করল, ঢুকিয়ে নিল বেল্টের ভিতরে। 'কেউ দেখছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল সোহানাকে।

লেকের অন্যপাশ, হোটেলের কার পার্কিং আর রাস্তার উপর চোখ বুলিয়ে নিল সোহানা। 'মেলিখান আর ওর চামচারা যদি এসেও থাকে, আমাদের চোখে যাতে সহজে ধরা না পড়ে সে-ব্যাপারে সতর্ক আছে।'

'হুঁ। কঠিন একটা কাজ করার প্রস্তুতি নাও।'

'কী?'

'আমার মই হতে হবে তোমাকে।'

হেসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সোহানা।

স্ল্যাবের সঙ্গে বুক-পেট ঠেসে ধরল রানা, বুড়ো আঙুল বাদে বাঁ হাতের বাকি আঙুলগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে ফাটলের ভিতরে। ডান হাত দিয়ে খামচে ধরেছে স্ল্যাবের একপ্রান্ত। এক পা এক পা করে সোহানার কাঁধে দুটো পা-ই তুলে দিল। শরীরের উপরের অংশের বেশিরভাগ ভর রাখার চেষ্টা করছে দু'হাতের উপর যাতে সোহানা ব্যথা না পায়। তারপর আস্তে আস্তে উঠে বসল স্ল্যাবের উপর। ঘুরল, এখন ওর পিঠটা ঢালের দিকে।

বেল্ট থেকে খুলে নিল কুড়াল দুটো, স্ল্যাবের উপরের পাথর এবং স্ল্যাবের মাঝখানের সরু ফাটলে এমনভাবে ঢুকিয়ে দিল ফলাগুলো যাতে হাতলগুলো বাইরের দিকে থাকে। মোচড় দিয়ে যতখানি সম্ভব ভিতরে ঢুকাল ফলাগুলোকে। তারপর হাতল দুটো ধরল দু'হাতে। উপরের দিকে টানছে হাতল দুটোকে, একইসঙ্গে একটু একটু উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। দাঁতে দাঁত চাপল ও—প্রচণ্ড টান পড়ছে কুড়াল দুটোতে, স্থানচ্যুত হতে শুরু করেছে পাথরটা।

ওটাকে সময় দিল না রানা, টের পাচ্ছে প্রচণ্ড টান পড়ছে কাঁধ, হাত আর দুই পায়ের পেশিতে। পুরোপুরি উঠে দাঁড়াল ও, ততক্ষণে স্ল্যাবের উপর টলমল করছে পাথরটা। কুড়াল দুটো আলগা হয়ে চলে এসেছে ওটার নীচ থেকে।

আবার বসে পড়ল রানা। ডান কাঁধ ঠেকিয়েছে পাহাড়ি দেয়ালে, একটা খাঁজে সুবিধামতো আটকে নিয়েছে ডান পা। ওর পিঠের অনেকখানি এখন সাপোর্ট পাচ্ছে দেয়ালটার কারণে। কুড়াল দুটো নামিয়ে রাখল একপাশে, তারপর বাঁ পা আর দুই হাত দিয়ে সর্বশক্তিতে ঠেলা মারল পাথরটার গায়ে। সোহানা ততক্ষণে সরে গেছে নিরাপদ দূরত্বে।

ভোঁতা একটা আওয়াজ তুলে, কিছু মাটি আর কিছু বরফের গুঁড়ো খসিয়ে ধসে পড়ল পাথরটা। ঢালের উপর একবার ড্রপ খেল ফুটবলের মতো, তারপর গড়িয়ে নেমে গেল অনেকখানি নীচে।

'ভিতরে কী?' স্ল্যাবের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সোহানা।

পাথর সরে যাওয়ায় গর্ত তৈরি হয়েছে, সোহানার প্রশ্নটার জবাব দেয়ার আগে ওটার ভিতরে সাবধানে মাথা ঢুকিয়ে কিছুক্ষণ দেখল রানা। তারপর বলল, 'অন্ধকার একটা টানেল। বেশি হলে তিন ফুটের মতো চওড়া। কতখানি ভিতরে গেছে...'

কথা শেষ না করে থেমে গেল।

'কী হয়েছে?' সোহানার কণ্ঠে উদ্বেগ।

আবারও কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রানা বলল, 'পানির বোতলটা দাও তো।'

রানার হাতে বোতলটা দিল সোহানা।

স্ল্যাবের উপরে পাথরটা যেখানে ছিল সেখানে কিছুটা পানি ঢালল রানা, তারপর হাত দিয়ে ঘষল ভালোমতো। বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত মাটি পরিষ্কার হলো অনেকখানি।

উড়ন্ত মৌমাছির প্রতীকটা দেখা যাচ্ছে স্ল্যাবের গায়ে।

সাতাশ

সুড়ঙ্গে ঢুকতে হতে পারে, আগেই অনুমান করেছিল রানা, তাই সঙ্গে হেডল্যাম্প আর ক্লাইম্বিং হারনেস নিয়ে এসেছে। ব্যাগ থেকে বের করে ওগুলো পরে নিল দু'জনে। তারপর আবার স্ল্যাবের উপর চড়ে বসল রানা, টেনে তুলল সোহানাকে। নিজের হেডল্যাম্প জ্বালিয়ে আলো ফেলল টানেলের ভিতরে।

'সোজা এগিয়ে গেছে দশ-বারো ফুটের মতো,' কিছুক্ষণ দেখে বলল। 'তারপর আস্তে আস্তে চওড়া হয়েছে।' শরীর মুচড়ে, যথেষ্ট কসরত করে নামল টানেলটাতে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে নামতে সাহায্য করল সোহানাকে।

স্ল্যাবের ভিতরে, তিন-চার ফুট যাওয়ার পর হঠাৎ নিচু হয়ে গেছে টানেলটা, মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো যায় না। কিছুদূর

এগিয়ে বসে পড়তে হলো রানা-সোহানাকে, হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছে এখন। চওড়া অংশটাতে প্রবেশ করল দু'জনে।

টানেলটা ডানে-বাঁয়ে স্ফীত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ছাদ আগের মতোই নিচু এখনও—বেশি হলে চার ফুট। মাথা বাঁকিয়ে উপরে তাকাল রানা। ক্যালসিয়াম কার্বনেটের ছোট ছোট টুকরো জমে আছে ছাদের গায়ে। দেখতে পপকর্নের মতো লাগছে।

কিছুটা সামনে, মেঝেতে, ফানেলের মতো দেখতে একটা গর্ত। ওটার বেশ খানিকটা অংশ ঢেকে আছে একটা স্ট্যালাকটাইটের কারণে। আলো ফেলে দেখল ওরা এদিকে-সেদিকে, কিন্তু অন্য কোনো প্রবেশমুখ দেখা যাচ্ছে না। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল দু'জনে।

গর্তটার কাছে গিয়ে উঁকি দিল রানা। 'প্রায় ছ'ফুট নীচে একটা প্ল্যাটফর্ম দেখতে পাচ্ছি।'

একপাশে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল ও। দু'পা ভাঁজ করে নিয়ে এল পেটের কাছে। তারপর প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল স্ট্যালাকটাইটের গায়ে। চার-পাঁচবার লাথি মারার পর টুকরো হয়ে গেল ওটা, ছাদ থেকে খসে পড়ে গেল। প্ল্যাটফর্মের উপর আছড়ে পড়ে গড়িয়ে নেমে গেল নীচের দিকে।

'আমি আগে যাই,' রানাকে হ্যাঁ-না কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আগে বাড়ল সোহানা, দু'পা ঝুলিয়ে দিয়েছে গর্তের ভিতরে।

হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসেছে রানা, ঝুঁকে ধরে রেখেছে সোহানার দু'হাত। আস্তে আস্তে ছাড়ছে ওকে। একসময় প্ল্যাটফর্ম স্পর্শ করল সোহানার পা।

'ঠিক আছে, ছাড়তে পারো আমাকে,' বলল সোহানা, 'প্ল্যাটফর্মটা যথেষ্ট মজবুত।'

ওর হাত ছেড়ে দিল রানা। কিছুক্ষণ পর সোহানার মতো

করে ঝুলিয়ে দিল দু'পা, নামল ওর পাশে। তাকাল প্ল্যাটফর্মের দিকে।

কিছুটা কাত হয়ে আছে ওটা। দশ ফুট বাই ছ'ফুটের মতো হবে। প্ল্যাটফর্মটা বরাবর ত্রিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে শুরু হয়েছে ঢালু একটা পথ, অনেকদূর গেছে। হেডল্যাম্পের আলোয় বোঝা যাচ্ছে সামনে ডান দিকে বাঁক নিয়েছে।

লাথি মেরে যে-স্ট্যালাকটাইটটা স্থানচ্যুত করেছে রানা, ওটা পড়ে আছে পায়ের কাছে, একটু দূরে। মাঝারি আকারের একটা পাথরের সঙ্গে আটকে আছে। কী মনে হতে এগিয়ে গিয়ে স্ট্যালাকটাইটটা তুলে নিল রানা। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। তারপর পকেট থেকে বের করল দুটো রক-স্ক্রু। দণ্ডটার দু'প্রান্তে লাগিয়ে দিল স্ক্রু দুটো। ওটাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল গর্তটার নীচে। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দণ্ডটাকে আটকে দিল গর্তের মুখে। ঠিকমতো হলো না, তারপরও সন্তুষ্ট হলো রানা। স্ক্রু দুটো নীচের দিকে থাকায়, কেউ যদি উপর থেকে দেখে তা হলে মনে করবে স্ট্যালাকটাইটটা আটকে আছে গর্তের মুখে। সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে, তখন প্ল্যাটফর্মে আছড়ে পড়বে ওটা; আশা করা যায় পতনের আওয়াজ রানা-সোহানার কান এড়াবে না।

প্ল্যাটফর্ম থেকে লাফিয়ে নামল রানা পথটার উপর। আলগা নুড়িপাথরে পিছলে গেল পা, আছাড় খেল। উঠে দাঁড়িয়ে উল্টো ঘুরল, প্ল্যাটফর্মটার দিকে এগিয়ে গেল কয়েক পা। সোহানা লাফ দেবে এবার। ওকে ধরতে হবে।

লাফিয়ে রানার পাশে চলে এল সোহানা। ও যাতে আছাড় না খায় সেজন্য ওকে ধরে ফেলল রানা। হাঁটতে শুরু করল দু'জনে।

'মনে হয় একটা গুহার দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা,'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল সোহানা। 'ছাদ উঁচু হচ্ছে আস্তে আস্তে।'

মুখ তুলে তাকাল রানা। ছাদ এখন ওর মাথার কমপক্ষে দু'ফুট উপরে। বাঘের নখের মতো দেখতে ইঞ্চি তিনেক লম্বা অনেকগুলো স্ট্যালাকটাইট দণ্ডে ছেয়ে গেছে পুরো ছাদ, যতদূর চোখ যায়।

টানা পনেরো মিনিট এগোনোর পর গোলাবাড়ির মতো বড় একটা গুহায় হাজির হলো দু'জনে। এখানেও ছাদ থেকে ঝুলছে অসংখ্য স্ট্যালাকটাইট। দু'দিকের দেয়ালে ছাতলার মতো জমে আছে কী যেন। মোচাকৃতির অনেকগুলো স্ট্যালাগমাইট গজিয়ে আছে মেঝে থেকে, গ্রন্থিযুক্ত শ্বাসমূলের মতো দেখাচ্ছে।

পথটা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে পাহাড়ি দেয়ালের কারণে। তবে ডান দিকে বাঁক নিয়ে আরও দূরে গেছে। বাঁকটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। তিনটা টানেল দেখা যাচ্ছে। প্রতিটা টানেলই আসলে পাহাড়ি দেয়ালের গায়ে উল্লম্ব ফাটল। বাঁ দিকেও একটা টানেল আছে, কিন্তু ওখানে ঢোকা কঠিন। এখানে হাতির দাঁতের মতো স্ট্যালাকটাইট দণ্ড ছাদ থেকে নেমে এসে মেঝে ছুঁই ছুঁই করছে।

'আমরা বোধহয় মাটির এক শ' ফুট নীচে নেমে এসেছি,' বলল সোহানা, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'এখান দিয়ে কারয়াটিড দুটো নিয়ে ভিতরে যাওয়ার পথ কোথায়?'

'এখান দিয়ে নেয়নি, অন্য কোনো পথ ব্যবহার করেছে নিশ্চয়ই। আমরা গিরিপথ দিয়ে ঢুকিনি। কারয়াটিড যারা বহন করছিল, তারা হয়তো ওখান দিয়ে এসেছিল। আর নেপোলিয়ন সম্ভবত গিয়েছিলেন এদিক দিয়ে।' থামল রানা। চুপ করে থেকে কী যেন শুনল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

কান পাতল সোহানা। বাঁ দিকের টানেলের অনেক নীচ

থেকে, মনে হচ্ছে হাতির দাঁতের "পর্দার" আড়াল থেকে পানি পড়ার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

'ঝরনা?' সোহানার গলায় অনিশ্চয়তা।

জবাব দিল না রানা, বাঁ দিকের টানেলের দিকে এগোতে শুরু করেছে। ঢুকে পড়ল ওটা দিয়ে। পেছনে সোহানা।

খুবই ধীর গতিতে, যথেষ্ট কসরত করে এগোতে হচ্ছে ওদেরকে। কখনও শুয়ে পড়ে বুকে ভর দিয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, কখনও আবার ওরাংওটাং-এর কায়দায় এড়িয়ে চলতে হচ্ছে "হাতির দাঁতগুলোকে"। কপাল ভালো, স্ট্যালাক-টাইটগুলোর শেষপ্রান্ত ভোঁতা। চোখা হলে খবর ছিল। বেশ কয়েকবার খোঁচা খেতে হয়েছে রানা-সোহানাকে।

ত্রিশ-চল্লিশ গজ যাওয়ার পর অনেকটা কমে এল স্ট্যালাকটাইটের পরিমাণ। আরও পনেরো-বিশ ফুট পর হামাগুড়ি দিয়ে চলার মতো ফাঁক পাওয়া গেল। দূরে দেখা যাচ্ছে চার ফুট চওড়া প্রাকৃতিক একটা পাথুরে ব্রিজ। ফাটল ধরেছে ওখানকার জমাট তুষারে। ব্রিজটার কাছাকাছি কোনো জায়গা দিয়ে সজোরে নামছে পানি অতল গহ্বরে, প্রবাহমান জলধারা দেখা যাচ্ছে না ঠিকমতো। জলীয় বাষ্পের অদৃশ্য একটা চাদরে রঙধনুর কয়েকটা রঙ দেখা যাচ্ছে ওদের হেডল্যাম্পের আলোয়। ব্রিজটার ওপ্রান্তে আবছামতো দেখা যায় আরেকটা টানেল।

'স্রোতটা কি লেক থেকে আসছে?' জানতে চাইল সোহানা।

'হতে পারে। আবার তুষারগলা পানিরও হতে পারে। দু'-তিন মাস পরে এলে ওই স্রোত হয়তো না ও দেখতে পারো।'

যে-পথে এসেছে সে-পথ ধরে ফিরে এল ওরা। "হাতির দাঁতের পর্দার" ভেতর থেকে বের হয়ে তিন টানেলের মুখোমুখি দাঁড়াল।

ধাতব একটা আওয়াজ পাওয়া গেল এমন সময়। হাতুড়ি বা

ওই জাতীয় কিছু একটা দিয়ে আঘাত করছে কেউ, অনেক উপর থেকে আসছে শব্দটা।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

আবারও পাওয়া গেল আওয়াজটা। তারপর আবার। শেষে ভারী কোনো কিছু খসে পড়ল, মৃদু একটা কম্পন টের পাওয়া গেল।

'তোমার সেই স্ট্যালাকটাইট!' ফিসফিস করে বলল সোহানা।

'মনে হয়। চলো দেখি।'

প্ল্যাটফর্মটার দিকে এগোতে লাগল দু'জনে, ধীর পায়ে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই টের পাওয়া গেল কে বা কারা যেন নামছে গর্ত দিয়ে।

থমকে গেল রানা। দাঁড়িয়ে পড়েছে সোহানাও। খামচে ধরেছে রানার একটা হাত।

'নীচে নামাও আমাকে!' যেন আদেশ নয়, হুঙ্কার ছাড়ছে বুনো জানোয়ার। 'সাবধান! আছড়ে পড়ে হাড় ভাঙতে চাই না আমি।'

একটা হার্টবিট মিস করল সোহানা। কণ্ঠটা কার, চিনতে ভুল হয়নি। কখনও হবেও না।

আইভান সিদোরভ।

'আমাদের হাতে সময় আছে কতক্ষণ?' জিজ্ঞেস করল সোহানা।

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বিশ-পঁচিশ মিনিট। সঙ্গে আরও লোক নিয়ে এসেছে সিদোরভ।'

'এবার কারয়াটিড দুটো দখল করবে যেমন করেই হোক। নাগালে পেলে খুন করবে আমাদের।'

'চলো,' ঘুরে হাঁটতে শুরু করল রানা।

আবারও তিন টানেলের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। একটা একটা করে প্রত্যেকটা টানেল দেখল। প্রথম আর দ্বিতীয় টানেলে ঘুটঘুটে অন্ধকার। তৃতীয় টানেলটা ছ'-সাত ফুট এগোনোর পর বাঁয়ে মোড় নিয়েছে।

রানার দিকে তাকাল সোহানা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে। রানাও বুঝতে পারছে না কোন্ টানেলে ঢুকবে। শেষে বিসমিল্লা বলে পা রাখল তৃতীয় টানেলে।

বাঁয়ের মোড়টা ধরে এগোনোর সময় হোঁচট খেল সোহানা, পড়ে গেল। উঠে বসল। দুই হাঁটু ডলছে। কিছুটা পিছিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল রানা, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল সোহানাকে।

'ধন্যবাদ, ঠিক আছি আমি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল সোহানা। 'ওটা কী?'

মেঝেতে পড়ে-থাকা কিছু একটা চকচক করছে হেডল্যাম্পের আলোয়। এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা তুলে নিল রানা। সোজা, সরু একটা তরবারি। মাত্র দু'ফুট লম্বা। অনেক মলিন হয়ে গেছে। তারপরও বোঝা যায় ফলাটা খাঁটি ইস্পাতের।

'এটার নাম অ্যাক্সিফোস,' বলল রানা। 'এককালে গ্রীকরা ব্যবহার করত এ-রকম তলোয়ার।'

'তারমানে সত্যিই ওরা এসেছিল এই জায়গায়।'

মাথা ঝাঁকাল রানা, হাঁটতে শুরু করল আবার। ওর পিছু নিল সোহানা।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট এগোল ওরা, বার বার বাঁক নিতে হলো এদিক-ওদিক। এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সামনে আবার "তিন গুহার সমাহার"।

'এবার?' জানতে চাইল সোহানা।

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবল রানা। 'আমার মনে হয় বাঁয়ের গুহাটা হচ্ছে মাঝখানের টানেল, ওটা ধরে এগোলে

আবার আগের জায়গায় হাজির হবো আমরা।'

'আগের জায়গা মানে?'

'সেই প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি কোথাও।'

'দরকার নেই। সিদোরভ বা মেলিখানের সামনে পড়তে চাই না।'

'তা হলে ওটা বাদ দিয়ে চলো অন্য একটাতে ঢুকে পড়ি।'

সবচেয়ে ডানের টানেলে ঢুকে পড়ল ওরা। কিছুদূর যাওয়ার পরই ঢালু হতে শুরু করল মেঝে। প্রথমে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, তারপর হঠাৎ করেই অনেক ঢালু হয়ে গেল। এখন গুহার একদিকের দেয়াল ধরে তাল সামলাতে হচ্ছে রানা-সোহানাকে।

এক মিনিট দু'মিনিট করে সময় চলে যাচ্ছে। একটা বাঁক ঘুরে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল রানা, আরেকটু হলে ধাক্কা খেত সামনের পাহাড়ি দেয়ালে।

'পথ বন্ধ?' সোহানার প্রশ্নটা শোনাল ফোঁপানির মতো।

'না মনে হয়,' নীচের দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

দেয়ালটা মেঝের যে-জায়গায় মিশেছে সেখানে সমান্তরাল ফাটল দেখা যাচ্ছে। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা, হেডল্যাম্পের আলো ফেলল ফাটলটার উপর।

আসলে ফাটল বললে ভুল হবে। দেয়ালের ওই জায়গাটা উধাও হয়ে গেছে। প্রাকৃতিকভাবে ধসে পড়েছে অথবা শাবল-গাঁইতি মেরে ভেঙে ফেলা হয়েছে। ফাঁকা জায়গাটুকু উচ্চতায় আঠারো ইঞ্চির মতো। ওখান দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে।

নিচু হতে যাচ্ছিল সোহানা, এমন সময় মেলিখানের চিৎকার শুনে থমকে গেল।

'কিছু পাওয়া গেল?' একাধিক গুহায় প্রতিধ্বনিত হলো কণ্ঠটা।

'না, কিচ্ছু না!' চিৎকার করে জবাব দিল অন্য কেউ।

'আমিও কিছু পাইনি,' চেঁচিয়ে জবাব দিল তৃতীয় আরেকজন। 'তবে জুতোর ছাপ দেখতে পেয়েছি, টাটকা। আমার মনে হয় দু'জন।'

নীরবতা। মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

'কমপক্ষে চারজন এসেছে ওরা,' কিছুক্ষণ পর সোহানার কানের কাছে ফিসফিস করল রানা। 'সিদোরভ, মেলিখান আর দুই চামচা।'

'যাচ্ছি আমি,' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সোহানা।

ওর একটা হাত ধরল রানা। 'কোথায়?'

'এই ফাটলের ওপাশে।'

'বিপদ হতে পারে।'

'হবে না। আমার শরীর তোমার মতো চওড়া না। কাজেই আটকা পড়বো না। আর যদি পড়িও, টেনে বের কোরো আমাকে। ভেবো না। যদি বের হওয়ার পথ না থাকে, কয়েক ফুট গিয়েই চলে আসবো।'

ভ্রূ কোঁচকাল রানা, কিন্তু কিছু বলল না।

কাঁধ থেকে নিজের ব্যাকপ্যাক খসাল সোহানা। হার্নেস খুলে ফেলল। নিজের ব্যাকপ্যাকের ভিতর থেকে একগাছি দড়ি বের করে একপ্রান্ত সোহানার পায়ের সঙ্গে বেঁধে দিল রানা।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সোহানা। বুকে-পেটে ভর দিয়ে ঢুকে পড়ল ফাটলটার ভিতরে। ওর পা দুটো অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর নিচু হলো রানা, ফাটলের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কী দেখলে?'

'জানি না! তবে কিছু একটা আছে।'

আলগা পাথর হাতড়াচ্ছে সোহানা, এপাশ থেকে শুনতে পাচ্ছে রানা। ত্রিশ সেকেণ্ড পর থেমে গেল শব্দটা। 'এপাশে একটা গুহা আছে!' নিচু গলায় জানান দিল সোহানা।

ব্যাকপ্যাক খসাল রানা, বেল্ট আর হার্নেস খুলল। সোহানারগুলোর উপর রাখল স্তূপ করে। ব্যাকপ্যাকের ভিতরে চালান করে দিল খাটো তরবারিটা। তারপর দড়ির আরেকপ্রান্ত দিয়ে বেঁধে ফেলল মালসামান। দড়ি ধরে টান দিল দু'বার। ওপাশ থেকে টেনে মালসামান ভিতরে নিয়ে নিল সোহানা।

উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। আঠারো ইঞ্চির গ্যাপ ওর চওড়া পেশীবহুল শরীরের জন্য একটু কমই। তারপরও বান মাছের মতো শরীর মুচড়ে, সোহানার যে-সময় লেগেছে তারচেয়ে তিনগুণ বেশি সময় নিয়ে ওপাশে আসতে পারল। তা-ও পুরোটা না, কোমর পর্যন্ত। গাল আর দু'কনুইয়ের চামড়া ছড়ে গেল ওর।

পেছনে পদশব্দ। এক সেকেণ্ডের জন্য থমকে গেল রানা এবং ভুল করল। আরও দু'জোড়া বুটের আওয়াজ পাওয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল কেউ, 'পেয়েছি! পেয়েছি! দেখে ফেলেছি, বস্!'

প্রাণপণে আগে বাড়তে লাগল রানা।

ততক্ষণে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইটের উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেছে ফাটলের ওপাশের গুহা। চিৎকার করে উঠল মেলিখান, 'এই! থামো বলছি!'

কিন্তু কে শোনে কার কথা। টিকটিকির মতো এগিয়ে যাচ্ছে রানা। মাথা উঁচু করার সুযোগ নেই। আপাতদৃষ্টিতে যেটাকে ফাটল বলে মনে হয়েছিল সেটা আসলে পাহাড়ি দেয়ালে কৃত্রিমভাবে বানানো একটা সুড়ঙ্গ—রানা এখন যেখানে আছে, সেখান থেকে আরও ফুট দশেক দূরে শেষ হয়েছে। এই দশটা ফুট দশ মাইলের মতো মনে হচ্ছে ওর কাছে।

সুড়ঙ্গের ওপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে সোহানার একটা হাত, রানাকে সাহায্য করার জন্য বাড়িয়ে দিয়েছে। হাতটা ধরল

না রানা, বরং আরও কিছুটা এগিয়ে গেল সুড়ঙ্গের শেষমাথার দিকে। এবার আর ফিসফিস করার দরকার নেই, তাই জোরেই বলল, 'সরে যাও! নইলে আমি ঢুকতে পারবো না!'

'গুলি করো হারামজাদাকে!' চিৎকার করে বলল মেলিখান।

সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটা রিভলভার। তপ্ত সীসা ছ্যাঁকা দিয়ে গেল রানার বাঁ কনুইয়ের বাইরের দিকে। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও, কিন্তু এগোনো থামাল না। মাঝারি আকৃতির গ্লোবের সমান কয়েকটা পাথর পড়ে আছে ডানহাতের কাছে, একটা তুলে নিল, ঘাড় না ঘুরিয়ে শরীর না বাঁকিয়ে ওটা ছুঁড়ে মারল পেছনে, সুড়ঙ্গমুখের দিকে। ভাগ্য ভালো—আবারও গুলি করা হলো, এবার পাথরের সঙ্গে বুলেটের সংঘর্ষের বিশ্রী আওয়াজ পাওয়া গেল। অন্ধের মতো আরও কয়েকটা পাথর তুলে নিয়ে একইভাবে ছুঁড়ে মারল রানা পেছনের দিকে।

সুড়ঙ্গমুখের শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেছে রানা। দু'পা ভাঁজ করে ফেলল ও। এখানকার ফাটল আঠারো ইঞ্চি না, আরও বেশি চওড়া, তাই পিঠের উপর ভর দিয়েই ডিগবাজি খেল রানা। রিভলভার গর্জে উঠল পর পর দু'বার, একটু আগে রানা যে-জায়গায় ছিল সেখানকার পাথর ছিটকে উঠল। এক সেকেণ্ডও দেরি না করে আরেকবার ডিগবাজি খেল রানা, চলে এল সুড়ঙ্গের এপাশে, নিরাপদ জায়গায়।

গড়ান দিয়ে উঠে বসল ও। ওর দিকে ছুটে এল সোহানা, আহত জায়গাটা দেখছে। বলল, 'আর কয়েক ইঞ্চি ডানে লাগলে...'

'লাগেনি যখন...'

রানাকে কথা বাড়াতে দিল না সোহানা। নিজের ব্যাকপ্যাক থেকে ফার্স্ট এইড বক্স বের করল। একটা ইলাস্টিক ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মুড়ে দিল রানার ক্ষতস্থান। উঠে দাঁড়াল রানা, আহত

জায়গাটা দেখল, তারপর নিভিয়ে দিল হেডল্যাম্প। ওর দেখাদেখি সোহানাও।

সুড়ঙ্গের ওপ্রান্ত থেকে তখন মোচড়ামোচড়ি করার আওয়াজ ভেসে আসছে। কেউ একজন ঢুকছে আঠারো ইঞ্চির ফাটলটা দিয়ে।

'পথটা বন্ধ করে দেয়া উচিত আমাদের,' বলল সোহানা। 'তা না হলে ওরা আমাদের পিছু পিছু আসবে। আবারও গুলি করবে।'

এদিক-ওদিক তাকাল রানা। স্ট্যালাকটাইটের অনেক দণ্ড দেখা যাচ্ছে ঝুলছে গুহার ছাদ থেকে, কিন্তু কোনোটাই হাত দিয়ে টেনে ভাঙার মতো সরু না। ডানদিকের দেয়ালের কাছে কিছু একটা রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দ্রুত পায়ে সেদিকে এগিয়ে গেল ও, তুলে নিল জিনিসটা। একটা বর্শা, কয়েক শ' বছর আগের। আশ্চর্য, কাঠের শক্ত হাতলটা আগের মতোই আছে, একটুও পচেনি, হতে পারে ঠাণ্ডার কারণে। ফলাটা পরখ করে দেখল রানা। ওটা উজ্জ্বলতা হারিয়েছে, কিন্তু ধার হারায়নি।

বর্শাটা নিয়ে দ্রুত ফিরে এল রানা ফাটলের কাছে। এমন এক জায়গায় পজিশন নিল যাতে যে-লোকটা এগিয়ে আসছে সে গুলি করলেও গায়ে না লাগে।

'এখনও সময় আছে!' চিৎকার করে বলল রানা ইংরেজিতে। 'ফিরে যাও।'

'খবরদার!' সুড়ঙ্গের ওপ্রান্ত থেকে শোনা গেল মেলিখানের হুঙ্কার, 'ফিরে এলে গুলি করবো! ওদের কাছে আর্মস নেই। কাজেই শেষ করে দাও দুটোকেই।'

"নেতার" কথায় বোধহয় সাহস পেল হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে-আসা লোকটা, কারণ ওর মোচড়ামোচড়ির আওয়াজ

আরও বেড়েছে।

'ফিরে যাও বলছি!' হুঙ্কার দিল রানা।

জবাবে ফাটলের ওপাশে উঁকি দিল ধূর্ত একটা চেহারা। পরমুহূর্তে লোকটার হাতে দেখা গেল একটা ম্যাগনাম রিভলভার, রানাকে দেখতে পায়নি বলে সময় নিয়ে তাক করছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-থাকা সোহানার ছায়ামূর্তির দিকে।

দেরি করার মানে হয় না। বর্শাটা চালাল রানা। গুহার আলোআঁধারিতে ঠিক বোঝা গেল না লোকটার পিস্তল-ধরা কব্জিটা হাত থেকে আলাদা হয়ে গেছে কি না। তবে প্রচণ্ড ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে, বদ্ধ জায়গায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আওয়াজ। একটুও দেরি না করে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে বর্শাটা ধরল রানা, নিচু হয়ে ফাটলের মুখে ঢুকিয়ে দিল সর্বশক্তিতে। বন্ধ হয়ে গেল লোকটার চেঁচামেচি, একটা ভোঁতা আওয়াজ শোনা গেছে, সম্ভবত ওর গলা ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেছে ফলা। টান দিয়ে বর্শাটা বের করে আনল রানা।

ছুটে এল সোহানা। দেরি না করে মাটি থেকে তুলে নিল ম্যাগনামটা। 'এটা রাখছি আমি। তোমার কাছে বর্শাটা থাক। বাঁচতে হলে লড়তে হবে আমাদেরকে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'লোকটার লাশ সরিয়ে ভেতরে ঢোকার ঝামেলা করতে যাবে না ওরা। অন্য পথ খোঁজার চেষ্টা করবে। চলো বেরিয়ে যাই এখান থেকে।'

এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে দু'জনে। এখন যে-গুহায় আছে ওরা সেটা দেখতে অনেকটা কিডনির মতো। আগের গুহার চেয়ে কিছুটা ছোট। মেঝে থেকে বারো ফুট উপরে ছাদ। ডান দিকের দেয়ালে বড়সড় একটা ফাটল। মেঝেতে বেশ কিছু স্ট্যালাগমাইট দণ্ড।

ওগুলোর আড়ালে কিছুক্ষণ খুঁজল রানা-সোহানা, কিন্তু খাটো

তরবারি বা বর্শার মতো আর কোনো অস্ত্র পেল না।

খুঁজতে খুঁজতে রানার কাছ থেকে কিছুটা দূরে চলে গিয়েছিল সোহানা, শান্ত গলায় ওকে ডাকল রানা, 'দেখে যাও।'

রানা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, দ্রুত পায়ে সেখানে এসে দাঁড়াল সোহানা। হেডল্যাম্প জ্বালিয়েছে রানা।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে গুহার মেঝেতে একজোড়া স্ট্যালাগমাইট দণ্ড পড়ে আছে পাশাপাশি। কিন্তু আর দশটা স্ট্যালাগমাইটের মতো না ওগুলো, বরং ফাঁপা মনে হচ্ছে। এগুলো মানবনির্মিত, কারণ প্রতিটার প্রান্তভাগে পাপড়ির নকশা খোদাই-করা। জিনিস দুটো আকৃতিতে সিলিণ্ডারের মতো।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-সোহানা।

একছুটে দেয়ালের ফাটলটার দিকে গেল দু'জনে, যেন বুঝতে পারছে ওখান দিয়ে বের হলে প্রত্যাশিত কিছু দেখতে পাবে।

ফাটলের ওপাশে একটা টানেল, বিশ ফুটের মতো দীর্ঘ। এরপর নুড়িপাথরে ভরা সংক্ষিপ্ত একটা ঢাল, শেষ হয়েছে মাত্র দু'ফুট চওড়া একটা পাথুরে ব্রিজে। ব্রিজটার দু'পাশে মুখ হাঁ করে আছে গভীর খাদ। অন্ধকারে ঢাকা আরেকটা টানেল দেখা যাচ্ছে ব্রিজের ওপারে।

ব্রিজটাতে গিয়ে দাঁড়াল রানা, পালাক্রমে দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে দেখে নিল ব্রিজটা টেকসই কি না। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে সোহানাকে বলল, 'কাজ হবে। কিন্তু এবার আমি আগে যাবো।'

কিছু বলল না সোহানা।

ব্রিজ ধরে হেঁটে এপাশে চলে এল রানা। একটু পর সোহানা এসে দাঁড়াল ওর পাশে। অন্ধকার টানেলটাতে ঢুকে পড়ল দু'জনে। এখানে স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাগমাইটের পরিমাণ অনেক

বেশি, বার বার দিক বদল করতে হচ্ছে ওদেরকে। শেষপর্যন্ত খোলা একটা জায়গায় হাজির হলো ওরা।

এবং থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো দু'জনকেই। রানার ডান হাত খামচে ধরল সোহানা। সামনের দিকে তাকিয়ে আছে পলকহীন চোখে। কেউ কিছু বলছে না।

টানেলের মেঝেতে পাশাপাশি শুয়ে আছে কারয়াটিড দুটো। একজোড়া অপূর্ব সুন্দর গ্রিক নারীর সোনালি মুখ ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে নির্নিমেষ।

কিছুক্ষণ পর এগিয়ে গিয়ে ও দুটোর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল রানা-সোহানা।

যত্ন নিয়ে গড়া হয়েছে হাত-পা-মাথাবিহীন মানবী-মূর্তি দুটো, মুড়ে রাখা হয়েছে চমৎকার একজোড়া আলখাল্লা দিয়ে। সুতোর সূক্ষ্ম কারুকাজ আর চমৎকার সেলাই দেখলে বোঝা যায় আলখাল্লা দুটো অনেক দামি, অন্তত এককালে ছিল। মূর্তি দুটোর কপালের চারপাশে একটা করে ধাতব-বলয়, তাতে ধাতু দিয়েই বানানো হয়েছে কতগুলো জলপাইপাতা আর কুঁড়ি। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে এ-ধরনের বলয় জয়মাল্য অথবা সম্মানের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

'সিলিণ্ডারগুলোর ভেতর থেকে কারয়াটিড দুটো বের করল কে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল সোহানা। 'লোরন? কিন্তু এত ভারী দুটো কারয়াটিড...একা...'

ডান তর্জনী তুলে একদিকে দেখিয়ে দিল রানা। 'ওই যে, তোমার প্রশ্নের জবাব।'

তাকাল সোহানা।

একদিকের দেয়ালে ভর দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ছ'টা পাঁচ ফুটি বর্ম। বেত আর চামড়া দিয়ে বানানো হয়েছে ওগুলো, বেহালা বা টেনিস-র‍্যাকেটের তারের মতো দেখতে কিছু একটা

কাজে লাগিয়ে একটার সঙ্গে আরেকটাকে জোড়া দেয়া হয়েছে। ছ'টা বর্মকে একসঙ্গে দেখতে ছোট নৌকার মতো লাগছে।

'কিন্তু...' যেন মানতে পারছে না সোহানা, 'ওগুলোকে এখানে নিয়ে আসতে গেলেন কেন লোরন? কী দরকার ছিল? আর নিয়ে এসে এভাবে ফেলে রাখার মানে কী?'

'জানি না। হতে পারে নেপোলিয়ন আদেশ দিয়েছিলেন কারয়াটিড দুটো বের করে নিয়ে যেতে। হতে পারে লোরন ভেবেছিলেন তিনি একাই করতে পারবেন কাজটা। কিন্তু কারয়াটিড দুটো এটুকু আনার পরই বুঝতে পারেন সম্ভব না, তাই ফেলে রেখে যান, হয়তো ভেবেছিলেন পরে লোকজন নিয়ে এসে বাকি কাজ সারবেন। কিন্তু তা আর করা হয়নি।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একদিকের দেয়ালের কাছে এগিয়ে গেল সোহানা। 'দিনের আলো দেখতে পাচ্ছি।'

ওদিকে গেল রানা।

বড় কোনো বোল্ডারের উপর ধসে পড়েছে পাহাড়ি দেয়ালের একটা অংশ। ছোট-বড় টুকরো এমনভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে যে, প্রথম দেখায় মনে হয় চলাচলের পথ বন্ধ। কিন্তু ফাটল দিয়ে সূর্যালোক দেখা যাচ্ছে।

'হয়তো,' রানার দিকে তাকিয়ে বলল সোহানা, 'ওখান দিয়েই কোনো একসময় ভেতরে এসেছিলেন নেপোলিয়ন আর লোরন। কিন্তু আফসোস, আমরা ব্যবহার করতে পারছি না পথটা।'

'অন্য কোনো দিক দিয়ে চেষ্টা করে দেখতে হবে। চলো।'

আরেকটা ফাটল খুঁজে পেল ওরা। কিছুক্ষণ আগে যে-সুড়ঙ্গ দিয়ে এসেছিল, এটা তার চেয়ে বড়। ও-মাথায় পাওয়া গেল একটা চোরাকুঠুরি, সঙ্গে একটা পার্শ্বটানেল। এটা যেদিক দিয়ে

এগিয়েছে, দেখলে মনে হয় মূল গুহার সঙ্গে মিশেছে।

টানা বিশ মিনিট হাঁটল ওরা। কতগুলো পথ একসঙ্গে এসে মিশেছে অনতিদূরে। বাঁয়ে, কিছুটা সামনে শোনা যাচ্ছে পানি পড়ার শব্দ।

'ঝরনাটা?' সোহানার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা।

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, 'মনে হয়।'

টানেল বেয়ে নেমে এল দু'জনে, একটা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল। এখন ওদের ঠিক মুখোমুখি সেই "হাতির দাঁতের পর্দা"। বাঁয়ে প্রথম প্ল্যাটফর্মটা।

'কাউকে দেখতে পাচ্ছি না,' ফিসফিস করে বলল রানা।

'আমিও না। শয়তানগুলো গেল কোথায়?'

'চলো প্ল্যাটফর্মের দিকে যাই।'

হাঁটতে শুরু করল দু'জনে।

রিভলভারটা গর্জে ওঠার এক সেকেণ্ড আগে চোখের কোন দিয়ে নড়াচড়াটা দেখতে পেল রানা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরল ও এবং সেই কারণে বেঁচে গেল। বুলেটটা ওর কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে গিয়ে টুকরো করে দিল একটা স্ট্যালাকটাইট। ঝট্ করে বসে পড়ল রানা।

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে গেছে সোহানা, যেদিকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখা গেছে সেদিকে রিভলভার তাক করেই টান দিল ট্রিগারে। টলে উঠল ওঁৎ পেতে-থাকা লোকটা, অসহ্য ব্যথায় গাল্ দিল। তাল সামলাতে গিয়ে ওর পা পড়ল আলগা নুড়িপাথরে, পিছলে গেল। কিন্তু পতন সামলানোর ভাল ট্রেনিং আছে তার, উঠে বসতে শুরু করেছে ইতিমধ্যে।

'দৌড়াও!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল রানা। 'ওই দিকে!'

হাতির দাঁতের পর্দাটার দিকে দৌড় দিল ওরা। আগে সোহানা, রানা পেছন পেছন। স্ট্যালাকটাইটগুলোর ভেতর দিয়ে

পথ করে নিয়ে দৌড়াচ্ছে দু'জনে। ঝরনার কাছের ব্রিজটায় হাজির হতে বেশি সময় লাগল না।

থামল না ওরা, পড়ন্ত পানি এড়িয়ে ঢুকে গেল ভিতরে। একটা টানেলের মধ্য দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে এখন। হঠাৎ পিছলে গেল রানার পা, একহাতে পাহাড়ি দেয়াল ধরে কোনোমতে সামলে নিল। পা কেন পিছলাল দেখার জন্য নীচে তাকিয়েছে।

থেমে দাঁড়িয়েছে সোহানাও, হাঁ করে দম নিচ্ছে ঘন ঘন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে ছিল রানার দিকে, তাই দেখতে পেল ব্রিজের দিকে ছুটে-আসা লোকটাকে।

'রানা,' ডাকল ও, 'আমরা কোথায় এসেছি জেনে গেছে ওরা,' ছুটন্ত লোকটাকে দেখাল ইঙ্গিতে।

ইতিমধ্যে রানা বুঝে গেছে কেন পিছলে গিয়েছিল ওর পা, হাত থেকে তরবারি আর বর্শা ফেলে দিয়ে মোনাজাত করার ভঙ্গিতে অনেকগুলো নুড়িপাথর তুলে নিল ও। পানির কাছে গিয়ে সেগুলো ছুঁড়ে মারল ব্রিজের উপর। সঙ্গে সঙ্গে নিচু হয়ে মুঠো ভর্তি করে নুড়িপাথর তুলে নিল আবারও, ছুঁড়ে মারল একই জায়গায়।

ছুটন্ত লোকটা দেখতে পেয়েছে রানাকে, কিন্তু ও কী করছে বুঝতে পারেনি। দৌড়াতে দৌড়াতেই হাতের আগ্নেয়াস্ত্র তুলেছে সে, সময় নিয়ে নিশানা করছে যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। মুহূর্তের মধ্যে পিছন ঘুরে দৌড় দিল রানা, চাচ্ছে ব্রিজের লোকটা যাতে তাড়াহুড়ো করে। তা-ই ঘটল। রানাকে ঘুরতে দেখেই ট্রিগার চাপল লোকটা, তাড়াহুড়োয় মিস্ করল। গতি কিছুটা কমে এসেছিল তার, এবার যত জোরে সম্ভব দৌড় দিল।

ঠিক তখনই ঘটল দুর্ঘটনাটা। ভেজা নুড়িপাথরগুলো পড়ল লোকটার পায়ের নীচে, তাল হারিয়ে ফেলল সে। যখন বুঝতে

পারল পড়ে যাচ্ছে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হাত থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটা খসে পড়ল আপনাআপনি। পতন সামলানোর জন্য কিছু একটা খামচে ধরার প্রবল ইচ্ছায় থাবা মারছে সে বার বার, কিন্তু হাতে বাতাস ছাড়া আর কিছু আটকাচ্ছে না। ভয়াবহ আতঙ্কে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল। পিছলে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল ব্রিজের উপর, কপালটা জোরে বাড়ি খেয়েছে এককোনায়, ডান হাত আর ডান পা চলে গেছে ব্রিজের বাইরে। জ্ঞান হারানোর আগে বাঁ হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতে চাইল ব্রিজটাকেই, কিন্তু এবারও বাধ সাধল কিছু নুড়িপাথর। শেষে একদিকে কাত হয়ে ব্রিজ থেকে খসে পড়ল অজ্ঞান দেহটা, মুখ হাঁ করে-থাকা অন্ধকার গহ্বরে হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

লোকটার চিৎকার শুনেই রানা বুঝে নিয়েছিল কী ঘটেছে, পড়ন্ত পানির কাছে ফিরে এসেছে ও। বর্শা আর তরবারিটা তুলে নিয়েছে। ওর গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল সোহানা, বলল, 'দু'জন শেষ...

'এক চুল নড়েছ তো খুলি উড়িয়ে দেবো,' ব্রিজের ওমাথা থেকে শোনা গেল কণ্ঠটা।

নড়ল না রানা, শুধু চোখ ঘোরাল। মেলিখান। এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে ব্রিজের দিকে, হাতে-ধরা নাইন মিলিমিটারটা রানা-সোহানার দিকে তাক-করা।

'আমার রিভলভারে আর মাত্র একটা বুলেট আছে,' রানার কানে ফিসফিস করল সোহানা।

'কাজেই প্রথম সুযোগেই এই ব্যাটাকে শেষ করতে হবে,' বলল রানা। 'এবং মিস্ করা যাবে না।'

মুখ দিয়ে চু চু জাতীয় আওয়াজ করল মেলিখান, ব্রিজের উপর উঠে পড়েছে। 'কপোতকপোতীর প্রেম দেখছি শেষ হয়নি এখনও। অমর প্রেম আর কাকে বলে! শোনো, চালাকির চেষ্টা

কোরো না, রানা। এবার ফেরেশতা এলেও বাঁচাতে পারবে না তোমাদেরকে। সরো তোমার বান্ধবীর কাছ থেকে। সাবধান, উনিশ-বিশ দেখলেই গুলি করবো।'

রানা জানে সোহানার ডান হাতে আছে ম্যাগনামটা। কাজেই সোহানাকে সুযোগ দিতে চাইলে ওর বাঁ দিকে সরে যেতে হবে ওকে। তা-ই করল ও। এক কদম সরল, কিন্তু এমনভাবে ধরে রেখেছে বর্শাটা যাতে সোহানার ডানহাত দেখতে না পায় মেলিখান। তারপর, "এটা দিয়ে আর কী হবে" জাতীয় ভঙ্গিতে দেখল তরবারিটাকে, অস্ত্রটা ছুঁড়ে মারল মাটিতে। বর্শাটাও ছুঁড়ে ফেলার জন্য উঁচু করল ডান হাত।

স্বাভাবিকভাবে মেলিখানের দু'চোখ তখন সেঁটে আছে বর্শার ফলায়। সুযোগটা নষ্ট করতে চাইল না সোহানা। শরীরের সঙ্গে মিশিয়ে ডান হাত তুলল ও কোমরের কাছে, টান দিল ট্রিগারে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা ফুটো তৈরি হলো মেলিখানের বুকের বাঁ দিকে, রক্তে ভিজতে শুরু করেছে ওর সোয়েটার। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

একটা মুহূর্তও নষ্ট করতে চাইল না রানা। খানিকটা এগিয়ে ছোট্ট একটা লাফ দিল, ল্যাণ্ড করল বাঁ পায়ের উপর, শূন্যে থাকা অবস্থাতেই কাঁধ বরাবর যতটা পিছনে পারে নিয়ে গেছে ডান হাত। বাঁ পা মাটি স্পর্শ করামাত্র সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারল বর্শাটা মেলিখানের দিকে। মেলিখান তখন দাঁতে দাঁত চেপে নাইন মিলিমিটারটা তুলছে কাঁপা কাঁপা হাতে, মরার আগে রানা-সোহানার কোনো একজনকে সঙ্গে নিতে চায়। কিন্তু ওর সেই সাধ পূরণ হলো না। ছ'ফুট লম্বা বর্শাটার ফুটখানেক লম্বা ফলাটা ওর গলার অনেকখানি কেটে দিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

মেলিখানের গলার কাটা জায়গা দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের

হচ্ছে। নাইন মিলিমিটারটা সম্ভবত অনেক ভারী মনে হচ্ছে ওর কাছে। হাত থেকে আপনাআপনি খসে পড়ল ওটা। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত রানার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল মেলিখান, দৃষ্টিই বলে দিচ্ছে মারা যাচ্ছে লোকটা। প্রাণহীন দেহটা কাটাগাছের মতো আছড়ে পড়ল কিছুক্ষণ পর।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল রানা। আগ্নেয়াস্ত্রটা তুলে নিল মেলিখানের নিথর দেহের পাশ থেকে। সোহানা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে কাছাকাছি, হাতে তরবারিটা। বুলেট শেষ, তাই ম্যাগনাম ফেলে দিয়েছে।

ওর হাতে নাইন মিলিমিটারটা ধরিয়ে দিয়ে তরবারিটা নিল রানা। ইঙ্গিতে হাঁটতে বলল ওকে। মূল গুহাটায় ফিরে যেতে হবে।

প্রথম প্ল্যাটফর্মের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। চলতে চলতে বার বার থেমে দাঁড়িয়েছে, এদিক-ওদিক তাকিয়ে খোঁজার চেষ্টা করেছে সিদোরভকে। কিন্তু দেখতে পায়নি। কান পেতে শুনেছে একাধিকবার, শুনছে এখনও, কিন্তু ঝরনার আওয়াজ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

প্ল্যাটফর্মে পা রেখেছে, এমন সময় কেউ একজন নড়ে উঠল অন্ধকারে। পাঁই করে সেদিকে ঘুরল রানা। বদ্ধ জায়গায় গুলির শব্দটা শোনাল বিস্ফোরণের মতো। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা ব্যথা টের পেল রানা বাঁ কাঁধের নীচে, গুহাটা আরও অন্ধকার হয়ে এল ওর চোখের সামনে।

'রানা!' চিৎকার করে উঠল সোহানা। ছায়ামূর্তিটা দেখে ছুট লাগিয়েছিল, কিন্তু রানা গুলি খেয়েছে দেখে কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

'পালাও সোহানা!' দাঁতে দাঁত চেপে কোনোরকমে বলল

রানা, ওর হাঁটু ভাঁজ হয়ে আসছে আপনা থেকে। একটু পর হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

'মিস্টার রানার শরীরটা বোধহয় ভালো নেই?' ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে সিদোরভ। রিভলভারটা এমনভাবে ধরে রেখেছে যেন ওটা আগ্নেয়াস্ত্র নয়, তেলাপোকা। 'অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলাম তোমাদের জন্য। আমার আবার অপেক্ষা-টপেক্ষা করার অভ্যাস চলে গেছে। তাই তোমাদের উপর আমার মেজাজ খারাপ হয়েছে মেজাজ খারাপ হওয়ার আরও কারণ আছে। আমার বন্ধুত্বের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছ তোমরা। সিদোরভ যাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়, তারা সে-হাত না ধরলে পস্তায়। যেমন এখন পস্তাচ্ছ তুমি, মিস্টার রানা। নাকি পস্তানোর আগেই পটল তুললে? কথা বলছ না কেন?' সোহানার দিকে তাকাল। 'এই যে, বান্ধবী বেগম,' শ্বাসকষ্টের রোগী যেভাবে ইনহেলার ঝাঁকায় সেভাবে হাতের অস্ত্রটা ঝাঁকাল, 'আপনারও কি একটা-দুটো বুলেট চেখে দেখার ইচ্ছা আছে? না থাকলে এদিকে আসুন।'

নড়ছে না সোহানা।

'এদিকে আয় বলছি!' ধমক দিল সিদোরভ।

'না,' মাথা নাড়ছে সোহানা, পায়ে পায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে যাতে কিছু একটা করার সুযোগ পায় রানা। 'তোমার কাছে যাই বা না যাই, আমাদেরকে খুন করবেই তুমি।'

'ভুল বললে,' আরেকটু কাছে এল সিদোরভ। 'তোমাদেরকে না। মিস্টার রানার উপর আমার খুব রাগ। তাই ওকে শেষ করবো, কথা দিলাম। আর ইতিমধ্যে যদি শেষ হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। আমি আবার সুন্দরীদেরকে কিছু বলি না সাধারণত। বিয়ে-শাদী করিনি তো...বুঝতেই পারছ। তুমি শুধু

একটা উপকার করো আমার। কারয়াটিড দুটো কোথায় আছে বলে দাও,' আরও কয়েক কদম আগে বাড়ল। 'বিশ্বাস করো, এখান থেকে নিরাপদে বের হতে পারবে তুমি। যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবে। চাইলে তোমাকে সঙ্গ দিতে রাজি আছি।' শয়তানি হাসি হাসল। 'বয়স হলেও বুড়ো হইনি এখনও।'

চিৎ হয়ে শুয়ে আছে রানা, একটুও নড়ছে না। টের পাচ্ছে বাঁ কাঁধের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পড়ছে। গরম হয়ে গেছে দুই কান, মনে হচ্ছে কেউ গরম লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে সেখানে। বাঁ হাত মুঠো করতে চাইল, অসহ্য ব্যথায় গলা বেয়ে উঠে-আসা একটা গোঙানি চাপতে দাঁতে দাঁত পিষতে হলো ওকে। ডান হাতটা মুঠো করতে গিয়ে টের পেল তরবারির বাঁটটা নাগালের মধ্যেই।

'তুমি একটা মিথ্যুক,' আরও একটু পেছাল সোহানা। 'এবং খুনি। জাহান্নামে যাও। জানি আমাদেরকে ছাড়াই খুঁজে বের করতে পারবে কারয়াটিড দুটো। তাই করো।' ঘুরল আস্তে আস্তে, হাঁটতে শুরু করেছে। চলে যাচ্ছে।

এমন একটা সময় ছিল যখন নিজের সব কাজ নিজেই করত সিদোরভ, পরে টাকা দিয়ে কাজ করাতে করাতে অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। সে-ও জানে ইচ্ছা করলে কারয়াটিড দুটো খুঁজে বের করতে পারবে, কিন্তু ইচ্ছাটাই নেই ওর। জানে রানাকে সঙ্গে রাখা আর র‍্যাটল সাপ সঙ্গে রাখা সমান, তাই ওকে গুলি করেছে। কিন্তু সোহানাকে হারাতে চায় না, অন্তত কাজ হাসিল হওয়ার আগ পর্যন্ত না। তাই সোহানা চলে যাচ্ছে দেখে দ্রুত পায়ে আরও আগে বাড়ল, আগের চেয়েও জোরে চেঁচাল, 'ফিরে এসো বলছি! নইলে...' রিভলভার-ধরা হাত উঁচু করতে শুরু করেছে।

লম্বা করে দম নিল রানা, দাঁতে দাঁত চাপল আবারও। ওর নাগালের মধ্যে চলে এসেছে সিদোরভ বেখেয়ালে। অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে উঠে বসল রানা, এতটাই দ্রুত যে, চমকে উঠল সিদোরভ। একটা মুহূর্তের জন্য থমকে গেল সে, বুঝতে পারছে না কী করবে। রানাকে গুলি করতে গিয়ে যদি সোহানা পালিয়ে যায় তা হলে এই গোলকধাঁধার গুহায় কোথায় খুঁজে বের করবে মেয়েটাকে?

ওই একটা মুহূর্তই যথেষ্ট ছিল রানার জন্য। ডানহাতে ধরা তরবারি দিয়ে সর্বশক্তিতে কোপ মারল সিদোরভের রিভলভার-ধরা হাতে। প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে অব্যবহৃত পড়ে থাকার পরও, শুধু রানার গায়ের জোরে আবার যেন প্রাণ ফিরে পেল অস্ত্রটা—সিদোরভের বাহু থেকে রিভলবারসহ কব্জিটা আলগা হয়ে খসে পড়ল।

চারদিক কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল সিদোরভ, ভালো হাত দিয়ে আহত হাতটা খামচে ধরেছে, এবার ওর হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে আপনা থেকে।

ক্রমাগত রক্তক্ষরণে দুর্বল থেকে আরও দুর্বল হচ্ছে রানা, মাথার ভিতরে একটা দপদপানি জোরালো হচ্ছে আস্তে আস্তে। টের পাচ্ছে জ্ঞান হারাতে যাচ্ছে ও। তারপরও মনের জোরে এগিয়ে গেল সিদোরভের দিকে। কাটা কব্জিটা এখনও লেপ্টে আছে রিভলভারের সঙ্গে, লাথি মেরে কব্জিসহ অস্ত্রটা সরিয়ে দিল দূরে। এক কদম সরে এসে পরের লাথিটা মারল সিদোরভের বাঁ কানের এক ইঞ্চি উপরে, একটু বাঁ দিকে। প্রচণ্ড মার—কব্জির ব্যথা ভুলে গিয়ে টলে উঠল সিদোরভ, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সোহানা ছুটে এল রানার দিকে। হেডল্যাম্পের আলোয় রানার ক্ষতস্থানটা দেখা যাচ্ছে। আঘাত গুরুতর। টলে উঠল

রানা, চোখের সামনে সাদা একটা পর্দা দেখতে পাচ্ছে।

ওকে জড়িয়ে ধরল সোহানা। 'আর একটা মুহূর্তও না,' চিৎকার করে বলল, 'তোমাকে এখান থেকে বের করতে হবে এখনই, যেমন করে হোক। হাসপাতালে নিতে হবে।'

'মিস্টার সিদোরভ,' জ্ঞান হারানোর আগে বলল রানা, 'তোমার শরীরটাও বোধহয় ভালো না?'

আটাশ

ক্যালিফোর্নিয়া। সোলানা বীচ।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টের মাস্টার বেড-সংলগ্ন বারান্দায় ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে রানা। ফার্ন গাছগুলোতে ফুল ধরেছে, বাতাসে সুঘ্রাণ। ডেল মার পয়েন্টে কেমন বেগুনি রঙ ধারণ করেছে সাগরের জলরাশি, সম্ভবত গোধূলির কারণে। লাল একটা থালার আকার নিয়েছে সূর্যটা, আস্তে আস্তে সলিলসমাধি হচ্ছে ওটার। নাম-না-জানা কিছু পাখি উড়ে যাচ্ছে, ঘনায়মান সন্ধ্যায় আকাশের পটভূমিতে ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে ওগুলোর। ইতিমধ্যে বাহারি আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে হোটেল-মোটেলের সারি। একটুকরো সৈকত জনবিরল হয়ে আসছে। পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কাজ শুরু করে দিয়েছে সেখানে, সরিয়ে নিচ্ছে সারাদিনের আবর্জনা। কারা যেন ছোট্ট একটা ডিঙি ফেলে গেছে, ওটার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প করছে দু'জন লাইফগার্ড। সৈকতের দিকে ধেয়ে-আসা কালো জলরাশির মাথায় ফেনা দেখা যায়।

কান পাতলে ঢেউয়ের আওয়াজ শোনা যায় শুধু। অবশ্য তাতে মাঝেমধ্যে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে নিঃসঙ্গ কোনো সীগালের চিৎকার। চমৎকার আরেকটা হৈমন্তী রাতের আগমুহূর্তে বিষণ্ন হয়ে গেছে প্রকৃতি।

দু'আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত একটা সিগারেট নিয়ে নিজের এই নিঃসঙ্গতা উপভোগ করছে রানা। সিগারেটে টান দেয়ার চেয়ে তামাক-পোড়া ধোঁয়া দেখায় ওর আগ্রহ বেশি আপাতত। ইজি-চেয়ারের পাশে মেঝেতে একটা গ্লাসে রয়েছে দু'পেগ নির্জলা স্কচ, তাতে বড়জোর দু'বার ঠোঁট ছুঁইয়েছে ও। বেডরুমে সারাউণ্ড সাউণ্ড সিস্টেমে খুব মৃদু ভলিউমে বাজছে রকওয়েলের "নাইফ" গানটা: ইউ টাচ্‌ড মাই লাইফ/উইথ ইয়োর সফটনেস ইন দ্য নাইট/মাই উইশ ওয়ায ইয়োর কম্যাণ্ড/আনটিল ইউ র‍্যান আউট অভ লাভ...

নিকট অতীতে ফিরে গেল রানা।

"কারয়াটিড গুহা" থেকে অমানুষিক পরিশ্রম করে ওকে বের করে এনেছিল সোহানা, কীভাবে, জানে না রানা। জ্ঞান ফিরলে ও টের পায়, ওকে স্ট্রেচার-বেডে শুইয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অপারেশন থিয়েটারের দিকে। শুনতে পায় ফোঁপাতে ফোঁপাতে কারও সঙ্গে বাংলায় কথা বলছে সোহানা, সম্ভবত সোহেল।

প্রায়ই ভুলে যাই আমাকে কতটা ভালোবাসো তুমি, মনে মনে সোহানাকে বলে রানা তখন, তোমার ভালোবাসা অনুভব করতে বার বার এমনি আঘাত পেতে চাই আমি।

দ্বিতীয়বারের মতো জ্ঞান হারায় ও।

তিন দিন পর চেতনা ফিরে পায়। নিজেকে মনে হচ্ছিল বালুভর্তি কোনো বস্তা, কিছুক্ষণ আগে কোনো হেভিওয়েট বক্সার ঘণ্টাখানেক মনের সুখে প্র্যাকটিস করে গেছে যেন। ঘাড় ঘোরাতে পারছে না, জিভ অসাড় হয়ে আছে। তবে চোখ নড়ানো

যায়।

সোহানা বসে আছে মুখোমুখি, ঘরের একমাত্র সোফায়। চোখের নীচের কালি দেখলে বোঝা যায় ঠিকমতো ঘুমায়নি এই ক'দিন। ওর কাছ থেকে জানা গেল কিছু কথা।

কাঁধের দু'ইঞ্চি নীচ দিয়ে মাংস চিরে বেরিয়ে গেছে সিদোরভের বুলেট। খোঁচা মেরেছে হাড়ে, পিঠের অনেকটা ছালও নিয়ে গেছে। আসলে প্রচুর রক্তক্ষরণে এত দুর্বল হয়ে পড়েছে রানা। সময়মতো হাসপাতালে আনতে না পারলে কী হতো বলা যায় না। কয়েক ব্যাগ রক্ত দিতে হয়েছে, সেলাই পড়েছে কাঁধে-পিঠে।

গ্রীক সরকারের কাছে কারয়াটিড দুটো হস্তান্তর করার প্রক্রিয়া চলছে। সোহেল এসেছিল, সোহানার কাছ থেকে সব জানার পর যোগাযোগ করে অ্যাপোলো-মন্দিরের কিউরেটরের সঙ্গে। একই সঙ্গে খবর পাঠানো হয় গ্রীসের বাংলাদেশ দূতাবাসে।

এসব বিষয়ে সাদাচামড়ার মানুষরা ত্বরিতকর্মা। একটুও দেরি করেনি গ্রীস সরকার। অ্যাপোলো-মন্দিরের কিউরেটরকে প্রধান করে একটা অভিযাত্রী দল পাঠানো হয় গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথে। "কারয়াটিড গুহায়" ঢোকার আগে সোহানার সঙ্গে দেখা করে গেছে ওরা, গুহার ভেতরের খবর বিস্তারিত জেনে গেছে। সোহানাকে সঙ্গে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে ও—এই অবস্থায় রানাকে কাছছাড়া করতে চায়নি একমুহূর্তের জন্যও।

কারয়াটিড দুটো খুঁজে পেয়েছে ওই অভিযাত্রী দল। ভিতরে আরেকটা টানেলও আবিষ্কার করেছে, এটাতে ঢোকেনি রানা-সোহানা। এই টানেলে পাওয়া গেছে অনেকগুলো কঙ্কাল। সঙ্গে পারস্যের কিছু যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে গ্রীস সরকার। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় কারয়াটিড দুটো পাওয়া যাওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য ওগুলো শীঘ্রিই প্রদর্শিত হবে গ্রীসের জাতীয় যাদুঘরে। নড়েচড়ে বসেছেন ইতিহাসবিদেরা। অ্যাপোলোর মন্দিরের ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি শুরু হয়ে গেছে। পারস্যের ইতিহাস নতুন করে লিখতে হবে।

আলফ্রেড হাইকারের নামও উচ্চারিত হচ্ছে দু'-এক জায়গায়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কোনো পাত্তা নেই লোকটার।

গুহার ভিতরে দুটো লাশ পাওয়া গেছে। একটা সিদোরভের জনৈক চামচার, আরেকটা মেলিখানের। রহস্যময় ব্যাপার, সিদোরভের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। যেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল সে সেখান থেকে রক্তের দাগ অনুসরণ করা হয়েছে। নিশ্চিত হওয়া গেছে জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল লোকটা, প্ল্যাটফর্মের কাছে ফিরে আসার চেষ্টা করছিল। কাছাকাছি আসতে পেরেছিল। কিন্তু তারপর আর কোনো সূত্র নেই। যেভাবেই হোক উপরে উঠে এসেছিল হয়তো, তারপর পালিয়ে গেছে। আবার হতে পারে, প্ল্যাটফর্মের কিনারা থেকে পড়ে গিয়ে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেছে অন্ধকার গহ্বরে।

গুহার ভিতরে খুনখারাপি হয়েছে, তাই ইটালিয়ান পুলিশ নাক না গলিয়ে পারে না, কিন্তু সোহেলকে দিয়ে কলকাঠি নেড়েছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, গ্রীক আর ইটালিয়ান ইন্টেলিজেন্স নয়-ছয় বুঝিয়ে দিয়েছে পুলিশকে।

ভর্তি হওয়ার ঠিক দশদিনের মাথায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পায় রানা। ততদিনে ওদের ছুটির মেয়াদ ফুরিয়েছে। রাহাত খানের নির্দেশে বাংলাদেশে ফিরে যায় সোহানা, কাজে যোগ দেয় বিসিআই-এ। তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়নি বলে ফিল্ডওয়ার্ক থেকে আপাতত বিরত রাখা হয় রানাকে। ইটালির বারিতে,

নিজের সেফহাউসে ফিরে আসে ও।

আরিফ এখন জেলে। অপি আরও সাবধান।

জার্মানি আর ফ্রান্সে বাংলাদেশ দূতাবাসে গণ্ডগোল চলছিল বেশ কিছুদিন থেকে। ওখান থেকে কে বা কারা নিয়মিতভাবে গোপন খবর পাচার করে দিচ্ছিল। ব্যাপারটা টের পাওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার তদন্ত শুরু করতে বলে বিসিআইকে। রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির আড়ালে কাজ শুরু করে বিসিআই। মনের মতো একটা ডেস্কজব পেয়ে যায় রানা।

একমাসের মাথায় নিষ্পত্তি হয় সমস্যাটার। রানার হাতে তখন তেমন জরুরি কোনো কাজ নেই, কারণ তক্ষুনি ওকে মাঠে নামাতে রাজি হননি রাহাত খান। তাই তাঁর অনুমতি নিয়েই নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের পেছনে লাগে ও।

ইতিহাস বলছে, ল্যাকানাউ মদভর্তি বারোটা বোতল দিতে বলেছিলেন নেপোলিয়ন তাঁর ব্যক্তিগত মদ-প্রস্তুতকারক হেনরি আরখামবল্টকে। রানা-সোহানা খোঁজ পেয়েছে পাঁচটার। একটা বোতল হারিয়ে ফেলেছিল এগন বন্ডেউইন, পরে সেটা ভেঙে যায়। মৌমাছির প্রতীকসহ ভাঙা অংশটা উদ্ধার করে রানার বন্ধু রে হোগান। তিনটা বোতল অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। পোকোমক নদীর খাঁড়িতে ইউএম মল্‌শের ভিতর থেকে একটা, সেইন্ট বার্থোলোমিউ'র গির্জা থেকে দ্বিতীয়টা, শেষেরটা অ্যান্টনির "পাতাল কবরস্থান" থেকে। রাম কে থেকে চতুর্থ একটা বোতল ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মেলিখান আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা।

নিজেদের তিনটে বোতল ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের হাতে তুলে দিয়েছে রানা। দারুণ খুশি হয়েছে ফরাসি সরকার, বোতল পিছু আড়াই লক্ষ ডলার করে মোট সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ডলার পুরস্কার দিয়েছে রানা-সোহানাকে। সোহানাকে জিজ্ঞেস

করেছিল রানা, কী করবে টাকাটা দিয়ে। নিজের কোনো দাবি রাখেনি সোহানা, রানার যা খুশি করতে বলেছে।

বস্ মেজর জেনারেল (অব) রাহাত খানের মাধ্যমে সাত লক্ষ ডলার ব্যয় করে দেশে একটা দাতব্য হাসপাতাল খোলার ব্যবস্থা করেছে। আর বাকি পঞ্চাশ হাজার দিয়েছে রানা অপিকে। কারণ, ওর কঠোর পরিশ্রম ও গবেষণা ছাড়া রানা-সোহানা সাফল্যের মুখ দেখত কি না সন্দেহ। হাসিমুখে টাকাগুলো নিয়েছে অপি, কিন্তু চাকরি ছাড়তে রাজি হয়নি, সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছে ওর কাজ। রবিনের জন্য আগেই ভাল একটা চাকরি জোগাড় করে দিয়েছে রানা এজেন্সি, এবার ছেলেটার উচ্চশিক্ষার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ায় যারপরনাই খুশি মেয়েটা, দেশে বাপ-মা-ভাই-বোনের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে ব্যাংকে রাখা ওই টাকার ইন্টারেস্ট দিয়ে। ওর জীবনটা সহজ করে দিলেন মাসুদ ভাই।

নেপোলিয়নের হারানো মদভাণ্ডারের পেছনে নতুন করে লাগার পর রানার সামনে প্রথম প্রশ্ন ছিল: বাকি সাতটা বোতলের কী হয়েছে? ওগুলো কি হারিয়ে গেছে? নাকি আবিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় আছে কোথাও?

ভেবেচিন্তে রানা সিদ্ধান্তে আসে, সাতটা বোতল উদ্ধার করতে হলে লিওনেল অ্যারিয়েনের ব্যাপারে জানতে হবে ভালোমতো।

সময় নষ্ট না করে কাজ শুরু করে দেয় ও। অপি নেই, কিন্তু ওর নোটবুক আর ডায়েরিগুলো আছে; ওগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে শুরু করে। একটা ডায়েরিতে লিওনেল অ্যারিয়েনের ব্যাপারে নোট লিখেছে অপি, ওটার উপর চোখ বুলায়।

আঠারো শ' বাহান্ন সাল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে লিওনেল অ্যারিয়েন নামের এক ফরাসি চোরাকারবারি। মরার আগে

নিজের জীবনের একটা গল্প শোনাচ্ছে সঙ্গীসাথীদের। বলছে, আঠারো শ' বিশ সালের জুন মাসে, মানে নেপোলিয়নের মৃত্যুর এগারো মাস আগে সম্রাটের এক এজেন্টের সঙ্গে দেখা হয় ওর। ওই এজেন্টকে নাকি মেজর বলে ডাকত সবাই। অ্যারিয়েন আর ওর জাহাজটা ভাড়া করে মেজর। শর্ত ছিল, সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে যেতে হবে অ্যারিয়েনকে। ওখান থেকে কিছু মালসামান নিতে হবে। সব ঠিকমতো নিতে পারলে কোথায় ডেলিভারি দিতে হবে তা জানানো হবে।

ছ'সপ্তাহ পর সেইন্ট হেলেনা দ্বীপে গিয়ে হাজির হয় ওরা। ঢুকে পড়ে একটা খাঁড়িতে। দেখতে পায় একটা নৌকা, তাতে মাত্র একজন লোক। সঙ্গে দু'ফুট লম্বা আর এক ফুট চওড়া একটা কাঠের-বাক্স। নৌকায় গিয়ে ওঠে মেজর, অ্যারিয়েনের দিকে উল্টো ঘুরে ডালা খোলে। ভিতরের জিনিসপত্র ঠিকঠাক আছে কি না দেখে। তারপর ভালোমতো আটকে দেয় ডালাটা। এরপর হঠাৎ করেই কোমরের খাপ থেকে বের করে তলোয়ার, নৌকার লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওকে শেষ করে দেয়। লোকটার পায়ের সঙ্গে নোঙর বেঁধে লাশ ফেলে দেয় পানিতে। পরে তলায় ফুটো করে ডুবিয়ে দেয় নৌকা।

এ-পর্যন্ত বলে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে অ্যারিয়েন। কাজেই ওই বাক্সে কী ছিল, কিংবা সে আর মেজর মিলে বাক্সটা কোথায় নিয়ে গিয়েছিল তা আর জানা যায়নি।

রানা জানত, গুগলে সার্চ দিয়ে কাজ হবে না, তাই কয়েকটা অনলাইন লাইব্রেরির সাহায্য নেয়। লাইব্রেরি অভ ফ্রান্স-এ স্যামুয়েল্‌স নামের এক লোকের কিছু রিসার্চ ডকুমেন্ট পায় নেপোলিয়নের উপর। কী মনে করে শ্যাতো দ'ইফের উপর লেখা গোটা পাঁচেক বই আনিয়ে নেয়। তারপর টানা পাঁচ দিন পড়ে থাকে ওগুলো নিয়ে।

কয়েক শ' নোট, জন্ম-মৃত্যুর ডজন ডজন স্যার্টিফিকেট আর ট্রান্সফার রেকর্ড ঘেঁটে শেষপর্যন্ত একটা সূত্র পায় ও: নর্ম্যাণ্ডি প্রভিন্স। ওখানে হাজির হয় সশরীরে। হারানো-মদভাণ্ডার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতে পারে ওখানকার আর্কাইভ্‌ থেকে।

লিওন অ্যারিয়েন পেলেটিয়ার ছিল নেপোলিয়নের রিযার্ভ আর্মির একজন গ্রেনেডিয়ার। কাজ করত সরাসরি আরনঁদ লোরনের অধীনে। আঠারো শ' আঠারো সালে নির্দিষ্ট কিছু অভিযোগে চাকরিচ্যুত করা হয় তাকে। তখন সে ফিরে আসে নিজের গ্রামের বাড়ি বিউকোর্ট-এ, লে হার্ভে বন্দর থেকে এক শ' পনেরো মাইল পুবে। কিন্তু মাত্র দু'মাসের মাথায় উধাও হয়ে যায়। পরিচয় পাল্টে নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করে লে হার্ভে বন্দরে। তিন মাস্তুলের একটা জাহাজ কেনে। আশ্চর্যের বিষয়, সেনাবাহিনীর আটজন সার্জেন্টের সারাজীবনের বেতন আর ওই জাহাজের দাম সমান।

ফরাসি উপকূল বরাবর অস্ত্র আর মদ চোরাচালানের ব্যবসা শুরু করে পেলেটিয়ার। আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে বেশি সময় লাগেনি ওর। অবাক করার মতো আরেকটা কথা হচ্ছে, ফরাসি নৌ-কর্তৃপক্ষের হাতে একবারও ধরা পড়েনি সে।

দু'বছর পর, আঠারো শ' বিশ সালের জুন মাসের এক রাতে বন্দর-সংলগ্ন একটা শুঁড়িখানায় ঢোকেন আরনঁদ লোরন, ভাড়া করেন পেলেটিয়ার আর ওর জাহাজটাকে। তারপর আবারও নিরুদ্দেশ হয়ে যায় লোকটা। ফিরে আসে বছরখানেক পর। বন্দরে নেমেই বেচে দেয় জাহাজ, পকেটভর্তি টাকা নিয়ে ফিরে যায় গ্রামের বাড়ি। ওকে ততদিনে মদের নেশা পেয়ে বসেছে। সারাদিন বাড়িতে বসে মদ গিলতে গিলতে সব টাকা খুইয়ে বসে, লাখপতি থেকে পথের ভিখিরিতে পরিণত হয় একসময়।

এ-পর্যন্ত পড়ে রানার মনে হয়, নেপোলিয়ন আর লোরনের পর তৃতীয় কোনো ব্যক্তি যদি জেনে থাকে কারয়াটিড দুটোর ব্যাপারটা, তা হলে সে এই পেলেটিয়ার।

দুয়ে দুয়ে চার মেলায় রানা। লোরনের হয়ে কাজ শুরু করে পেলেটিয়ার, বন্দরে ফিরে আসতে এক বছর সময় লাগে ওর। তারমানে এই একটা বছর লোরনকে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বোতলগুলো লুকাতে সাহায্য করেছে লোরনকে।

পেলেটিয়ারের মৃত্যুর পর "নেপোলিয়নের ধাঁধার" ব্যাপারে সক্রিয় হন লোরন। অনেকগুলো চিঠি লেখেন তিনি নেপোলিয়নের ছেলেকে, সম্রাটের শেষ ইচ্ছা পূরণের তাগিদ দেন। কিন্তু ছেলেটা বার বার একই কথা জানায় তাঁকে: যে-আরামআয়েশে আছে তা ছেড়ে বাচ্চাদের মতো "কানামাছি ভোঁ ভোঁ" খেলায় অংশ নিতে পারবে না—খুঁজে বের করতে পারবে না কোনো গুপ্তধন।

রেকর্ড বলছে, বিয়েশাদী করেনি সার্জেন্ট পেলেটিয়ার, সারাজীবন ফুর্তি করেছে। তাই ওর ঔরসে কোনো বাচ্চাকাচ্চার বিবরণ পাওয়া গেল না। তবে ভাতিজার মেয়ে, সেই মেয়ের ঘরের ছেলে, সেই ছেলের ঘরের বাচ্চা...এভাবে যেতে যেতে পাওয়া গেল ক্যারল নামের একুশ বছর বয়সী এক মেয়ের নাম। বন্ধক-দেয়া বিউকোর্ট ফার্মহাউস এবং আরও কিছু ব্যক্তিগত ঋণের বোঝা কাঁধে নিয়ে সে-মেয়ে বেঁচে আছে আজও।

রানা ঠিক করে দেখা করবে মেয়েটার সঙ্গে। একটা গাড়ি ভাড়া করে চলে আসে লে হার্ভে বন্দরে, তারপর সেখান থেকে পথের হদিস করে বিউকোর্ট গ্রামে।

নুড়িপাথর বিছানো ড্রাইভওয়েের ধারে, একসারি গাছের আড়ালে ফার্মহাউসটা। সাদা রঙ-করা দোতলা কাঠের

মেইনবিল্ডিং শ্রী হারিয়েছে অনেক আগেই। কোনো কোনো জানালার পাল্লা পড়ি পড়ি করছে। কোনোটা পড়ে গেছে ইতিমধ্যে, ওখানে শক্ত কাগজ আটকে দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে।

চাবি ঘুরিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল রানা। দরজা খুলে বাইরে বের হলো। রোদের যন্ত্রণায় চোখ মেলা দায়, তাই পকেট থেকে সানগ্লাস বের করে পরল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

মেইনবিল্ডিং-এর ডান পাশে আয়তাকার একটা বাগান। ওখানে লাঙল চালানো হয়েছে, কালো মাটি দেখা যায়। মৌসুমী কোনো ফসল বা সব্জি চাষ করা হবে। খুলে হাঁ হয়ে-থাকা বেড়ার দরজার কাছ থেকে শুরু হয়েছে ওয়াকওয়ে, শেষ হয়েছে পোর্চে গিয়ে। এককালে পাথরে বাঁধানো ছিল ওয়াকওয়েটা, এখন পাথর উধাও হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে।

হেঁটে গিয়ে পোর্চে উঠল রানা। সদর-দরজায় পুশবেল নেই। তবে ঝুলন্ত একটা দড়ি আছে, বোঝা গেল ওটা ধরে টান দিলে ভেতরে ঘণ্টা বাজবে। তা-ই করল রানা।

ঘণ্টাধ্বনির কিছুক্ষণ পর খুলে গেল দরজাটা। রোদেপোড়া চামড়ার, কালো চুলের, খাটো কিন্তু ছিপছিপে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রেকর্ড অনুযায়ী এতদিনে বয়স পঁচিশ হওয়ার কথা, কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, মাত্রাতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বয়সটাকে ত্রিশের কোঠায় নিয়ে গেছে। নাকের উপর এবং চারপাশে গোটা বিশেক তিল দেখা যাচ্ছে।

'কাকে চাই?' ফরাসি ভাষায় প্রশ্ন করল মেয়েটা।

ফ্রেঞ্চ ভালই পারে রানা, তাই ওই ভাষাতেই বলল, 'সেনিওরিটা ক্যারলের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কেন?'

'তার পূর্বপুরুষ সার্জেন্ট পেলেটিয়ারের ব্যাপারে কথা

আছে।'

কৌতূহল দেখা দিল মেয়েটার চোখে। দরজার পাল্লা আরেকটু খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। 'আসুন, ভিতরে আসুন। সার্জেন্ট পেলেটিয়ারের ব্যাপারে এখানকার কিছু লোকজন আর আমার বাপ-দাদার কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কথা শুনেছি। যাচাই-বাছাই করে দেখার সুযোগ হয়নি কখনও।'

রানাকে সোজা কিচেনে নিয়ে গেল ক্যারল, টেবিলের সঙ্গের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। বসল রানা। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। দেয়ালগুলোয় হলুদ প্লাস্টার-করা। ডাইনিংটেবিলটা ওক কাঠের। সিঙ্কের পাশে একটা সাইডবোর্ড, তার উপর কয়েকটা চাইনিজ বাসনকোসন। চেককাটা কমলা-রঙা সাধারণ পর্দা ঝুলছে জানালায়, বহুদিন ধোয়া হয়নি বলে ময়লা হয়ে গেছে।

দু'কাপ চা বানাল ক্যারল। রানার হাতে দিল এক কাপ। নিজে আরেকটা নিয়ে বসে পড়ল রানার মুখোমুখি। বলল, 'আপনি ইচ্ছা করলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন আমার সঙ্গে। ভাষাটা ভালই পারি আমি। আমেরিকান সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করছিলাম প্যারিসের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু...'

মাথা ঝাঁকাল রানা, 'ঠিক আছে।'

'আমার পরিবারের ব্যাপারে কিছু বলবেন বলছিলেন।'

পেলেটিয়ার সম্পর্কে নিজের কয়েকটা ধারণার কথা বলল রানা। তারপর জানাল হারানো-মদভাণ্ডারের বিষয়টা। কারয়াটিডের সঙ্গে বোতলগুলোর সম্পর্কের কথা ব্যাখ্যা করল।

ওর কথা শেষ হওয়ার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল ক্যারল। তারপর মাথা নাড়ল, চোখেমুখে বিস্ময়ের ছাপ। 'কথাগুলো বলার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার মাসুদ রানা। আমাদের পরিবারের কেউ সম্রাট নেপোলিয়নের জন্য কিছু

করেছেন জানলেও গর্ব হয়।'

চোখ পিটপিট করছে রানা, ওর কথা বুঝতে পারেনি ক্যারল। 'আমি বোঝাতে পারিনি তোমাকে। কথাগুলো তোমাকে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমার ধারণা এখনও কয়েকটা বোতল লুকানো অবস্থায় আছে।'

'আপনি...বলতে চান...এখানেই আছে বোতলগুলো?'

পকেট থেকে আই-ফোন বের করল রানা। মৌমাছির ছবিটা সেইভ করা আছে, ওটা বের করে দেখাল ক্যারলকে। 'এ-রকম কিছু দেখেছ কখনও?'

জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্যারল, সিঙ্কের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সাইডবোর্ড থেকে একটা প্যান বের করল, হাতলটা একনজর দেখে নিয়ে এল রানার কাছে। দেখাল হাতলটা।

স্টীলের রডের গায়ে একটা উড়ন্ত মৌমাছির প্রতীক খোদাই-করা। রানা যে-ছবিটা দেখিয়েছে সেটার সঙ্গে বেশ সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্যানটা উল্টেপাল্টে দেখল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এটা কোত্থেকে পেলে?'

'আমি পাইনি। আমার বাবা পেয়েছেন। বেশ কয়েক বছর আগে, আমাদের বেইযমেন্টে। মৌমাছির ছবিটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারেননি তিনি, বোঝার চেষ্টাও করেননি আসলে। একটা কাজের জিনিস পাওয়া গেছে ভেবে খুশি হয়েছিলেন, ওটা দিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে বলেছিলেন আমাকে। সেই থেকে জিনিসটা রান্নাঘরেই আছে।'

'বেইযমেন্ট?' এবার উঠে দাঁড়াল রানা। 'পথ দেখাও। ওটা দেখতে চাই আমি।'

মাত্র পনেরো মিনিট খুঁজেই বোতলগুলো পেয়ে গেল রানা।

হাবিজাবি অনেক কিছু জমিয়ে স্তূপ করে রাখা হয়েছে পুরো বেইযমেণ্টে, বিশেষ করে উত্তরপশ্চিম কোণে। ক্যারলকে একটা ফ্ল্যাশলাইট নিয়ে আসতে বলল রানা, একছুটে গিয়ে নিয়ে এল মেয়েটা। ওটা জ্বালিয়ে আলগা কিছু কাঠ সরাতেই বেরিয়ে পড়ল বড় একটা তক্তা, তাতে মৌমাছির প্রতীক খোদাই-করা। তক্তাটা সরাল রানা, বড়সড় একটা বাক্স পেয়ে গেল।

ওটা খুলে ভেতরে দেখতে পেল নেপোলিয়নের হারানো-মদভাণ্ডারের শেষ সাতটা বোতল।

'মাই গড!' বিস্ময়ে ক্যারলের দু'চোখ বিস্ফারিত, দু'গালে হাত দিয়েছে বাচ্চা মেয়েদের মতো। 'এগুলো...এগুলো কত বছর ধরে আছে আমাদের কাছে?

'এক শ' নব্বই বছর তো হবেই।'

'অথচ কিছুই জানি না আমরা! আমার বাপ-দাদা কখনও এখানে এসে ঘাঁটাঘাঁটিও করে দেখেনি!'

'কাজটা করা উচিত ছিল ওঁদের। আবার...কে জানে... হয়তো ঘাঁটাঘাঁটি না করে ভালোই করেছেন।'

রানার দিকে তাকাল ক্যারল। 'এবার?'

মিষ্টি করে হাসল রানা। 'এবার আর কী? বড়লোক হয়ে গেছ তুমি, ক্যারল। তোমার সব ধারদেনা চুকিয়ে দেয়ার পরও অনেক-অনেক টাকা থাকবে তোমার হাতে। টাকার অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিলে, ইচ্ছা করলে শুরু করতে পারো আবার।'

রাত নেমেছে সোলানা বিচে।

সৈকতটার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটাকে রাতের বেলায় সম্পূর্ণ অন্য একটা জায়গা বলে মনে হয়। পশ্চিম দিগন্তের লালিমা মুছে গেছে। অন্ধকারে ঢেকে গেছে আকাশ। অদৃশ্য হয়ে গেছে ফেনিল ঢেউ। তবে গর্জন শুনলে বোঝা যায় ধেয়ে আসছে

একটার পর একটা। লাল-নীল-সবুজ আলোয় আলোকিত হোটেল-মোটেলগুলো এবং সেগুলো ঘিরে আলোপ্রেমী-পতঙ্গের-মতো ট্যুরিস্টদের ঝাঁক নিঃশব্দে বলে দিচ্ছে সোলানা বীচ এখন বিলাসপুরী।

সিগারেটটা পুড়ে শেষ হয়ে গেছে দু'আঙুলের ফাঁকে। ঘরের ভিতর বেজে থেমে গেছে রকওয়েলের নাইফ। আকাশে মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করেছে দু'-চারটে তারা। ইজি চেয়ারের পাশে এখনও অপেক্ষায় রয়েছে স্কচের গ্লাসটা।

পিঠ সোজা করে বসল রানা। বুকের ভিতরটা খালি খালি লাগছে কেন যেন। নেপোলিয়ন, লোরন, পেলেটিয়ার, সিদোরভ, মেলিখান... সবার কথা মনে পড়ছে। চোখের সামনে যেন বার বার উঁকি দিয়েই হারিয়ে যাচ্ছে সোহানা। মনে পড়ছে তীক্ষ্ণধী অপি আর বিশ্বাসঘাতক আরিফের কথা।

বিশ্বাসঘাতক? তা ছাড়া আর কী? রানার প্রিয়পাত্র ছিল ও।

মুখে কিছু বলেনি ও রানাকে। সেফ হাউসে বন্দি অবস্থায় দীর্ঘ একটা চিঠি লিখেছিল রানার উদ্দেশে, বাড়িয়ে দিয়েছিল সেটা।

মাসুদ ভাই,

এই কথাগুলো আপনাকে না বললেই ভাল হতো হয়তো। আমার মতো বিশ্বাসঘাতকদের নীরবে চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু তারপরও পারলাম না। কেন, জানি না।

আমি আপনার কাছে ঋণী। অনেক আদর-ভালবাসা পেয়েছি আপনার কাছে। কতটা তা বলে বোঝাতে পারবো না, বোঝাতে চাইও না। সে-ঋণের সামান্য অংশও শোধ করতে পারিনি, উল্টো...

আপনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলতে পারতাম কথাগুলো। কিন্তু

সাহসে কুলাল না। কে না জানে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক একজন নির্ভেজাল কাপুরুষ?

ওরা কারা, আমি জানি না। আমাকে খুঁজে বের করল কীভাবে, তা-ও বলতে পারবো না। একদিন রাতে কাজ শেষে হেঁটে ফিরছি বাসায়, কোত্থেকে চারজন এসে ঘিরে ধরল আমাকে। প্রথমে ভাবলাম ছিনতাইকারী। পরে একজন বলল, টাকাপয়সা কিচ্ছু চায় না, শুধু কথা বলতে চায়। আমাকে চেঁচাতে কিংবা বোকার মতো কিছু না করতে বলল। আশ্চর্য হলেও মেনে নিলাম। কাছের একটা পার্কে আমাকে নিয়ে গেল ওরা।

ইংরেজি উচ্চারণ শুনে আর চেহারা দেখে ঠাহর করলাম, ওরা রাশান। বেশিরভাগ কথা বলল একজনই, বাকিরা চুপ করে ছিল।

আমার নাড়িনক্ষত্র সব বলে লোকটা জানতে চাইল, 'ঠিক বলেছি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

'বুঝতেই পারছ তোমার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছি আমরা?'

'হ্যাঁ।'

'মাসুদ রানা নামের এক লোকের হয়ে কাজ কর তুমি, ঠিক?'

একটা ধাক্কা লাগল বুকের ভিতরে। চুপ করে থাকলাম।

'মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ,' প্রথমবারের মতো দাঁত বের করল লোকটা, মনে হলো সামনে কোনো নেকড়েকে দেখছি। 'ওই লোক আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে।'

আমি চুপ।

'অতএব বুঝতেই পারছ তুমি, তোমার স্ত্রী, এমনকী

তোমাদের ছেলেটাও আমাদের শত্রু?'

আমি তখন ঢোক গেলার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না।

'আমরা প্রফেশনাল, শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখি না। সেই হিসেবে এখন তোমাকে, এবং পরে তোমার বউ-বাচ্চাকে খুন করে ফেলা উচিত আমাদের। বলো, উচিত কি না?'

জবাবে আমি কী বলেছিলাম মনে নেই।

'কিন্তু আমরা আপাতত তা করবো না। কারণ তোমার বিশেষ একটা কাজ আছে।'

'কী?' বললাম কোনোরকমে।

'মাসুদ রানাকে যে-সব খবর দেয় তোমাদের এজেন্সি-চিফ অপি, সে সব পাচার করতে হবে আমাদের কাছে।'

'যদি না করি?'

আবারও নেকড়ে-হাসি হাসল লোকটা। 'তোমার ছেলের কাটামাথা তোমার হাতে তুলে দেবো, কথা দিলাম। তোমার বউকে একে একে সবাই রেপ করবো তোমার সামনে, কথা দিলাম। আর তোমাকে...তোমাকে কী করবো তা তুমিই বলে দাও।'

আমার মাথা ঘুরতে শুরু করল। দোয়াদরুদ যা জানি পড়ার চেষ্টা করছিলাম কিন্তু একটাও মনে আসছিল না।

একটুকরো কাগজ আমার হাতে ধরিয়ে দিল লোকটা। 'এটাতে আমার ফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর আর ই-মেইল অ্যাড্রেস আছে। কাল অফিসে গিয়ে তোমার বসের ওপর নজর রাখতে শুরু করবে। যা যা জানতে পারবে তার কিছুই যেন আমার অজানা না থাকে। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। মনে রাখবে মাসুদ রানা কিংবা পুলিশ যেন কিচ্ছু জানতে না পারে আমাদের ব্যাপারে। এমনকী

তোমার বউকেও কিছু বলবে না। আজকের পর থেকে আমাদেরকে দেখতে পাবে না তুমি, অথচ তোমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবো আমরা। কাজেই নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারার মতো কিছু কোরো না। ব্যস, কথা শেষ, এবার বাসায় যাও।'

মাসুদ ভাই, আপনাকে আঁর কিছু বলার দরকার আছে বলে মনে হয় না। আপনার আর সোহানাদির ব্যাপারে অনেক খবর পাচার করেছি আমি ওই লোকের কাছে। তাড়াহুড়ো করে লিখছি এই চিঠি, তাই পাচার-করা কয়েকটা নাম ও বিষয় মনে করতে পারছি এই মুহূর্তে: নেপোলিয়ন, মদের বোতল, কারয়াটিড, গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথ, পারস্য অ্যান্টিক...

শেষদিন ফোনের আলাপ শুনছিলাম ম্যাডাম অপির, উনি টের পেয়ে গেলেন। তাই শুনে সেই রাতেই আমার সঙ্গে ওদের এক কম্পিউটার এক্সপার্ট ঢুকল সেফহাউসে। এর পরের সবকিছু তো আপনার জানাই আছে।

জানি, আমার তথ্যপাচারের কারণে আপনি বা আপনারা মস্ত বিপদে পড়েছেন। শুধু এইটুকু বলতে চাই, আমিও কম বিপদে ছিলাম না। জানি না, আমার এই চিঠি আপনি আদৌ পড়তে পারবেন কি না। শুধু জানি, গ্র্যাণ্ড সেইন্ট বার্নার্ড গিরিপথের খবর জানার পর থেকে ওই লোক গায়েব হয়ে গেছে। একাধিকবার চেষ্টা করেও যোগাযোগ করতে পারিনি ওর সঙ্গে। মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছে সে।

আমার প্রাপ্য শাস্তি এড়াতে চাই না, শুধু একটাই অনুরোধ, যদি সম্ভব হয়, আমাকে ক্ষমা করবেন।

সর্বশক্তিমান আপনার মঙ্গল করুন।

স্কচের গ্লাসটা মেঝে থেকে তুলে নিল রানা। অন্ধকারে

ভালোমতো দেখা যাচ্ছে না, তারপরও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার চেষ্টা করছে পানীয়টুকু। ভাল লাগছে না কিছু।

একজন প্রাণভয়ে ভীত, দুর্বলচিত্ত বাংলাদেশী কাপুরুষের মত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওর সঙ্গে। ক্ষমার অযোগ্য কাজ করেছে সে। কঠোর শাস্তিও পেয়েছে সেজন্য।

কিন্তু তবু কেন জানি রানা খুশি হতে পারছে না। মনে হচ্ছে, দুর্বলচিত্তের ছেলেটা বড় বেশি কঠোর শাস্তি পেল।

উঠে দাঁড়াল ও। কেন যেন চুমুক দিতে ইচ্ছা করছে না স্কচে।

ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে উঠে পড়ল মাস্টারবেডে। আগামী কাল সকালের প্লেনে দেশে ফিরবে ও।

***

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

মাসুদ রানা

বাউণ্টি হাণ্টার্স

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

রানা এজেন্সিতে এসেছিল ওই জরুরি ফোন।
রানা জানল, মস্ত বিপদে পড়েছে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবিন কার্লটন।
চিফের অনুমতি পেয়েই সাইবেরিয়ায় চলল রানা।
জানে না, চলেছে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। এ-ও জানে না,
বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যবসায়ী সংগঠন
ঘোষণা দিয়েছে: পনেরো জনের কল্লা চাই।
তারা যতই দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হোক, রক্ষা নেই কারও!
প্রতিটি মাথার জন্য পাবে তেত্রিশ মিলিয়ন ডলার।

ওই লিস্টে রয়েছে মাসুদ রানার নামও। সাইবেরিয়ায়
পৌঁছেই ও বুঝল, সত্যিকারের বিপদ কাকে বলে।
ওকে ঘিরে ফেলল একদল রক্তপিশাচ বাউণ্টি হাণ্টার।
লড়তে লড়তে শেষপর্যন্ত পাশে রইল শুধু তরুণ যোদ্ধা,
হোসেন আরাফাত খবির। বাঁচবার উপায় নেই ওদের!
বরফে ঢাকা শহরের পনেরোতলা দালানের ছাত থেকে
শেষে প্যারাশুট ছাড়াই লাফ দিল ওরা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন আমাদের হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ: alochonabibhag@gmail.com

মুঈনা ইসলাম
গ্রাম: বিশ্বাস বেতকা, পোস্ট: টাংগাইল, জেলা: টাংগাইল।

কাজীদা,

আপনার কাছে এক আজব আবদার করব। আসলে আমি এমন একটা মাসুদ রানা বই আশা করছি যেটায় মাসুদ রানার সাথে তিন গোয়েন্দারা মানে কিশোর, রবিন, মুসা আর মাসুদ রানার পুরানো কিছু বন্ধু থাকবে। মাসুদ রানা অনেক দক্ষ হলেও তিন গোয়েন্দাও কিন্তু কম নয়। মাসুদ রানার যদি বিশ্বাস না হয় বা ভয় পায় যে তিন কিশোরের আবার যদি বিপদ হয়, তবে তাকে ওদের সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলবেন। বেশি কষ্ট করতে হবে না। শেরিফ ইয়ান ফ্লেচার কিংবা বিখ্যাত চিত্র পরিচালক ডেভিস ক্রিস্টোফারকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। জানি, আবদারটা অযৌক্তিক। কিন্তু যারা তিন গোয়েন্দা, মাসুদ রানা আর কুয়াশা পড়ে তারা সকলে হয়তো একমত হবে।

কুয়াশা আর মাসুদ রানাকে এক করে যে অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়েছেন তাতে আমাদের আশা আরও বেড়ে গেছে। মানুষ আশা করে, স্বপ্ন দেখে, কল্পনা করে। এভাবেই মানুষ বাঁচে। আমি আমার ইচ্ছার কথাটা শুধু বলেছি। আর, হ্যাঁ, মার্ভেল আর মার্ভেলের টিমকে খুব মিস করছি। আর হ্যাঁ, এই পত্র না ছাপালে রাগ করব না।

❋ আমি নিজেও ভেবেছি: ওদের একসঙ্গে একটা অ্যাসাইনমেণ্ট দেয়া যায় কি না। কাজটা খুব কঠিন। দুই গ্রুপের কাজের ধরন আলাদা। কাউকে তো আর অবহেলা করা যাবে না! যাই হোক, আপনার ইচ্ছার কথা জানিয়ে ভালই করেছেন—একটু জোর পেলাম। আরও ভাবব।

সাইফ মাহমুদ রেজা, ৯ম শ্রেণী,
নদীর পাড় আবাসিক এলাকা, ছাতক সিমেণ্ট কোং, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

প্রিয় কাজীদা,

শুভেচ্ছা জানাই। আসলে, কাজীদা, আমি বয়সে ছোট হলেও রানার প্রায় দু'শ' বই পড়েছি। কিন্তু এখন রানা যখন ফিল্ডে নামে তখন বড্ড একা মনে হয় তাকে। মনে হয় যেন রানা এখন স্বার্থপর। বিসিআই-এর কোন নাম গন্ধ পাওয়া মুশকিল। যার উদাহরণ 'ট্রেজার হান্টার' বই। রাগ করবেন না, আলোচনা করছি পুরানো বিষয় নিয়ে। তার কারণ, আমি সময়মত বই পাই না। আরেকটা কথা, আমি প্রায় ১২টা ভয়ঙ্কর রকমের রহস্যযুক্ত কিশোর উপন্যাস লিখেছি। কী করব একটু বলবেন, প্লিজ?

❋ তুমি তোমার মতামত জানিয়েছ, সেজন্য ধন্যবাদ। তোমার ভয়ঙ্কর রকমের রহস্যযুক্ত কিশোর উপন্যাস কত বড় তা জানাওনি। একটা উপন্যাস বা গল্প রহস্যপত্রিকায় পাঠিয়ে দেখতে পার, তা হলে যাচাই হয়ে যাবে তোমার লেখা ছাপার উপযুক্ত কি না।

মোঃ মিনহাজ ফাহিম সৌমিক

বড় মসজিদ সড়ক, বাবুপাড়া, নীলফামারী-৫৩০০।

প্রিয় কাজীদা,

আপনি কি ভাল আছেন? কিছুদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল আপনি ভাল নেই, তাই আজ চিঠি লিখলাম। আমি বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থ। তাই মনে হচ্ছিল আপনিও মনে হয়। আমি সব সময় আশা করি আপনি ভাল থাকুন এবং দীর্ঘজীবী হোন। আমার আয়ু নিয়ে আপনার আয়ু বৃদ্ধি পাক। কেননা, আপনার কিছু হলে সেবা প্রকাশনী অচল হয়ে পড়বে ও পাঠকেরা পাগল হবে। তাই আমি আপনাকে সব সময় ভাল দেখতে চাই। আর চিরঞ্জীব মাসুদ রানা এবং অমর সেবা প্রকাশনীকে সারা জীবন দেখতে চাই। কাজীদা, মাসুদ রানা ছাড়া বাকি সিরিজগুলো খুব ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। এদিকটা একটু দেখবেন। এবং আমার জীবনে একটা ইচ্ছা আপনাকে দেখবার, জানি না সেটা হবে কি না। সবশেষে এটুকুই বলি, কাজীদা, তুম অমর রাহো।

❋ দোয়া করি, শীঘ্রি সুস্থ হয়ে উঠবেন। ...আমিও ভাল আছি। আপনার আয়ু আমি চাই না, বরং আপনাকে কিছুটা ধার দিতে পারলে খুশি হই। যথেষ্ট দিন ধরে বেঁচে আছি, সময় হলেই টা-টা দিয়ে চলে যাব। আসলে কবির কথায় বিন্দুমাত্র ভুল নেই:

জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে?

আজম খান

মিরপুর, ঢাকা।

প্রিয় কাজী আনোয়ার হোসেন ভাই, শুভেচ্ছান্তে নিবেদন, আমি ভুল করে একটি বইয়ের দোকান থেকে সেবা প্রকাশনীর চারটি বই দুবার কিনে ফেলেছি। বই চারটি সেবা প্রকাশনী থেকে পাল্টে নেয়া যাবে কিনা জানাবেন। ১। অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার ২। দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান ৩। শী অ্যাণ্ড অ্যালান ৪। হার্ট অভ দ্য ওয়ার্ল্ড

❋ আপনার জন্য যাবে। অবশ্য যদি বইগুলো বিক্রির উপযোগী থাকে।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকেই সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোনও কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই তা উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সব ক'টি সিরিজ বা যে-কোনও এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। যতদিন টাকা শেষ না হয়, ততদিন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন বই পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। টাকা শেষ হয়ে এলে বাকি টাকা ফেরত নিতে পারবেন, অথবা আরও টাকা পাঠাবেন। বিস্তারিত নিয়মাবলীর জন্য প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানায় ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের পূর্ণ ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।** বিনামূল্যে ২৪ পৃষ্ঠার সাম্প্রতিক মূল্য-তালিকার জন্য সেবা বই-বিক্রেতার কাছে খোঁজ করুন।

ভি.পি.পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ৫০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। চাইলে বিকাশ-এ টাকা পাঠাতে পারেন, বিকাশ নং ০১৭৮৪৮৪০২২৮। কেবলমাত্র টাকা পৌঁছুলেই বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২২/০৬/১৪ আত্মউন্নয়ন (প্রজা D/D) বিদ্যুৎ মিত্র
২৬/০৬/১৪ রহস্যপত্রিকা (৩০ বর্ষ ৯ সংখ্যা) জুলাই, ২০১৪
০১/০৭/১৪ কুচক্রী+জলার দানব+মানসা মুসার গুপ্তধন
(তিন গোয়েন্দা ভলিউম-১৩১/২) রকিব হাসান

কুচক্রী : হাঙর আর নানা প্রতিকূলতায় ভরা ক্যারেবিয়ান সাগরে গভীরে আধুনিক জলদস্যুদের হাতে বন্দি হলো তিন গোয়েন্দা। পরিস্থিতি এমন, প্রাণ [illegible] ফেরাই কঠিন।

জলার দানব : জলাভূমির মাঝখানে নির্জন প্রাসাদে প্রাণীদেহের জিন নিয়ে গবেষণা করেন এক বিজ্ঞানী দম্পতি। সেই প্রাসাদে তিন গোয়েন্দা ঢুকেই রহস্যের গন্ধ পেয়ে গেল। তারপর শুরু হলো যেন এক ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন।

মানসা মুসার গুপ্তধন : সাগরসৈকতে অদ্ভুত একটা মুখোশ খুঁজে পেল মুসা। তাতে লুকানো কম্পাস, আর সাঙ্কেতিক মেসেজের সূত্র ধরে, ভীষণ প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে, প্রাচীন রহস্যময় এক গুপ্তশহরের খোঁজে, সুদূর [illegible] পাড়ি জমাল তিন গোয়েন্দা

আরও আসছে

১২/০৭/১৪ বাউন্টি হান্টার্স-১ (রানা-৪৩৩) [illegible] হোসেন